মহাজাতি সংঘ



শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রচ্ছদ-শিল্পী—
শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী

(প্রথম সংস্করণ)
১৩৫৩
মূল্য—৪৲ টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমর্পণ

স্নেহের

শ্রীমান সত্যশিব পাল

সুচরিতেষু

আমার গল্পের তুমি পরম ভক্ত। বিশেষ করিয়া যে কাহিনীটি পরমাগ্রহে তোমারই পরিকল্পিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলে—সে পরিকল্পনা কার্যকরী না হইলেও কাহিনীটি এখন গ্রন্থে রূপ পরিগ্রহ করায়—সর্বাগ্রে তোমাকেই মনে পড়িতেছে। তাই গ্রন্থখানি তোমাকেই অর্পণ করিয়া আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করিতেছি।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৩
আশ্বিন, দেবীপক্ষ
১৩৫৩ সাল।

আশীর্বাদক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাজাতি সংঘ

১

মিষ্টার জাহ্নবী মিত্র জবরদস্ত পুলিস অফিসার রূপে সাধারণের কাছে 'জান্‌মারা মিতির' আখ্যা পেয়েছেন—এ থেকেই পুলিস সাহেবের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আকৃতিও স্বভাব-দুর্বৃত্ত-বহুল সাঁওতাল পরগণার মত একটি ডিষ্ট্রিক্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উপযুক্ত—খুব লম্বা চাওড়া বলিষ্ঠ চেহারা; ক্ষৌরিত মুখ, চোখ দুটি সদা দীপ্ত, মুখে হাসির রেখা বড় একটা দেখা যায় না—যদিবা কখনো ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক একটু ওঠে—সেটি ঠিক বাজ পড়ার আগে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই সাংঘাতিক।

দেওঘর পুলিস ষ্টেশন থেকে খানিকটা তফাতে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বড় একটা বাগানের মধ্যে তাঁর বাংলোখানি সাহেবী ফ্যাসানে সাজানো। জাহ্নবী মিত্রের বয়স বড় জোর ৪৫ হবে; কিন্তু পুলিসের জমকালো ইউনিফরম পরলে আরো কম দেখায়। জাহ্নবীর স্ত্রীর নাম সুহাসিনী; তিনি কলকাতার এমন কোন বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে—পুরুষানুক্রমেই যাঁরা পুলিসের চাকরী করে আসছেন—যেমন তেমন চাকুরী নয়, আই, বি, বিভাগের মাথা বলেই তাঁদের প্রসিদ্ধির কথা শোনা যায়। সুহাসিনী শিক্ষিতা, সুন্দরী, তন্বী; বয়স ৩৫-৩৬ এর মধ্যেই। স্বামি-স্ত্রীর ক্ষুদ্র সংসারে একটি মাত্র ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েই বড়, বয়স দশের বেশী নয়, ছেলেটি আট বছরে পড়েছে।

দেওঘর পুলিস ষ্টেশন—পুলিস সুপারের খাস কামরা।

জাহ্নবী গম্ভীর মুখে একখানি বাদামী রঙের চিঠি পড়ছেন—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দেহরক্ষী লছমন মিশ্র বা মিছিরজী। জাহ্নবী তার দিকে চেয়ে বললেন: ভগবতী বাবুকো সেলাম দেও।

মিছির চলে গেল। পরক্ষণেই দারোগা ভগবতী দত্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সেলাম বাজালেন।

জাহ্নবী বললেন: শুনুন, পাটনায় পুলিস অফিসার্স কনফারেন্স বসছে আসছে বুধবার। আমাদের বড় সাহেব মিঃ হুইলার ডুমকা থেকে লিখেছেন—তাঁর representative হয়ে আমাকেই কনফারেন্সে য়্যাটেণ্ড করতে হবে

ভগবতীবাবু বললেন: এ ত সুখবর সার, আপনার যোগ্যতা জেনেই তিনি আপনাকে 'রিপ্রেজেনটেটিভ' করেছেন।

জাহ্নবী: হ্যাঁ, এখন শুনুন, আজই আমাকে রওনা হতে হবে—ফিরতে ৩।৪টে দিন লাগবে। কাজেই এখানকার চার্জটা আমি আপনার উপরেই দিয়ে যেতে চাই—পারবেন নিতে?

ভগবতী: শিক্ষা ত আপনার কাছেই সার, আপনাকে 'ফলো' করে ষ্টেশনের 'প্রেস্‌টিজ' বজায় রাখব—একথা বলতে পারি।

জাহ্নবী: অল্‌রাইট, তাহলে চার্জটা বুঝে নিন—

বলেই জাহ্নবী সামনের ফাইলটা তুলে ধরলেন—ভগবতী সহর্ষে হাসি মুখে এগিয়ে গেলেন সাহেবের টেবিলের দিকে।

২

পুলিস সুপারের বাংলোর ড্রয়িং রুমটি সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো, কারপেট বিছানো মেঝে। ঘরের মাঝখানে সুদৃশ্য আস্তরণে মোড়া একটা গোল টেবিল, তার চারিদিকে চেয়ার। দরজার ওপরেই একটা বড় ঘড়ি। দেওয়ালে ইংলণ্ডেশ্বর, মহামন্ত্রী চার্চিল এবং কতিপয় ইউরোপীয়ের ছবি দেখা যায়। সময়টা বিকেল—তখনো ম্লান রোদের আভায় আকাশ ঝলমল করছে। জাহ্নবী ও সুহাসিনী মুখোমুখি বসেছেন—অন্য দিকে পাশাপাশি বসে ডিসের খাদ্য খেতে খেতে বাপ মার মুখের কথা শুনছে—ছেলে সমীর ও মেয়ে শীলা। সুহাসিনী চা ঢালছেন; বেয়ারা ডিমের পোঁচ এগিয়ে দিচ্ছে—ডিসে টোষ্ট, ডিম ও ক্ষিরের পেঁড়া। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ চলেছে :

জাহ্নবী : নিয়ে যেতে বাধা কিছু নেই, তবে কথা হচ্ছে—এ সময়টা পাটনায় ভারি ভীড়।

সুহাসিনী : কেন ?

জাহ্নবী : হরিহর ছত্রের মেলা বসছে—তাই সারা প্রভিন্সের লোক হন্যে হয়ে ছুটেছে। পাটনার পথেই বেশীর ভাগ লোক যায় কি না! গঙ্গার এপারে পাটনা, ওপারে সোন্‌পুর—সেখানেই এ মেলা।

সুহাসিনী : বা! সে ত আরো ভাল গো! পাটনা বেড়ানোর সংগে তাহলে ছত্রের মেলাটাও দেখে আস যাবে। এখানে এসে অবধিই ত ঐ মেলার কথা শুনি, কিন্তু দেখা ত আর বরাতে হলো না! এবার যখন ফুরসদ এসে গেছে—বেশ ত, চল না—রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই হবে! আর, এতে ভাবনারই বা কি আছে ?

জাহ্নবী: ভাবনা হচ্ছে তোমাদের নিয়ে—যাবার আগেই থাকবার ব্যবস্থা করা চাই ; যেখানে সেখানে ত আর ওঠা চলে না !

সুহাসিনী: আচ্ছা, তোমার দাদা ত পাটনায় থাকেন—মস্ত প্রফেসার, তার ওপর নাম করা ন্যাস্‌নালিষ্ট লীডার। কাগজেও প্রায়ই তাঁর নাম দেখি ; সেখানে…

জাহ্নবীর মুখের পরিবর্তন দেখে সুহাসিনীর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

জাহ্নবী: না। সেখানে ওঠা হবে না—

সুহাসিনী: কেন ?

জাহ্নবী: সে অনেক কথা, বলব একদিন। আচ্ছা, যখন একান্তই যেতে চাইছ, ওখানকার কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর রামসদয় বাবুকে ট্রাংক কলে বলি—তিনি আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড, বাড়ীর ব্যবস্থা যাতে করে রাখেন।

যাবার কথা শুনে ছেলে ও মেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। শীলা জিজ্ঞাসা করল: কবে যাব মা আমরা ? সমীর তার প্রশ্নের সঙ্গে প্রশ্ন করল: আমরাও যাবো ত ? কি মজা !

গম্ভীর মুখে জাহ্নবী বললেন: থামো।

জলযোগের পরই জাহ্নবী বাংলোর ভিতরে গেলেন টেলিফোনে পাটনার কোর্ট ইনস্পেক্টর রামসদয় বাবুকে খবরটা জানাতে। ফোনে অনেক সময় গোপনীয় কথাবার্তা হয় ; সেজন্য বাংলোর ভিতরে জাহ্নবীর নিজের ঘরে টেলিফোন থাকে। ফোনে তাঁকে পাওয়া গেল। জাহ্নবী সপরিবার যাচ্ছেন শুনে রামসদয় বাবু সহর্ষে জানলেন: তোমার ফ্যামিলি আসছেন, আমারও বাড়ীখানি খালি পড়ে আছে—ফ্যামিলি গেছেন কলকাতায়। সব ঠিক থাকবে—রাতের খাবার পর্য্যন্ত। গাড়ী নিয়ে নিজেই ষ্টেশনে হাজির থাকবো।

৩

দেওঘর এক্সপ্রেসের ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা। সুহাসিনী টাইমটেবল দেখছেন, জাহ্নবী খবরের কাগজ পড়ছেন। শীলা ও সমীর ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুহাসিনী : এর পরেই ত পাটনা জংসান—

জাহ্নবী : হ্যাঁ।

সুহাসিনী : (টাইমটেবলটা রেখে) আমার কিন্তু তোমার দাদার কথাই খালি খালি মনে পড়ছে। অমন নামী গুণী আপনার জন থাকতেও আমারা কিনা উঠবো গিয়ে পরের বাড়ীতে!

জাহ্নবী : দাদার বাড়ীতে ওঠবার পথ দাদা নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন।

সুহাসিনী : তিনি স্বদেশীওয়ালা, ইংরেজের ধামাধরা ত নন্—এই জন্যেই বোধ হয়?

জাহ্নবী : কতকটা তাই। জানো—দাদা দুবার জেল খেটেছেন!

সুহাসিনী : তাই বলে কি তাঁর বাড়ীতে ওঠবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে? কিন্তু দেশবন্ধু, মহাত্মা গান্ধী, সুভাস বোস, জহরলালজী—এঁরা জেল খাটেন নি?

জাহ্নবী : হ্যাঁ গো হ্যাঁ—জেল খেটে সবাই চতুর্ভূজ হয়েছেন আর কি! দাদার যে প্রতিভা ছিল, তাতে তিনি গভরমেণ্টের যে কোন ডিপার্টমেণ্টের মাথায় বসতে পারতেন! কিন্তু আই, সি, এস পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করেও সরকারী অফার রিফিউজ করে যেদিন তিনি দুশো টাকা মাইনের প্রফেসারীটাই বেছে নিলেন—আমার মত অত

ব্যথা বুঝি আর কেউ পায়নি! সেদিনের সিনটা যেন চোখের ওপর ভাসছে·····

সুহাসিনী: তাই নাকি!

হঠাৎ জাহ্নবী যেন ১৬ বছর পিছিয়ে গেলেন—ছবির মতন মানসপটে ফুটে উঠেছে তখনকার কথা। দাদা যদুপতি এম-এ পাস করে বিলাতে পড়তে যান। সবাই জানে তিনি সিবিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরবেন। কিন্তু সকলের ধারণা উল্টে দিয়ে ফিরে এসেই তিনি প্রফেসারী নিলেন। জাহ্নবী তখন কোন রকমে বি-এ পাস করে সরকারী চাকরীর অর্থকরী বিভাগগুলি চেখে চেখে বেড়াচ্ছিলেন। দুই ভাইয়ে পেশা নিয়ে তর্ক বাধল। যদুপতি স্ত্রী সুধা ও পাঁচ বছরের মেয়ে দুর্গাকে নিয়ে পড়ার ঘরে বসে গল্প করছিলেন—ঝড়ের মত বেগে জাহ্নবী সেখানে এলেন।

জাহ্নবী: করলে কি দাদা, আই-সি-এস পাস করে এসে কোথায় একটা ডিষ্ট্রিক্টের চুড়োয় গিয়ে বসবে, তার বদলে কিনা ছেলে পড়াবে বলে গুরুমশায়ের পেশা বেছে নিলে!

যদুপতি: আই, সি, এস-এর ডিপ্লোমাটা ফিরিয়ে দিয়েছিরে, তা বুঝি শুনিস্‌নি! আর গুরুমশাইএর পেশা কি মন্দ? দেশে আই, সি, এস-এর অভাব নেই, অভাব এই দিকেই—ছেলে তৈরী করবার মানুষ নেই।

সুধা: তাই তোমার দাদা চলেছেন পাটনায়—সেখানে মানুষ তৈরী করবেন। এখন তুমি কি করবে ঠিক করেছ ঠাকুর পো?

জাহ্নবী: শোনোনি বুঝি বৌদি, আমি মানুষকে ব্রেক করবার চাকরী নিয়েছি।

সুধা: তার মানে?

জাহ্নবী: পুলিস লাইনে ঢুকবো ঠিক করেছি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

যদুপতি : তাই নাকি ?

সুধা : আর কাজ পেলে না ঠাকুর পো—তাই বেছে বেছে পুলিসে চাকরী নিয়ে বদনাম কুড়ুতে গেলে !

যদুপতি : বদনাম কেন বলছ, সুনামও ছড়াতে পারে ; পুলিস হলেই যে খারাপ হতে হবে তার কোন মানে নেই। মানুষ গড়ে তুলতে পুলিসের দায়িত্বও কি কম ? অবশ্যি, পুলিস যদি নিজেকে একজন যন্ত্রী মনে করে দেশের শাসন-যন্ত্রে হাত লাগায়।

সুধা : ও, তাই বুঝি ঠাকুর পো বললেন—মানুষ ব্রেক করবেন ! বেশ, তাহলে আদা জল খেয়ে লেগে পড় আর কি !

সুহাসিনী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন ষোল বছর আগেকার কথা এবং কাহিনী। জাহ্নবী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন : ভেবেছিলুম, দাদা কথাটা শুনেই চমকে উঠবেন—পুলিস লাইনে ঢুকতে বারণ করবেন আমাকে ! কিন্তু তাঁর মুখে ঐ ধরণের কথা শুনে আমারো রোখ্ চড়ে গেল; জিদ চাপলো—ঐ লাইনেই ঢুকবো। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে বিয়ে করা।

সুহাসিনী : যেহেতু আমার কাকা ক্যালকাটা পুলিসের হোম্‌রা-চোম্‌রা অফিসার ! কিন্তু এমনি তোমার রাগ যে, দাদা বৌদির সম্পর্ক কাটিয়েই বিয়েটা করে ফেললে !

জাহ্নবী : বিয়েতে দাদা যদি আসতেন, তোমার কাকা তুষ্ট হতেন না, আর আমাকে অমন করে সুপারিসও করতেন না। কেননা, পাটনায় যেতেই পুলিসের ব্ল্যাক বুকে দাদার নাম উঠেছিল ! যাক সে কথা—আমরা এসে পড়েছি।

ট্রেনের গতি তখন মন্থর হয়ে এসেছে—ক্রসিংএর মুখে একটা কর্কশ শব্দ তুলে ষ্টেশনের এলাকায় প্রবেশ করছে।

এই সময় এই ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বগি কামরা বিভিন্ন দেশী ও বিভিন্ন বেশী যাত্রী এবং তাদের লটবহরে এমনি বিশৃঙ্খল ভাবে ভরে গেছে, দেখলে অবাক হতে হয়! বেঞ্চি, ব্যংক, মেঝে কোথাও এমন একটু স্থান নেই যেখানে আর কোন লোক সেঁধুনো ত দূরের কথা—পা ফেলতে পারে! কামরার কাঠের দেয়ালে লেখা আছে—ত্রিশজন বসিবেক। কিন্তু কামরাটিতে সেঁধিয়েছে পুরুষ নারী বালক বালিকা নিয়ে একশোর কাছাকাছি। এর ওপর আছে প্রত্যেকের স্তূপীকৃত মোটঘাট। এই অবস্থায় কথা কাটাকাটি এবং হাতাহাতিও চলেছে।

ছোট একটা ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই দরজা খুলে তিনজন ভদ্রলোক ওঠবার চেষ্টা করায় ভিতর থেকে উঠল প্রতিবাদ—দরজা টেনে উঠতে বাধা দিয়ে বলতে লাগল: আরে ভাগো, কামরা ভরতি হায়...

...দেখতে পাচ্ছেন না—কামরায় পা ফেলবার জায়গা নেই, বসবেন কোথায়?

এমনি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন কণ্ঠের তীব্র আপত্তি। কিন্তু বাধা না মেনে অভ্যস্ত কৌশলে বাধা ঠেলে ভিতরে তিনটি যুবক ঢুকে পড়ল—গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। এদের ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা, প্রত্যেকের কাঁধে ঝোলানো ক্যাম্বিসের ব্যাগ—আর বুকে আঁটা ব্যাজ দেখেই বোঝা গেল যে—এরা সেবাব্রতী। ব্যাগে দেবনাগরী, বাঙলা ও উর্দুতে নাম লেখা—"মহাজাতি সংঘ" প্রত্যেকের কাপড় ও জামা আঁটসাট করে পেরা, মাথায় খদ্দরের টুপি। গাড়ীর ভিতরে ঢুকেই সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করতে করতে একটি ছেলে বলল: জায়গা করে দিতে উঠেছি।

আর একটি ছেলে বলল : ঘাবড়াবেন না—পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক করে দিচ্ছি।...

তৃতীয় ছেলেটি ইতিমধ্যেই যাত্রীদের বিশৃঙ্খলভাবে রাখা মোটঘাটগুলি নামিয়ে গোছগাছ করতে লেগে গিয়েছিল—যাত্রীপক্ষ থেকে প্রতিবাদ উঠলেও, ছেলেটি হাসিমুখে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল ; এই সময় আর দু'টি ছেলে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

যে ছেলেটি নীরবে যাত্রীদের মোটঘাট গোছাচ্ছিল, তার নাম প্রতাপ। সে এখন বলতে লাগল : হরিহর ছত্রের মেলা—তাই যাত্রীর এত ভীড়! কিন্তু রেলের কর্তাদের খেয়াল নেই—তাদের ধারণা থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ভেড়ার সামিল! তাই তারা টাকা নিয়ে চোখ বুজে টিকিট কেটেই খালাস। আর তোমরা ভীড়ের চাপে আপনাআপনি ঝগড়া বাধিয়ে নিজেদের ছোট করচ! সব কামরাতেই এই অবস্থা। অথচ একটু কষ্ট করলেই এর আসান হতে পারে।

লোকগুলি অবাক হয়ে প্রতাপের কথা শুনতে লাগল—সেই সঙ্গে এই তিনটি ছেলের অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখে তাদের চোখগুলো অবাক বিস্ময়ে কপালের দিকে ঠেলে উঠল।...সত্যি, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়ীর কামরাটির শ্রী যেন বদলে গেছে। মালপত্র বেঞ্চির নিচে ও র‍্যাক্সে রেখে স্থানে স্থানে দুই বেঞ্চির মাঝে বেডিং রেখে বিছানা বিছিয়ে শিশুদের শুইয়ে দিয়েছে। সবাই সচ্ছন্দভাবে বসতে পেরেছে—যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও বসেছে। তখন 'বা-জী—বা!' 'কেয়া হাতকা সাফাই!'...'তাই ত, যেন ঘর গুছিয়ে দিলেন!' 'আপনি বসুন মশাই, বসুন'...'আইয়ে সাহাব আইয়ে!' এইভাবে সম্বর্ধনা সুরু হলো।

তিনটি ছেলের মধ্যে কথায় চেহারায় ও কাজের ব্যবস্থাপনায় প্রতাপ নামে ছেলেটিই বিশেষভাবে ট্রেনশুদ্ধ সবাইকে আকৃষ্ট করে। কাজেই

ট্রেনখানার বিভিন্ন দিক থেকে যাত্রীরা তাকেই সর্বাগ্রে কাছে বসাতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। প্রতাপকে তখন বাধ্য হয়ে বলতে হলো: ব্যস্ত হবেন না, আমরা বসতে আসিনি—আপনাদের বসবার ব্যবস্থা করতেই আমাদের আসা। পরের ষ্টেশনে আমরা নেমে গিয়ে এর পরের কামরায় এইভাবে ঢুকব। হ্যাঁ, একটা কথা আপনারা বোঝবার চেষ্টা করবেন!—এই কামরায় দেখছি ভারতের সব দেশের লোকই পাশাপাশি বসেছেন, অথচ নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছেন না। এরপর কেমন করে দেশের মধ্যে মিলেমিশে থাকবেন বলুন ত? বিদেশী সরকার দেশের ভার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে কি করে নিজেদের সামলাবেন? অবিশ্যি, তখন থার্ড ক্লাসের এ হাল থাকবে না, কিন্তু তার আগে আপনাদের সব রকমে তৈরী হতে হবে তো!

আবার বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন ভাষায় কলরব উঠল:

সাচ বাত হ্যায়…ওয়াজিব কথা বাবুজী বলিতেছেন…

কামরার এক কোণ থেকে এক প্রবীণ বাঙালী বার দুই কেসে গলাটা সাফ করে বলে উঠলেন: সত্যি বাবা, যা দেখালে, তা গল্প করবার মতন। এখন তোমাদের পরিচয়টা জানতে ইচ্ছা করছে।

মৃদু হেসে প্রতাপ বলল: পরিচয় এখনো পান নি? আমরা সেবাব্রতী, আপনাদের সেবক।

প্লাটফরমে ট্রেন থামতে না থামতেই জাহ্নবীর দেহরক্ষী মিশিরজী পাশের সারভেণ্ট-কামরা থেকে নেমে এসে পুলিস সাহেবের কামরার সামনে দাঁড়াল। ষ্টেশনের সব কটি প্লাটফরম, সামনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন, অদূরবর্তী রাজপথ ভরে তখন জনস্রোত ছুটেছে এবং এই ট্রেনের যাত্রীরা নতুন একটা স্রোতের মত সেই বিপুল জনসমুদ্রে মিশেছে। সরকারী উর্দী ও তকমার খাতিরে মিশির সেই ভীড়ের ভিতর দিয়ে কুলিদের সাহায্যে লটবহর সহ পুলিস সাহেব ও তাঁর পরিজনদের নিয়ে কোন রকমে পথ করে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে সেঁধুল।

কথা ছিল, কোর্ট ইন্সপেক্টর রামসদয় বাবুর বাসাতেই জাহ্নবী সপরিবার উঠবেন—তিনি গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। কোথায় প্লাটফরুমেই তিনি অপেক্ষা করবেন—তা নয়, জাহ্নবীকেই সপরিবার ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হচ্ছে—এখনো তাঁর দেখা নেই! এই আলোচনাই হচ্ছিল স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে।

সুহাসিনী একটু বিঁধিয়ে বললেন: তোমার বন্ধু ত দিব্যি মজার লোক! জানালেন—সব তৈরী থাকবে, ভালো বাসা, মায় রাতের খাবার পর্যন্ত। আমরা ত এসে পুরোনো হয়ে গেলুম—তাঁর টিকিরও দেখা নেই; পুলিসের লোক কিনা—তাই এমন আক্কেল বিবেচনা!

নিমকের মর্যাদা সম্পর্কে পুলিসের এই পদস্থ ব্যক্তিটি এতই সচেতন যে, পুলিস-লাইনের একটা পাহারাওয়ালার ওপরেও কেউ কটাক্ষ করলে বরদাস্ত করতে পারতেন না। স্ত্রীর কথাটাও নীরবে মেনে নিতে পারলেন না, একটু তিক্ত সুরেই বললেন: জরুরী ব্যাপারগুলো ত স্মারক

এনগেজমেন্ট করে পুলিসের কাছে আসে না—তাই, ঘরোয়া ব্যাপারে সময় ধরে লেগে পড়া সব সময় সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই এমন কোন সংগীন কল্ হয়ত এসেছে—

কথাটায় বাধা দিয়ে সুহাসিনী বলে উঠলেন: যার জন্যে সাধারণ ভদ্রতা বোধকে ঠেলে ফেলে তিনি সেই 'কল্' এর পিছনে ছুটেছেন! আর, আমরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে নাকাল হচ্ছি?

জাহ্নবী অপ্রসন্ন মুখে বললেন: একে নাকাল হওয়া বলে না। বাইরের অবস্থা ত দেখে এলে!

সুহাসিনীও সংগে সংগে উত্তর করলেন: দেখিছি বলেই কথাটা বলছি; আর—এই জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে মানুষ থই থই করছে, দাঁড়াবার জায়গা নেই; আর আমরা চারটি প্রাণী ত এত বড় ঘরখানা দখল করে দিব্যি আরামে বসে আছি! আমার কাছে এটা অস্বস্তি মনে হচ্ছে।

জাহ্নবী বললেন: শাস্ত্রকাররা এই অবস্থাকেই বলেছেন প্রারব্ধ। হাজার হাজার লোক গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে গুড়ের নাগরীর মত গাড়ী বোঝাই হয়ে এসেছে—তারপর ষ্টেশনে নেমে কোথায় বসে রাতটুকু কাটাবে ভেবে পাচ্ছে না; আর আমরা সরকারের খরচে রাজার হালে ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় এসেছি—ষ্টেশনেও যেন ড্রয়িং রুমে বসে আছি—একেই বলে অদৃষ্ট! তোমার এতে সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিল, আর বরাবর সন্তুষ্ট ত ছিলেই—পরের কষ্ট দেখে কোনদিন ত এমন করে হাঁপিয়ে ওঠনি—তবে?

সুহাসিনী বললেন: কোটরের বাইরে ত কোনদিন আনোনি—অন্ধকারেই ছিলুম। এখন ভাবছি—তোমাদের বুলির সঙ্গে কাজের কত গরমিল!

জাহ্নবী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন: তার মানে?

সুহাসিনী বললেন : সেদিন কলকাতায় বাঙলার পুলিস বিভাগের বড়কর্তা এক লম্বা বক্তৃতায় বলেছেন—পুলিস পাবলিকের প্রভু নয়—ভৃত্য ; খবরের কাগজে তাঁর ঐ বক্তৃতা পড়িছি। আর আজ বাইরে বেরিয়ে মিলিয়ে দেখছি—পুলিস আর পাবলিকের সম্বন্ধ !

জাহ্নবী মুখখানা গম্ভীর করে বললেন : কেন, সরকারী চিঠি পত্রে দেখনি—বড় সাহেব চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করার আগে your most obedient servant বলে নাম সহী করেন—এও তাই !

সুহাসিনী বললেন : তাই ভাবি, কথাটা সত্য হতেও ত পারে।

জাহ্নবী : কেমন করে ?

সুহাসিনী : দেশের লোক যদি ওঁদের নজীরে পুলিসকে সত্যিই 'সার্ভেন্ট' ভেবে কাজ বাগিয়ে নিতে এগিয়ে আসে !

কথাটা শুনে মুখের একটা বিচিত্র ভংগি করে জাহ্নবী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠলেন, তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন : এদেশে পুলিস বরাবর প্রভুই থাকবে, আর পাবলিকের ওপর হুকুম চালাবে।

সুহাসিনী বললে : কিন্তু চাকা যেদিন ঘুরবে ?

জাহ্নবী পূর্ব্ববৎ বিকৃত কণ্ঠে উত্তর করলেন : সাত মণ তেলও পুড়বে না—রাধাও নাচবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার—এই সময় ওয়েটিং রুমের ঘড়ি বেজে উঠতে জাহ্নবী সেদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘড়ির কাঁটা এগারোর কোঠায় গিয়েছে। তিনি চমকে উঠে দাঁড়ালেন ইজি চেয়ার থেকে। তারপর টুপিটা র‍্যাক থেকে নিয়ে মাথায় দিয়ে বললেন : ও ! এগারোটা বেজে গেল যে ! আমারই ভুল হয়েছে—এসেই রামসদয়কে ফোন্ করলে আর এ ভোগান্তি হোত না—সেই চেষ্টাই করা যাক্ !—বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

সুহাসিনী কিছু বললেন না—তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, অভিমানের

একটা গভীর ছায়া পড়েছে। জাহ্নবী চলে গেলে তিনি মিনিট পাঁচেক একইভাবে নীরবে বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে নিদ্রিত পুত্র কন্যার গায়ের উপর একখানা রেশমী চাদর মেলে দিলেন ঠাণ্ডা নিবারণের উদ্দেশ্যে।

এই সময় দরজার ওদিকে একটা কলরব শোনা গেল। সুহাসিনী বুঝলেন, মিশিরের বাধা অগ্রাহ্য করে কারা ওয়েটিং রুমে ঢোকবার জন্যে জেদ ধরেছে। তাঁর অনুমানই সত্য হলো। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তিনি দেখলেন—স্ট্রেচারে শায়িত মুমূর্ষু প্রায় এক ব্যক্তিকে নিয়ে একদল ছোকরা তাঁদের ঘরে ঢুকছে। এক সংগে এতগুলি লোককে এভাবে উচ্চশ্রেণীর কামরায় ঢুকতে দেখে সুহাসিনীর মুখে চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল—আশ্চর্য্য এই যে, খানিক আগে এই মহিলাটির মুখেই অসহায় জনগণের দুর্গতি সম্পর্কে গভীর সহানুভূতির বাণী শোনা গিয়েছিল! এখন পিছনের আরাম কেদারাখানির পীঠে পীঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন: এ-ঘরে ওকে আনলেন কেন?

এই সেবাব্রতী দলটিকেই ইতিপূর্ব্বে ট্রেনের জনপূর্ণ কামরায় শৃঙ্খলা স্থাপন করতে দেখা গিয়েছিল। এখানেও সেই দলের প্রতাপ নামে ছেলেটিকে অগ্রবর্ত্তী দেখে সুহাসিনী তাকে লক্ষ্য করেই প্রশ্নটা করলেন, ছেলেটিও তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করল: প্রয়োজন হয়েছে—সেই জন্যে।

উত্তরটা দিয়েই ক্ষিপ্রপদে সে সুহাসিনীর প্রায় সামনে এগিয়ে এসে বলল: মাপ করবেন, এই চেয়ারখানা আমায় নিতে হচ্ছে।—বলেই সে তাঁর পাশের আরাম কেদারা খানার দিকে ঝুঁকল। এই চেয়ারেই জাহ্নবী বসেছিলেন—সেখানেই তাঁহার পরিত্যক্ত টাইম টেবলখানা পড়েছিল। প্রতাপ সেখানা তুলে সুহাসিনী যে চেয়ারখানার পীঠে পীঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার উপরেই নিক্ষেপ করল; কিন্তু জোরে নিক্ষিপ্ত

হওয়ায় নীচে গড়িয়ে পড়ল। 'দয়া করে তুলে নেবেন'—বলেই প্রতাপ অত বড় ইজি চেয়ারখানা অনায়াসে তুলে—তার সংগীরা স্ট্রেচার নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে রেখে বলল : স্ট্রেচারটা তোমরা ভাল করে ধরে থাক, আমি ওঁকে এই চেয়ারে শুইয়ে দিচ্ছি।—বলেই সে স্ট্রেচারে হাত লাগাল।

অন্য সময় হলে এই অতি তৎপর ও দুঃসাহসী ছেলেটিকে সুহাসিনী হয়ত সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দেখতেন, কিন্তু মলিন ও খদ্দরধারী এক মরণাপন্ন অন্ত্যজকে স্ট্রেচারে করে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষে এভাবে আনায় এবং আচরণে অনেকটা ঔদ্ধত্য থাকায় তিনি এই ছেলেটিকে আসামীর পর্য্যায়েই ফেলেছিলেন। যে নারী কিছু পূর্বে এই কক্ষে বসেই জনগণের স্বার্থ সুবিধার সম্পর্কে পুলিসের ঔদাসিন্যে কটাক্ষ করেছিলেন, এখন তাঁর মনে এই আকাংখাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে, ঐ ছেলেটির মত তাঁর দেহে যদি অসাধারণ শক্তি থাকত, তাহলে তিনি তাকে রীতিমত চাবকে এই ঘর থেকে বা'র করে দিতেন। রুদ্ধ রোষে দাঁতে ঠোঁটটি চেপে শুধু অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে এই দুর্দান্ত ছেলেটির পানে চেয়ে রইলেন।

একটু পরেই সতেরো আঠারো বছরের একটী মেয়ে দিব্যি সপ্রতিভ ও অসংকোচভাবে আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলে কামরায় ঢুকল, তার হাতে কালো রংয়ের একটি ছোট ব্যাগ। মেয়েটির পিছনে ছিপছিপে লম্বা শীর্ণদেহ এক বর্ষীয়ান পুরুষ, তাঁর পরণে ঢিলা পাজামা, লম্বা কোট, মাথায় পার্শি প্যাটার্ণের টুপি। মেয়েটি এসেই বলল : ডাক্তার চৌধুরী এসেছেন।

ছেলেরা হাত তুলে ডাক্তারকে নমস্কার করল। প্রতাপ একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল : এত শীগ্‌গীর কি করে একে ধরে আনলে দুর্গা?

মেয়েটির নাম দুর্গা। অনিন্দ্যসুন্দরী, সুহাসিনীও মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিটোল বলিষ্ঠ চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি কলকাতার মেয়ে, বহু রূপসী দেখেছেন; কিন্তু কোনো কিশোরীর দেহে এই ধরণের একটা অপরূপ লাবণ্য বুঝি এই প্রথম দেখলেন।

প্রতাপের কথার উত্তরে দুর্গা বলল: ডাক্তার বাবু যে আমাদের দলেরই প্রতাপদা! রুগীর জন্যে ডাক্তার খুঁজতে হয় এই ত জানি, কিন্তু ইনি যে রুগীদের খুঁজে বেড়ান। নিজের গাড়ীতেই ষ্টেশনে এসে নেমেছেন—সেই সময় আমার সংগে দেখা, অমনি ধরে এনেছি। ব্যাগটা কি খুলব ডাক্তাবাবু?

ডাক্তার চৌধুরী এতক্ষণ ষ্টেথিসকোপ লাগিয়ে রুগীর বুক পরীক্ষা করছিলেন। বললেন: হ্যাঁ মা, ব্যাগটা খোল, একটা ইনজেকসান দিতে হবে।

মুমূর্ষু ব্যক্তি এই সময় ক্ষীণকণ্ঠে বলল: জ—ল।

দুর্গা প্রতাপের মুখের দিকে চাইল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে প্রতাপ বলল: চিন্তা নেই—জল ঘরেই আছে।—বলেই সে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল—সেখানে পালিস করা একটা কাঠের আধারে কালো রঙের একটি সোরাই দেখা যাচ্ছিল। এটি জাহ্নবীর সঙ্গেই এসেছে দেওঘর থেকে। সেরাইএর মুখটি একটি রূপার গ্লাসে ঢাকা ছিল। প্রতাপ গ্লাসটি তুলে সোরাই থেকে জল ঢালতে উদ্যত হলে সুহাসিনী অপ্রসন্ন ভংগিতে বলে উঠলেন; ওটা আমাদের।

দুর্গা এতক্ষণ সুহাসিনীকে লক্ষ্য করে নাই। নারীকণ্ঠের স্বর শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে সুহাসিনীর ঠিক সামনে গিয়ে মৃদু হেসে বলল: আমাদেরই কি আপনি পর ভাবছেন কেন মা? এঁরা আপনার ঘরের ছেলে না

সামনে পরিচিত হয়ে তিনি রীতিমত একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু মেয়েদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সুহাসিনী দুর্গাকে সাদর স্নেহ সম্ভাষণ না করে পারলেন না। দুর্গাও কাকিমাকে প্রণাম করেই ছেলে মেয়েকে জাগিয়ে তুলে এক নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

এই সময় ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন: বাস, রোগী চাংগা হয়েছে, আর ভয় নেই।

তিনি দরজার দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে জাহ্নবীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: বুঝতে পারছি, আপনি পুলিস বিভাগের কোন হোমরাচোমরা অফিসার—ষ্টেশনের এই ওয়েটিংরুমটা হাসপাতাল হওয়াতে ভারি বেজার হয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই রকমের একটা ঘটনার কথা আপনাকে না শুনিয়ে থাকতে পারছিনে। সেবার লাটসাহেবের স্পেসাল ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—তিনি সফরে বেরিয়েছেন। এই ঘরখানাতেই তাঁর বৈঠক বসেছে; তিনি তখন খুবই অসুস্থ; কিন্তু সেই অবস্থাতেই বেরুতে হয়েছে। বিহার সার্কেলের সরকারী অফিসার, আর জন-কয়েক বিশিষ্ট ভদ্র লোকের সংগে দেখা করবার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন এই ষ্টেশনে। সংগে তিন জন ডাক্তার—একজন ইংরেজ, দুজন বাঙালী। মিটিং ভাঙবার একটু আগেই ষ্টেশনে হলো একটি য়্যাকসিডেণ্ট; খবরটা লাটের কাণে উঠতেই তিনি তখনি মিটিং বন্ধ করে সেই আহত লোকটাকে আনিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে তাঁর ডাক্তারদের হুকুম করলেন। সেই তিন ডাক্তারের মধ্যে এই অধমও ছিল। আমার বেশ মনে আছে, লাটসাহেব নিজে সেই লোকটির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তদ্বির করছিলেন, পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—'ভয় নেই, তুমি সেরে উঠবে।' আমাদের এই রোগীর সম্বন্ধে এই নজীরটুকুই কি যথেষ্ট নয়?—বলেই তিনি সবেগে দরজাটি ঠেলে

বেরিয়ে গেলেন—একজন স্বেচ্ছাসেবক তাঁর ব্যাগটি নিয়ে পিছু পিছু ছুটল।

৬

বাঁকিপুর মহল্লার এক নিভৃত অংশে রামসদয় বাবুর বাড়ীখানি ছবির মত চিত্তাকর্ষক। পৈতৃক বাড়ীখানিকে তিনি নিজের রুচি-অনুসারে নির্মাণ করিয়েছেন। হাতাওয়ালা সুশ্রী দেউড়ী—দুইজন সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পর্যায়ক্রমে কেউ না কেউ সেখানে মোতায়েন থাকে। সুবৃহৎ সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম, প্রত্যেক ঘরখানি দামি দামি আসবাবপত্রে সাজানো। রামসদয় বাবুর স্ত্রী সম্প্রতি ছেলেপুলেদের নিয়ে কলকাতায় পিত্রালয়ে গেছেন, কাজেই এত বড় বাড়ী খালিই পড়ে আছে। সুহাসিনীর মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, বাড়ীখানি দেখে এবং গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়নের প্রাচুর্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাড়ীতে চাকর, দাসী, বেয়ারা, পাঁচক—কিছুরই অপ্রতুল নেই।

ভোজের টেবিলে ব'সে জাহ্নবী সহাস্যে বললেন: করেছ কি হে—কলকাতার নিউ মার্কেটটা আমাদের জন্যে তুলে এনেছ নাকি?

রামসদয় বাবু উত্তর করলেন: ভুলে যাচ্ছ ভায়া—পাটনা এখন বিহারের ক্যাপিটাল। সব দিক দিয়েই কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে—সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসই এখানে পাবে—মায় গলদা চিংড়ি, ভেটকী মাছ পর্যন্ত।

মৃদুকণ্ঠে সুহাসিনী বললেন: সে ত দেখছি—ত্রুটি কিছুই রাখেন নি।

ভোজনের সংগে যদুপতির প্রসংগ উঠতেই জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন : দাদার ব্যাপারটা এখন বলত শুনি? ওঁর এখনকার প্রিন্সিপল্টা আগেই জানা উচিত।

মুখখানা একটু গম্ভীর করে রামসদয় বাবু বললেন : সে ভাই, অনেক কথা। তোমার দাদা যে বিরাট প্রতিভা ও উঁচুদরের 'আইডিয়া' নিয়ে পাটনায় এসেছিলেন, যদি ঠিক প্রপার চ্যানেল দিয়ে কংগ্রেসের কাজেই তা লাগাতেন, আজ উনিই হতেন লীডার, মিনিষ্টারীর মাথায় গিয়ে বসতে পারতেন। কিন্তু কাল হলো ওঁর নিজস্ব মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকা। নিজের কোলে ঝোল টেনে কাজ গুছুতে পারলেন না—শুধুই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে চলেছেন; সুভাষ বোসের ভূত এখন ওঁর ঘাড়ে চেপেছে—কাজেই হাই-কমাণ্ডের বিষ নজরে পড়েছেন। আর সরকার ত জেনে রেখেছে—প্রফেসর যদুপতি মস্ত এক বিপ্লবী—সুভাস বোসের উলটো পীঠ! এই দেখনা—এসেই ডোমিসাইল্ড সারটিফিকেট তুলে দেবার জন্য এক সাংঘাতিক আন্দোলন সুরু করলেন, অবিশ্যি ওঁরই চেষ্টায় ওটা উঠে গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা হলো ঠিক পার্টিসন্ অব বেংগল রদ করার মত—বিহারী কর্তারা চটে আগুন হয়ে রইলেন; কাজেই ওঁর উন্নতির রাস্তায় পড়ল পাথরের বেড়া।

জাহ্নবী এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন :এখন কি করছেন?

রামসদয় বাবু : সে এক বিরাট ব্যাপার! কবি রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষ বোসের স্বপ্ন উনি সত্য করতে চান আর কি! মহাজাতি-সংঘ গড়বার জন্যে মহাসাধনা সুরু করেছেন। আর এই মহাজাতির আস্তানার যে পরিকল্পনা ওঁর মাথায় এসেছে, শুনলে চমকে উঠবে ভায়া! জানত, ইংরেজ-সরকার বাঙলার অনেকগুলো অঞ্চলকে কেটে ছেটে বিহারের সংগে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেস আবার সরকারের এই

সিদ্ধান্ত পাল্‌টে দিয়ে ভাষার ভিত্তিতে বাঙলা থেকে কেড়ে নেওয়া ঐ অঞ্চলগুলি বাঙ্‌লাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বিহারীদের এতে ভারি আপত্তি—মুখে যদিও কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না, তবে তলে তলে চেষ্টা করছে যাতে কংগ্রেসী সিদ্ধান্ত পালটে যায়—যে সব অঞ্চল ইংরেজ-সরকারের মেহের-বাণীতে বিহারের কোলে এসে পড়েছে, বাঙ্‌লা দেশ কস্মিনকালেও সে অঞ্চলগুলো যেন ফিরে না পায়। এর জন্যে তারা ঐ সব অঞ্চলের বাঙ্‌লা-ভাষী আশী পার্সেণ্ট বাসিন্দাকে হিন্দী শিখিয়ে বিহারী বানাতেও তোড়জোড় ফেলতে আরম্ভ করেছে। এখন তোমার দাদা যদুপতি এক ফতোয়া দিয়েছেন—মহাভারতের যুগ থেকে প্রাচ্য প্রদেশ ছিল আলাদা, তার নাম ছিল—প্রাচ্য জনপদ বা প্রাচী সাম্রাজ্য। মহারাজ জরাসন্ধ ও মহারাজ ভগদত্ত—এই প্রাচ্য জনপদের দুই বিখ্যাত নেতা ছিলেন; মহাভারতীয় যুদ্ধের পরবর্তী যুগেও এই প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রসিদ্ধ ছিল। সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, শশাংক, গোপাল, দেবপাল, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এঁরা ছিলেন প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সম্রাট—বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্‌লা, আসাম প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্যপ্রদেশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর মোসলেম যুগে সুবা বাঙ্‌লার উৎপত্তি; সমস্ত উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড—সাঁওতাল পরগণা থেকে সমস্ত বিহার—সমস্ত বাঙ্‌লা ও আসাম ছিল সুবা বাঙ্‌লার অন্তর্গত। ইংরেজ-সরকারও শ্রদ্ধার সংগে এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে আসছিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, সিদ্ধান্তটি সুবা বাঙ্‌লার বাসিন্দাদের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, তার শাসকদের পক্ষে ততখানি প্রতিকূল। কারণ, উড়িষ্যার প্রান্ত থেকে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা সমগ্র ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

এতগুলি লোক যদি একই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পায় এবং উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে শাসকশক্তির পক্ষে সেই মহাজাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা দুরূহ হয়ে উঠবে। লর্ড কার্জনের উর্বর মস্তিষ্কে এই আতংক প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রমে তাঁরই নির্দেশে বৃটিশ বুরোক্রেশী সুবা বাঙ্‌লাকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাচ্য জনপদ ভেঙে দিয়েছেন, দেশ ও জাতিকে পংগু করে রেখেছেন। এখন অতীতের ঐতিহ্য স্মরণ করে উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা ও আসাম এই কয়টি প্রদেশকে আবার পূর্বের মত একই সুবা বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে—এই বিস্তীর্ণ জনপদ প্রাচ্য সাম্রাজ্য আখ্যা নিয়ে এক মহান্ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এর অধিবাসীদের সংজ্ঞা হবে—মহাজাতি। বাঙালী, বিহারী, উড়িষ্যা, সাওতাল, আসামী বলে আলাদা কোন জাতি থাকবে না। বাঙলা, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমিয়া—এই চারিটি ভাষা রাষ্ট্র ভাষা বলে গণ্য হবে, বাধ্যতামূলকভাবে চারিটি ভাষাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে। চার প্রদেশের চারটি প্রসিদ্ধ নগরে চারিটি রাষ্ট্র পরিষদ থাকবে—বছরে দুইদিন চারিটি শাসন পরিষদের কর্তৃপক্ষের মিলন-বৈঠক হবে। অবিশ্যি, মাথার ওপরে থাকবে কেন্দ্রীয় পরিষদ, কিন্তু প্রাচ্যরাষ্ট্র পরিষদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। …এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে আপনার দাদার এখন সাধনা চলেছে।

জাহ্নবী কথাগুলো শুনে গুম হয়ে রইলেন। কিন্তু সুহাসিনী সহর্ষে বললেন: ওঁর এই পরিকল্পনা তো খুব মহৎ। আজকাল প্রাদেশিকতা নিয়ে যে রকম গোল বেধেছে—বাঙালীকে অন্য প্রদেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বিহারী, আসামী, এমন কি উড়িয়ারা পর্যন্ত যেভাবে দল বেধেছে—তাতে ওঁর এ প্রস্তাব ত খুব দামী—সকলেরই উচিত এর সমর্থন করা।

গম্ভীরভাবে জাহ্নবী বললেন: আসলে বৃটিশ সরকার এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন না কখনই। অনেক ভেবে চিন্তেই তাঁরা প্রদেশগুলোকে এভাবে ভেঙেচুরে গড়বার ব্যবস্থা করেছেন।

সুহাসিনী বললেন: বৃটিশ সরকার এদেশ ছেড়ে চলে গেলে, তার পরেও ত ওঁর প্রস্তাব কাজে লাগানো যেতে পারে।

কথাটা শুনে রামসদয় বাবু জোর গলায় হেসে উঠলেন। মুখখানা আরো গম্ভীর করে জাহ্নবী বললেন: বৃটিশ সরকার এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন—এ আইডিয়া কি তোমার মাথায় এখনো ঘোরাঘুরি করে নাকি?

সুহাসিনী বললেন: তাহলে কংগ্রেসের এত আয়োজন কি সব বৃথা? সুভাস বোস তাঁর আন্দোলনের সুরু থেকে ইংরেজকে সরে যাবার জন্যে যে হুমকী দিয়েছেন—গান্ধীজী এই বুড়ো বয়সে এখনো কংগ্রেসের সঙ্গে যে ভাবে লড়াই করছেন, তার কি কোন দাম নেই? এ সব কি বৃথা?

জাহ্নবী বললেন: একজন অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বাড়ীতে নজরবন্দী হয়েছিলেন, তারপর চোরের মতন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নিরুদ্দেশ পথে পাড়ি দিয়েছেন। সবই করলেন তিনি—এই ত ইংরেজ-বিদ্বেষের পরিণাম! শেষকালে জেলপালানো আসামীর বদনাম নিতে হলো।

দৃঢ়স্বরে সুহাসিনী বললেন: না—তোমার এ কথার আমি প্রতিবাদ করছি। তুমি এই ভাবে পালানোর জন্যে সুভাষ বোসকে জেল-পালানো আসামী বলছ, কিন্তু দেশের লোক তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজকে মহাত্মা শিবাজীর কাজের সংগে সমান করে দেখেছেন। ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর এই নিরুদ্দেশযাত্রার পিছনে দেশের লোক অনেক বড় সম্ভাবনার কথা ভেবে আশায় দিন গুণছে তা ভেবেছ কখনো?

রুক্ষস্বরে জাহ্নবী বললেন : তা আর ভাবিনি, ভাববিলাসী জাতির এই আশাই যেখানে সম্বল ! কিন্তু এ আশাও শীগ্‌গীর ভেঙ্গে পড়বে জেনো। আর একটা কথা বলি, শোন: যখন ইংরেজকে অবলম্বন করেই আমাদের ভাত-ভিত্তির সংস্থান করতে হয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে এভাবে মতবাদ প্রকাশ করা তোমার পক্ষে কিন্তু বাহাদুরী নয়।

রামসদয় বাবু নীরবে এতক্ষণ স্বামি-স্ত্রীর বিতর্ক শুনছিলেন, এই সময় হাসতে হাসতে বললেন : তা বোলে জাহ্নবী, এঁদের মুখে হাত চাপা দিতে পারবে না হে ! এই টেবিলে খেতে বসে গিন্নীর সঙ্গে ঠিক এইভাবে কত কথা কাটাকাটি যে হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। তাঁরও স্বভাবটি ঠিক এই রকম। তিনি আবার তোমার দাদার একজন মস্তবড় ভক্ত। বলেন, সারা বিহারে মানুষের মত মানুষ যদি কেউ থাকে, সে এই যদুপতি মিত্তির। যেন দ্রোণাচার্য্য—যে সব ছেলে গড়ছেন, প্রত্যেকেই এক একটি অর্জ্জুন। তিনি আবার কি ভেবে রেখেছেন জানো, আমাদের দশ বছর বয়সের ছেলে শম্ভুকে ওঁর টোলে ভর্তি করে দেবেন মানুষ করবার জন্যে—শোন কথা ! আমি ভাই, ভাল করেই ভেবে চিন্তে দেখেছি, আমরা যতবড় ইংরেজভক্ত হই না কেন—ওদের স্বার্থরক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লাগি না কেন, অন্দরমহলে কিন্তু দেশাত্মবোধের ধারা বহে চলেছে—এ হচ্ছে যুগের হাওয়া ভায়া, যুগের হাওয়া।

সুহাসিনী বললেন : দেখুন, মেয়েরা গুণ বিচার করে তবে কথা বলে। সত্যিকার গুণীকে তারাই খুঁজে বার করতে জানে। এই যে ইনি, এঁর দাদার কথা সব চেপে রেখেছিলেন, কিন্তু খবরের কগজে তাঁর কীর্তিকথা ছাপা ত বন্ধ করতে পারেন নি ? অবশ্যি, সব খবর আমি পাইনি, তবুও ছিঁটেফোঁটা যা পড়েছি, তাতেই জেনেছি যে,—উনি একজন সত্যিকার দেশকর্মী, সত্যিকার নেতা, সত্যিকার মানুষ ! মিনিষ্টারীতে উনি নাই

বসুন, আর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নাই হোন—এই যে ওঁর পরিকল্পনার কথাটা আপনি শোনালেন—নিশ্চয়ই ওটাকে ওঁর ব্যর্থ জীবনের একটা ভূতের বেগার খাটার সামিল করেই আপনারা হয়ত ধরে নিয়েছেন—কিন্তু সত্যি করে বলুন ত, কি বিরাট কল্পনা, কি উদার চিন্তা !, বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্‌লা, আসাম—এই চারটে প্রদেশের লোকের মধ্যে যে রেষারেষি খেওয়ো-খেওয়ি ব্যাপার চলেছে—ওঁর প্রস্তাব মত যদি কাজ হয়, চারটে প্রদেশ মিশে এক হয়—সত্যিই বলুন ত, কত বড় একটা রাষ্ট্র হবে, আর তার বাসিন্দারা যদি মহাজাতি আখ্যা পায়—কত বড় একটা বিরোধের অবসান হতে পারে ! প্রস্তাবটির কথা শুনেই ওঁর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা হয়েছে কি বলবো !

খাওয়া এখন শেষ হয়ে এসেছে। জাহ্নবী বললেন : আচ্ছা এই-খানেই আজ ড্রপ ফেলা যাক। রাত অনেক হয়েছে। দাদার প্রসংগ শুনেই এত, না জানি তাঁর কর্মপীঠ দেখে কি করবে ! আচ্ছা রামসদয়, মোটামুটি অবস্থাটা ওঁর এখন শুনিয়ে দাও ত—বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেস হাইকমাণ্ড—এঁদের কাছে আমার দাদার খাতিরটা কেমন ?

রামসদয় বাবু বললেন : সে কথা ত আগেই বলেছি—তোমার দাদা যদি সুবিধাবাদী হতেন, ১৯৩৫ এর শাসন সংস্কারসূত্রে উনিই হতেন কংগ্রেসের লীডার। এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উনি ওদিকে এগিয়ে গেলেন না ; বললেন—মানুষ তৈরী করবার যে ভার নিয়েছি, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তাহলে আই-সি-এস এর চাকরী ছেড়ে এলাম কেন ? আমি কোন কর্ত্তৃত্ব করতে চাইনে দেশের শাসন ব্যাপারে—তবে কাজের নির্দেশ দিতে চাই ; সেইগুলি মানলেই যথেষ্ট। এর ফলে এক দলের খুবই সুবিধে হয়েছে ; আর সরকার ত খুসি হবেনই—এই লোকের হাতে মিনিষ্টারী পড়লে সরকারকে অকুল পাথারে পড়তে হতো। এখন ওঁর,

আর ওঁর দলটির ওপরে নজর রেখেই সরকার নিশ্চিন্ত। তবে ওঁর মহাজাতি দলও তৈরী হয়েছে—তাদের ক'জনকে আজ ষ্টেসনেই ত দেখেছো! ইংরেজের জেলখানা একটা কপাট খুলে এদের পানে তাকিয়ে আছে—খালি হুকুমের ওয়াস্তা। এ-দলে সব জাতের লোক পাবে—হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ—তারপর প্রদেশের দিক দিয়ে বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধিয়া, সম্বলপুরী, সাওতাল ইত্যাদি; কিন্তু প্রত্যেকেই হচ্ছে—মহাজাতি। কাল ওঁর আশ্রমে গেলেই সব দেখতে পাবে। তবে ভায়া, আমার ধারণা—উনি ভস্মে ঘি ঢালছেন।

৭

পরদিন প্রত্যূষে রামসদয় বাবু ড্রয়িং রুমে ঢুকেই সবিস্ময়ে দেখলেন—অত সকালে দুর্গা একাই এসে উপস্থিত, একখানা চেয়ারে বসে তাঁরই প্রতীক্ষা করছে।

রামসদয় বাবুকে দেখেই দুর্গা তাড়াতাড়ি উঠে করযোড়ে নমস্কার জানাল। দুর্গাকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই রামসদয় বাবু বললেন: বাঁকিপুর মহল্লা থেকে তুমি আসছ মা, আর—এঁরা এখনও ঘুমোচ্ছেন; এদিকে চায়ের জল তৈরী।

দুর্গা তার আয়ত দুটি চোখের সুশ্রী ভ্রূ-যুগল নাচিয়ে বলল: আপনি বুঝি ভেবেছেন কাকাবাবু, আমি এখানে এসে ঠায় বসে আছি? সে মেয়েই আমি নই; উপরে গিয়ে তাড়াহুড়ো দিয়ে সবাইকে জাগিয়ে তুলেছি—হাত মুখ ধুয়ে সব আসছেন।

দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাসি ফুটিয়ে রামসদয় বাবু বললেন : তাই নাকি! আমি ভেবেছিলুম, এইমাত্র এসে এ ঘরে বসেছ! খুব বাহাদুর মেয়ে ত তুমি মা! আচ্ছা, আমি তাহলে চায়ের তাড়া দিয়ে আসি।

একটু পরেই উপর থেকে জাহ্নবী বাবু সপরিবার নেমে এলেন, পাঁচক ও ভৃত্যগণ টেবিলে চা ও প্রাতরাশের ভোজ্য পরিবেষণ করতে লাগল। দুর্গাকে প্রাতরাশে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করবার আগেই সে বলল : আমার এ পাট এখনো হয় নি কাকাবাবু, হাত মুখ ধুয়েই চলে এসেছি—জানি, আপনি চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু এত সকালে এ সব আয়োজন কেন কাকাবাবু! শুধু রুটি মাখন হলেই যথেষ্ট হতো।

সুহাসিনী সহাস্যে বললেন : কাল রাতের খাবার আয়োজন যদি ওঁর দেখতে! আমাদের জন্যে কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

রামসদয় বাবু বললেন : কত ভাগ্যের জোরে আপনাদের পেয়েছি, যদি খাবার একটু বাড়াবাড়ি করেই থাকি, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

জাহ্নবী নীরবে দুর্গার বিহসিত মুখখানির দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন : তুমি আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে এসেছ নাকি?

সুগৌর মুখখানা কৌতুক-হাস্যে পরিপূর্ণ করে, দুর্গা সুহাসিনীকে লক্ষ্য করে বলল : কাকাবাবুর কথা শুনুন এখন! আমি কি তাহলে চা খাব বলে দু মাইল পথ ভেঙে এখানে এসেছি?

রামসদয় বাবু বললেন : আমি বলছিলাম কি মা-লক্ষ্মী, তোমার বাবার সংঘ নিয়ে তুমিও ত কম ব্যস্ত নও জানি—ছত্রের মেলায় তোমাদেরও ক্যাম্প পড়েছে, সংঘের প্রচার কাজ চালাবে। কাজেই এ সময় এঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলে ঝনঝাট বাড়বে না?

কলহাস্য করে দুর্গা বলে উঠল : আপনি কিন্তু এবার নিজের কথাতেই মস্ত ভুল করে ফেললেন কাকাবাবু! আমাদের বাঁকিপুরের বাসায় কাকী-

মার পায়ের ধুলো যদি পড়ে, তিনি সেখানে নিশ্চয়ই অতিথির মতন আরাধ্য হয়ে থাকবেন না—আমার মায়ের মতনই কর্তৃত্ব করবেন। আমার আর বাবার অভাবে মেলায় সংঘের কাজের কোন ক্ষতি হবে না, আমাদের মতন অনেক কর্মীই সেখানে আছেন।

অপ্রসন্ন মুখে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের সংঘের কাজটা কি?

প্রশ্নটা শুনে দুর্গার সহাস্য মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল, একটু থেমে সে উত্তর করল: আপনি কি মহাজাতি সংঘের উদ্দেশ্যের কথা শোনেন নি কাকাবাবু? বাবার ধারণা—ইংরেজ যদি কোন দিন এ-দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন বাঙলা দেশকে খাঁটো আর দুর্বল করবার জন্যে যে-সব অঞ্চলগুলো ছেঁটে আর আর প্রদেশের সংগে জুড়ে দিয়েছে, তখন সেই অঞ্চলগুলো নিয়ে প্রাদেশিকতা কলহের সৃষ্টি হবে। ইংরেজ জানে, বাঙলা ও বাঙালী কি চীজ, জালিয়ানওয়ালায় নৃশংস অত্যাচার করে তারা পাঞ্জাবকে ঠাণ্ডা করেছিল, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে অঞ্চলের পর অঞ্চলে দমননীতি চালিয়েও বাঙলার আন্দোলন থামাতে পারেন নি। পাঞ্জাবের মত বাঙলাকেও ঠাণ্ডা করবার জন্যে ইংরেজের চরম চাল হচ্ছে—বাঙলার অংগচ্ছেদ, বাঙলা দেশটির বাঙলা-ভাষী জেলাগুলোকে ভিন্ প্রদেশের সংগে জোড়াতাড়া দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করা। ইংরেজের এই নষ্টামী ধরেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, তারপর দেশবন্ধুও জেনেছিলেন কি ভেদ-বীজ ইংরেজ বুনে দিয়েছে দেশের বুকে। তাঁদের চেষ্টায় কংগ্রেসও ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মহাসভায় প্রস্তাব তুলেছিলেন—ইংরেজের এ নষ্টামী চলবে না, তাঁদের হাতে ক্ষমতা এলেই ওসব কাটা-ছাটা পাল্টে দিয়ে যেমনটি ছিল, তেমনি করেই দেশ গড়বেন। আর সেটা হবে ভাষার ভিত্তিতে—কেননা, তাহলে কোন পক্ষ থেকেই আর

আপত্তি উঠবে না। কিন্তু ১৯৩৫এ কতক ক্ষমতা হাতে পেয়েও এর কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি, ইংরেজ-সরকারও বাঙলার অঞ্চল বাঙলাকে ফিরিয়ে দিতে রাজী নন। এর পর শাসন ক্ষমতা আরো বেশী করে নেতাদের হাতে এলেও ইংরেজ তলে তলে শত্রুতা সাধবে—বাঙলা যাতে তার হারানো অঞ্চলগুলো ফিরে না পায়, সেই চেষ্টাই করবে, আর করছেও। তাই, বাবা ইংরেজের থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার জন্যে গড়েছেন এই মহাজাতি সংঘ। উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্য্যন্ত সারা দেশ এক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, রাষ্ট্রের নাম হবে—মহাপ্রাচী বা প্রাচ্যরাষ্ট্র, আর রাষ্ট্রবাসীরা নিজেদের মহাজাতি বলে পরিচয় দেবে।

জাহ্নবী বললেন: হ্যাঁ, কাল রাতে রামসদয় আমাকে তোমার বাবার এই সব পাগলামির কথা কিছু কিছু বলেছিলো বটে! তোমার মুখে এটা আরো স্পষ্ট করেই শোনা গেল।

মুখখানা শক্ত করে দুর্গা বলল: পৃথিবীতে যাঁরা বড় কাজ করতে কোমর বাঁধেন, এ অপবাদ তাঁদের সকলকেই নিতে হয়েছে কাকাবাবু! যাক্, আপনি গুরুজন—আপনার সংগে আমি এই নিয়ে তর্ক করব না, আর করা উচিতও নয়। কিন্তু বাবা পাগলই হোন আর যাই হোন, তিনি যখন আপনার দাদা, আমি আপনাকে না-নিয়ে গিয়ে কিন্তু ছাড়ছি নে।

মনে মনে কি ভেবে জাহ্নবী বললেন: কিন্তু আজ কি করে হবে? বেলা দেড়টায় আমাদের কন্‌ফারেন্স বসছে।

হাসতে হাসতে দুর্গা বলল: কিন্তু আমরা কি আপনাকে বাবার ব্যায়ামশালায় কয়েদ করে রাখব কাকাবাবু—যে ঠিক সময়ে কন্‌ফারেন্সে হাজির হতে বাধবে? খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা জিরিয়ে একটার আগেই যাতে আপনি কন্‌ফারেন্স পৌঁছাতে পারেন, সে ব্যবস্থা করবার ভার আমি নিলুম—কাকাবাবু সাক্ষী রইলেন

এর পর আর কথা চলে না; কাজেই প্রাতরাশ শেষ করেই জাহ্নবীকে সপরিবার দুর্গার সংগে তাদের বাঁকিপুরের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হলো।

৮

বাঁকিপুর মহল্লার প্রান্তভাগে অপেক্ষাকৃত এক নিভৃত অংশে সুবিস্তীর্ণ উদ্যান-সমন্বিত একখানি দ্বিতল বাড়ী দীর্ঘ মেয়াদির লীজ নিয়ে অধ্যাপক যদুপতি বহু বর্ষ ধরে বসবাস করছেন। এই বাড়ীতেই তাঁর কন্যা দুর্গা জন্মগ্রহণ করে—আবার, সাধ্বী সহধর্মিণীর শেষ নিশ্বাস এখানকার বায়ুর সংগেই মিলিত হয়ে তাঁর স্মৃতিটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এইখানেই তাঁর মহাজাতি সংঘের কর্মশালা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-পীঠ—নানা বিভাগ আশ্রয় করে বর্ষের পর বর্ষ ধরে সুশৃংখলে চলে আসছে।

সত্যকার শিক্ষার দিক দিয়ে মানুষ গড়বার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে সব অভিনব ব্যবস্থা ও বিধিবদ্ধ প্রণালীগুলি এই বিস্তীর্ণ উদ্যান ও অট্টালিকাটির বিভিন্ন কক্ষে দেখা যায়—যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিতেও সেগুলি বিস্ময়াবহ মনে হবে। এমন কি, উদ্যানের এক জংগলাচ্ছন্ন নিভৃত অংশে অবস্থিত অতিকায় এক তিন্তিড়ি গাছের বিস্তীর্ণ কাণ্ডে লক্ষ্যভেদের নানা নিদর্শনও দর্শক চক্ষুকে চমৎকৃত করে।

বাড়ীর ফটকের সামনে গাড়ী থামতেই যে কয়জন বলিষ্ঠ দেহ তরুণ জাহ্নবীর অভ্যর্থনায় ছুটে এলো, তাদের প্রায় অধিকাংশকেই গত রাত্রে ষ্টেশনে জাহ্নবী দেখেছিলেন। সুতরাং মুখখানা তাঁর সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল। দলের অগ্রবর্তী প্রতাপ নামে ছেলেটি হাত দুখানি যুক্ত করে

সবিনয়ে বলল: কাল রাতে ষ্টেশনে তাড়াতাড়িতে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার ফুরসদটুকু আর পাইনি, তাই আমরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জাহ্নবী প্রতাপের দিকে একবার চাইলেন, তারপর মুখখানা ফিরিয়ে উপেক্ষার সুরে বললেন: তার কোন দরকার নেই।

তথাপি বিনীত কণ্ঠে প্রতাপ বলল: কিন্তু আমরা যে সেই থেকে অস্বস্তি বোধ করছি, স্যার!

রুক্ষকণ্ঠে জাহ্নবী প্রশ্ন করলেন: কেন?

প্রতাপ বলল: আমাদের জন্যে আপনারা ষ্টেশনে অনেক অসুবিধা ভোগ করেছিলেন; আপনিও যে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, তাতে ভুল নেই। তাই—

শ্লেষের সুরে জাহ্নবী বললেন: স্তব স্তুতিতে প্রসন্ন করতে চাও?

সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রতাপ বলল: আজ্ঞে—তাই; শ্রদ্ধাভাজন কারুর প্রতি কাজে বা কথায় অশিষ্ট ব্যবহার কিছু করলে ক্ষমা চেয়ে স্তব স্তুতিতে তাঁকে প্রসন্ন করা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন! দেবতারাও স্তব-স্তুতিতে প্রসন্ন হন।

জাহ্নবী বললেন: কিন্তু আমি দেবতা নই—পুলিস। স্তব-স্তুতিকেও আমরা ঘুষের সামিল মনে করি।

প্রতাপ এবার একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই উত্তর করল: শ্রদ্ধাকে যদি আপনি ঘুষ বলে হেয় করতে চান, তাহলে আমরা অগত্যা মুখ বন্ধ করছি। আপনি আমাদের গুরুর কনিষ্ঠ, তাই—

রুক্ষকণ্ঠে জাহ্নবী বললেন: আমার সংগে 'ফ্যামিলিয়ারিটি' করতে এসেছ? কিন্তু এইখানেই তোমাদের মস্ত ভুল হয়েছে। আমার দাদা তোমাদের সংগে অবাধে মিশে আস্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন তা বেশ

বুঝিছি, কিন্তু তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলতে আমার মাথাকাটা যাচ্ছে তা জান ?

প্রতাপের সব সহিষ্ণুতা এখন বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল ; সেও এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করল : যে-হেতু আপনি পুলিস অফিসার ! কিন্তু, রাগ করবেন না স্যার, একটা কথা তাহলে বলি—আমরা যে আপনার স্তুতিবাদ করতে চাইছিলাম, শুধু আপনি আমাদের গুরুর ভাই ব'লে, আপনার চাপরাস দেখে নয়। গুরুকে আমরা দেবতার স্থানে বসিয়ে পূজো করি, আপনি গুরুর ভাই—সেই ফুল তাই আপনার পায়েও শ্রদ্ধার সংগে দিতে পারি, কিন্তু এই সম্বন্ধ অস্বীকার করে আপনি যদি শুধু পদমর্যাদার চাপরাস পরে আমাদের সামনে আসেন—তখন আপনার স্থান হবে তার অনেক নিচে। দেবতার কাছে বসা ত দূরের কথা—তার মন্দিরেও তখন আপনার প্রবেশ নিষেধ।

কাকার প্রকৃতির পরিচয় প্রাতরাশের সময় রামসদয়বাবুর বাড়ীতেই দুর্গা পেয়েছিল। এখানে এসেই তাঁর ঔদ্ধত্যের আভাষ পেয়েই সে এক রকম ছুটতে ছুটতেই পিতার সন্ধানে উদ্যানে ধাওয়া করেছিল। অধ্যাপক যদুপতি তখন নবাগত কতিপয় ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দিচ্ছিলেন। জাহ্নবী এসেছেন শুনে তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। দুর্গা কাকিমা ও তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলল।

বসবার ঘরের চারদিকেই বড় বড় আলমারি, তার তাকগুলি গ্রন্থে ভরা। একদিকে লম্বা টেবিলের উপর নানা প্রকার বীজাণু সংরক্ষিত। ঘরের মধ্যে এসে যদুপতি বললেন : এরা প্রত্যেকেই আমার ছেলের মতন ;

কত কাঠ খড় পুড়িয়ে—কত বছরের কত চেষ্টায় এই ক'টি রত্নকে তৈরী করেছি—তার কাহিনী যদি শোন ত অবাক হয়ে যাবে, জাহ্নবী।

যদুপতির কথা তখনও শেষ হয়নি—আরও বক্তব্য আছে জেনেও জাহ্নবী অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন: ফিরিস্তি শোনাবার দরকার হবে না দাদা, রত্নগুলিকে দেখেই আমি চিনেছি; অবিশ্যি, চেনবার দৃষ্টি সবার সমান নয়—তোমার সংগে মিলবেও না।

মৃদু হেসে যদুপতি বললেন: তোমার কথা আমি বুঝেছি। হতে পারে, পুলিসের দৃষ্টিতে আমি এদের দেখিনি—কিন্তু গুরুমশাইয়ের সতর্ক দৃষ্টিতে আমি প্রত্যেক ছেলেটির হাড়হদ্দ দেখেই তবে এমন সারটিফিকেট দেয়েছি—বুঝলে?

জাহ্নবী বলিলেন: তুমি এদের যে সারটিফিকেটই দাও, আমি কিন্তু তার উপরেই রিমার্ক করেছি—ওদের আখেরগুলো তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, তোমার আজগুবি আইডিয়া ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে। ভালো চেহারা আর গায়ে জোর থাকলেই মস্ত বড় কিছু হওয়া যায় না। এদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে জেলখানায় ঢুকে ঘানি টানা, কিম্বা পল্টনের গুলীতে পটল তোলা। নিজেও জীবনটাকে বৃথা নষ্ট করলে, আর অতগুলো ছেলেরও মাথা খেলে!

তেমনি মৃদু হাসির সংগে যদুপতি বললেন: নিজের জীবনে ভুল করেছি কিনা জানি না, কিন্তু উচ্চশিক্ষা পেয়ে সেই শিক্ষাকে সত্যিকার কাজে যে লাগাতে পেরেছি, এতে আমার জীবন ধন্য আর সার্থক হয়ে উঠেছে। সেই সার্থকতার ফল এরাই। এদের মানুষ করবার জন্যই আমার এত চেষ্টা। সরকারী চাকরী ছেড়ে, তোমার ভাষায়—গুরু-মশাইগিরি চুটিয়ে চালিয়ে আসছি। আমি জোর গলায় বলতে পারি—এরা যে শিক্ষা পেয়েছে এবং শিক্ষাকে যে উপলব্ধি করেছে মনে প্রাণে—

গঠনশক্তি, শৃংখলা, পরিচালনক্ষমতা—প্রত্যেকটিতে যে রকম হাতেকলমে ওরা পাকাপোক্ত হয়েছে, তাতে প্রত্যেকেই এক একটা রাষ্ট্র চালাবার সামর্থ রাখে।

অগ্রজের কথাগুলি শুনতে শুনতে জাহ্নবীর সদা-গম্ভীর মুখখানাও আজ সহসা অপ্রত্যয়ের এক সকৌতুক হাস্যে বিহসিত হয়ে উঠল; বিদ্রূপাত্মক সে হাসির অর্থ উপলব্ধি করে যদুপতি দৃঢ়স্বরে বললেন: তুমি হাসছ, কিন্তু আমি বেশ শক্ত হয়েই বলছি: এরা মনে করলে তোমার 'হোল সাবডিভিসানকে' অচল করে দিতে পারে—পুলিশ-পাহারা কিম্বা ফৌজ-পল্টনের কোন পরোয়া না করেই।

কথাটা শুনে জাহ্নবী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অগ্রজের প্রদীপ্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর কথাটার উত্তরে তাঁর উদ্ধত ও অশিষ্ট কণ্ঠে মন্তব্য করলেন: রাগ ক'র না দাদা, একটা চলতি কথা আছে—এক নাগাড়ে বছর বারো ছেলে পড়ালে অতি বড় পণ্ডিতও জড়বুদ্ধি বেওকুব হয়ে যায়! দোষ তোমার নয়, তোমার—পেশার।

এই সময় পাশের ঘরে বসে ছেলেরা দুই ভ্রাতার সংলাপ শুনছিল। জাহ্নবীর শেষ কথা শুনে তরুণ দলের বলিষ্ঠ দেহগুলো যেন সহসা দৃপ্ত ও স্ফীত হয়ে উঠল, চোখে মুখে প্রকাশ পেল তীব্র উত্তেজনা। সবার দৃষ্টি প্রতাপের দিকে। প্রতাপও সংগে সংগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে প্রতিজ্ঞার ভংগিতে বলল: স্যার যে ইংগিত করলেন আজ, তাঁর সিদ্ধ মুখ থেকে যে আভাষ ফুটে বেরিয়েছে—তাকে আমরাই করব সত্য—এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

জাহ্নবীর মতিগতি যদুপতির অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোনদিন তাঁকে এভাবে এতখানি শক্ত বা উত্তেজিত হতেও দেখা যায় নি। প্রিয় ছাত্রদের প্রতি শিক্ষিত এবং পদস্থ ভ্রাতার এতখানি উপেক্ষা সহ্য করা এ দিনে

কিন্তু তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ; অগত্যা ছাত্রদের শিক্ষা ও শক্তি-সামর্থের সমর্থন করে তাঁকে এই ভাবে একটা সম্ভাবনার আভাস দিতে হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসচেতন হয়ে প্রসংগটির মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন। সহসা হো হো করে হেসে ফেলে বললেন : সত্যিই কি আমি পাগল হয়েছি নাকি ? কতকাল পরে এলে তুমি, কত কথা বলবার শোনাবার আছে, সে সব ছেড়ে ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছি! যা হবার হয়েছে, ভুলে যাও ভাই! তুমি ঠিকই বলেছ, ছেলেদের নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে করতে আমি আহাম্মকই হয়ে গেছি। যাক্, এসো আর সব কাজের কথা হোক।

কিন্তু কথা আর তেমন জমল না। বিশেষত, বাড়ীর ভিতর গিয়ে যখন জাহ্নবী দেখলেন, বিরাট ভোজের আয়োজন চলেছে, দুর্জন ষণ্ডামার্কা পাচক হিমসিম খাচ্ছে, তার উপর যখন পত্নী সুহাসিনী জানালেন : দেখছ কি ? শুধু আমাদের জন্যেই ভোজ নয়, আর এটা শুধু আজই হচ্ছে না ; নিত্যি দু-বেলা এমনি চলে, দেড়শো ছেলেকে ভাত কাপড় দিয়ে বড় ঠাকুর মানুষ করছেন।

দুর্গা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের সুরে বলল : ও কথা বলবেন না কাকিমা, বাবার কি ক্ষমতা যে সকলকে পোষেণ! ছেলেদের অনেকেই সম্পন্ন ঘরের ছেলে, ওঁদের বাড়ী থেকেই খরচ পত্র আসে ; তা ছাড়া বাইরের অনেকেই চাঁদা দেন। হ্যাঁ, তবে ছেলেদের দেখা শোনার দায়িত্ব বাবার উপরে—একথা বলতে পারেন।

জাহ্নবী বললেন : আমার সব জানা আছে—পাটনায় এসে অবধি দাদা যে দানসত্র খুলেছেন, আর অনেক অপগণ্ডই যে তাঁর ঘাড়ে চেপে মানুষ হচ্ছে, তুমি যতই চাপ না কেন—আমাদের জানতে কিছু বাকি নেই। সাধে কি জোর করে সম্বন্ধ কাটাতে হয়েছে।

দুর্গা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এই অপ্রিয়ভাষী শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল, কোন প্রতিবাদ করল না। এরপর দুর্গা কাকিমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাগানে বেড়াতে গেল, সেখানে এক দণ্ডের মধ্যেই এদের সংগে তার ভাব বেশ জমে উঠল। এদিকে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যেও যদুপতির এই 'শিবের সংসার' নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। কিন্তু দুই ভায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বদ্ধমূল হবার কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না।

বেলা দেড়টায় জাহ্নবীদের অফিসার্স কনফারেন্স—দুর্গা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একটার মধ্যেই তাঁকে কনফারেন্সে পৌছবার ব্যবস্থা করে দেবে, সুতরাং আহারাদি সেরেই তাঁরা বিদায় নিলেন। গাড়ীতে ওঠবার সময় ফটকের কাছে এসে দুর্গা বলল: আর একদিন কিন্তু আসতে হবে কাকাবাবু, আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

জাহ্নবী বললেন: এ যাত্রা আর হয়ে উঠেছে না মা, অনেক কাজ আছে; তাছাড়া বেশীদিন থাকবার ত যো নেই এখানে।

এঁদের যাবার সময় যদুপতি শুধু একটা কথা বলেছিলেন: সবই হলো ভাই, কিন্তু আমার যত্নে গড়া ছেলেদের ওপর তুমি একটা বিরুদ্ধ ধারণা নিয়ে চললে—এইটে বড়ই মনস্তাপের হলো। পার ত, এ ধারণাটা পালটে ফেলো।

জাহ্নবী কিন্তু জ্যেষ্ঠের এ কথার উত্তরে কিছুই বলেন নি; এমন কি বৈদ্যনাথ দর্শন উপলক্ষ করে তাঁর বাসায় যাবার জন্যে মৌখিক একটা অনুরোধ করতেও পারেন নি।

দীর্ঘকাল পরে দুই ভ্রাতার এই ভাবে মিলনের পথেও যেন একটা অপ্রীতিকর অবস্থা প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তরায় রচনা করতে লাগল। যদুপতির বিরাট কর্মশালা, শিক্ষার ধারা, শতাধিক প্রাণচঞ্চল বেপরোয়া তরুণের

অবাধ মেলা মেশার মধ্যে জাহ্নবীর মানস চক্ষে যেন ক্রিমিনালিটীর বীজাণুগুলি হিংস্র সর্পের মূর্তি ধরে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল—দন্তে ওষ্ঠ চেপে তিনি স্বদেশী যুগের ঐতিহাসিক আখ্যানগুলির অনুসরণে চিন্তামগ্ন হলেন: তাইত, কলকাতার মুরারীপুকুর' বাগানের আদর্শেই দাদা যদুপতির সংঘোদ্যানটি কল্পিত ও রচিত নয় কি?

৯

পাটনা সেক্রেটারিয়েটের এক প্রশস্ত কক্ষে প্রাদেশিক পুলিস অফিসারদের কনফারেন্স বসেছে। প্রদেশের জবরদস্ত অফিসারগণ সাগ্রহে যখন তাঁদের ভাগ্য-বিধাতা পাটনা ডিভিসনের বড় কর্তা স্যার গর্ডনের প্রতীক্ষা করছেন, সেই সময় তাঁরা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন—বিশেষ জরুরী ব্যাপারে অকস্মাৎ স্যার গর্ডন ছুটি নিয়ে বিলেত রওনা হওয়ায় তাঁর স্থলে অস্থায়ী ভাবে কাজ করবেন রাওবাহাদুর স্যার শংকর-লাল; গবর্ণর স্বয়ং তাঁকেই বর্তমান কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট করে পাঠিয়েছেন।

পরিবর্তনের এই খবরটি প্রদেশের কোন অফিসারই প্রীতির সংগে গ্রহণ করলেন না। তার কারণ, রাও বাহাদুর নাকি ভারি খামখেয়ালি ও অত্যন্ত দুর্মুখ উপরওয়ালা—অফিসারদের উপরেও তিনি নাকি গোয়েন্দা লাগিয়ে তাদের দোষ ত্রুটি ধরবার জন্যে অতি মাত্রায় অভ্যস্ত। গ্রেট বৃটেনের স্কটল্যাণ্ড এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসের ওয়াসিংটনের ডিটেকটিভ ইয়ার্ডের তদন্ত পদ্ধতিতে কৃতবিদ্য হয়ে ইনি ফিরে আসার পর গভর্ণমেণ্ট এঁর প্রতি যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করেন। ভারতের যে প্রদেশে যখনই শাসন-

তান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়, সেইখানেই রাও বাহাদুর শংকরলালকে পাঠিয়ে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হন। যুদ্ধারম্ভের পর বিহার প্রদেশের বিভিন্ন ডিভিসনেই অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে; চুরি ডাকাতি লুঠপাঠ অবৈধ ভাবে পণ্যাদি নিষিদ্ধ অঞ্চলে রপ্তানি, নারী হরণ প্রভৃতি অপরাধগুলি এমনি ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে যে—পুলিস বিভাগের অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতাকে চেপে রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে, বিচক্ষণ কর্তৃপক্ষ স্যার গর্ডনকে ছুটি দিয়ে 'হোমে' পাঠিয়ে তাঁর স্থলে রাও বাহাদুরকে আনতে বাধ্য হন। এই অদল-বদলের কাজটিও খুব গোপনে সম্পন্ন করা হয়। পূর্বের উপর-ওয়ালা স্যার গর্ডন ছিলেন অলস প্রকৃতির পরনির্ভরপরায়ণ উদার ও বিলাসী লোক—ডিভিসনের অফিসারদের উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত থাকতেন, আর তাঁদের নির্দেশ মতই সরকারে 'ডেসপ্যাচ' পাঠিয়ে তাঁর কর্তব্য ক'রে নিশ্চিন্ত আরামেই কাল কাটাতেন। কাজেই, অফিসার-বর্গের ছিল স্যার গর্ডনের আমলে রামরাজত্ব——জবাবদিহির ভয় বড় একটা কেউ রাখতেন না। সেস্থলে রাও বাহাদুর স্যার শংকরলালের নিয়োগে তাঁদের বিস্মিত, চমকিত ও ত্রস্ত হবারই কথা।

সমবেত অফিসাররা ভেবেছিলেন, এই আকস্মিক পরিবর্তনের জন্যে হয়ত কনফারেন্সে রাও বাহাদুর ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারবেন না—বিলম্বে আসাই সম্ভব। কিন্তু তাঁদের এ অনুমান ব্যর্থ করে নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচেক আগেই তাঁর গাড়ী সেক্রেটেরিয়েটের হাতার ভিতরে ঢুকল। অমনি সর্বত্র একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল যেন। রাও বাহাদুর যখন কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করে প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে বসে অফিসারদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নিলেন, সেক্রেটেরিয়েটের পেটা-ঘড়ি তখন সশব্দে নির্দিষ্ট সময়টা জানিয়ে দিল।

দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহখানি রাও বাহাদুরের—দেখবামাত্রই

মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগ্রত হয়। তাঁর গায়ের রঙটি ঈষৎ কালো—নতুবা দেহের বাঁধুনি, চোখ মুখের সংযত ভংগি এবং প্রকৃতিগত গম্ভীরতা লক্ষ্য করলে ইউরোপীয় বলেই ভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

রামসদয় বাবু মোগলাই প্রথায় কুর্ণিশের ভংগিতে দেহটাকে যতদূর সম্ভব নুব্জ করে নবাগত উপরওয়ালাটিকে অভিবাদন জানালেন; তারপর একে একে সমবেত অফিসারদের পদ ও শাসনাধীন ডিষ্ট্রিক্টগুলির নাম করে পরিচয়ের প্রাথমিক কাজটি সুরু করলেন।

আশ্চর্য্য, পরিচয়ের সংগে সংগে রাও বাহাদুর প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের এমন এক একটি প্রসংগ তুলে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের মনে বিস্ময় জাগিয়ে দিলেন—যে প্রসংগকে উপলক্ষ করে কথিত ডিষ্ট্রিক্টে একদা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। সব শেষে রামসদয় বাবু প্রিয় বন্ধু জাহ্নবী মিত্রের পরিচয় প্রসংগে যেই বললেন—ইনি মিষ্টার জাহ্নবী মিত্র; দেওঘর ষ্টেশনের পুলিস সুপার। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট সাঁওতাল পরগণার ইন-চার্জ মিঃ হুইলার এঁকেই তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন,—অমনি রাও বাহাদুর জাহ্নবী মিত্রের হাতখানা একটু বেশী জোরেই নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এর আগে ইনস্পেক্টর ছিলেন না—তারপর কতকগুলো সংগীন ডাকাতী ব্যাপারের আস্কারা করায় গভর্ণমেণ্ট আপনাকে পুলিস সুপারের পোষ্টে প্রমোস্যান দিয়ে দেওঘরে পাঠান?

মাথা নিচু করে জাহ্নবী মিত্র সবিনয়ে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ স্যার! কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, আপনি সেটা মনে রেখেছেন—শুধু আমি কেন, সারা প্রভিন্সটাই যেন আপনার নখ-দর্পণে,—স্যার!

রাও বাহাদুর বললেন: হ্যাঁ স্যার, সারা প্রভিন্সটাকেই আমাকে নিউজ পেপারের মত আগা গোড়া পড়তে হয়েছে। আপনার সাব-ডিভিসনের লোকেরা যে আপনাকে 'জানমারা মিত্তির' আখ্যা দিয়েছে

এ খবর পর্যন্ত আমার জানা আছে। আপনাদেরও প্রত্যেক অফিসারের উচিত, নিজেদের এলাকাগুলোকে নিউজ পেপারের মত পড়ে ফেলা।

অফিসাররা স্তব্ধ হয়েই কথাগুলো শুনলেন। যাঁরা অন্তরঙ্গ রূপে পাশাপাশি বসেছিলেন, আঙুল দিয়ে গা টেপাটেপি করে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন। মনে মনে প্রত্যেকেই ভাবলেন, একাধিক উপর-ওয়ালার অধীনে কাজ করে আসছেন কতদিন ধরে—কিন্তু এই প্রথম শুনলেন, পুলিস অফিসার হলে নিজের নিজের এলাকাগুলোকে খবরের কাগজ পড়ার মত করে পড়তে হয়। অথচ, এই লোকটা যে উর্ধতন অফিসারের আসনে বসেছেন বলে গতানুগতিক ভাবে উপদেশটা দিলেন তা নয়, নিজেও যে বরাবর পড়ে এসেছেন সারা প্রভিন্সটাকে এবং এখনো পড়েন—পরিচয়-পর্বের সংগে প্রাথমিক মন্তব্যেই সেটা জানিয়ে দিলেন। একি সাংঘাতিক উপরওয়ালার পাল্লায় তাঁরা এখন পড়লেন!

কনফারেন্সে আলোচনার জন্য যে ফাইল রাও বাহাদুর এনেছিলেন, এর পর সেগুলি সম্বন্ধে সরকারের নীতি তিনি বোঝাতে লাগলেন। অফিসাররা দেখলেন, আগের বড় কর্তাদের পদ্ধতির ধার দিয়েও ইনি যেতে চান না; যে ভাবে অফিসারদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ ইনি দিলেন, এঁদের প্রত্যেকেরই কাছে সেটা যেন অভিনব ব্যাপার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একেবারে পরিপন্থী। কনফারেন্সে উপস্থিত ইংরেজ অফিসার ক'জন প্রতিবাদ করতেই, ভারতীয় অফিসারগণও তাঁদের উক্তির সমর্থন করলেন; কিন্তু রাও বাহাদুর যেন লোহা দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তকে তৈরী করে এনেছিলেন, তার কোন অংশ একটুও টললো না। অথচ, স্থির ভাবে ধীরে ধীরে যুক্তি দিয়ে তিনি এমন করে অফিসারদের আপত্তিগুলি খণ্ডন করলেন যে, শেষ পর্যন্ত আপত্তি তোলার

জন্যে নিজেরাই তাঁরা লজ্জায় অধোমুখ হলেন। প্রত্যেক অফিসারই তাঁর এলাকা সম্পর্কে এক একটা প্রস্তাব তুললেন; পাটনার যিনি কর্তা, তিনি মহাজাতি সংঘ সম্পর্কে এক লম্বা রিপোর্ট দিয়ে তাদের কর্ম-পীঠ সার্চ করবার জন্যে সুপারিস করলেন। কিন্তু রাও বাহাদুর নতুন কোন প্রস্তাব গ্রহণ ত করলেনই না, উপরন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই উদ্যোগী হবার নির্দেশ দিলেন। মহাজাতি সংঘের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব ওঠে, রাও বাহাদুর তার সম্বন্ধে বললেন: আপনাদের মস্ত দোষ, এলাকার আসল কাজগুলো ছেড়ে এমন সব ব্যাপারেই বেশী করে মাথা ঘামাতে থাকেন যেগুলো মূলতঃ ক্রিমিন্যাল নয়। এই সংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে, চারটে প্রভিন্সকে এক করে তাদের আভ্যন্তরীণ গোলমালগুলো মিটিয়ে ফেলা, আর বাসীন্দাগুলোকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যকে সত্যিকার রূপ দেবার জন্যে এঁরা সভা করছেন, ইস্তাহার ছাড়ছেন, জনমত গড়ছেন। বলুন ত, এতে পুলিসের মাথা দেবার কি আছে? এর পিছনে শক্তি প্রয়োগ না করে, আপনারা যদি পুলিসের কর্তব্য কাজগুলি সম্বন্ধে অবহিত হন, তাহলেই গভর্ণমেণ্ট বাধিত হবেন।

একজন অফিসার প্রতিবাদ তুললেন: কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন্দেহ হলেও আমরা কিছু বলব না. গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট পর্য্যন্ত করব না—এই কি আপনার অর্ডার, স্যার?

স্যার বললেন: আমার অর্ডার আমি আগেই জানিয়েছি। আমি বলছি, এই সব বাজে ব্যাপারের পিছনে ছুটোছুটি করতেই আপনারা ভালবাসেন, আর এর জন্যে আসল দোষীদের নিষ্কৃতির পথ খুলে দিয়ে থাকেন। এই ধরুন, মহাজাতি সংঘের পিছনে ঘুরে এমন একটা রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে, যার ওপর নির্ভর করে মামলা চালানো

যায় না, আর যদি ওঁদের আস্তানা সার্চ করে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া যায়, দেশ মধ্যে আর একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করা হবে—যুদ্ধের এই সংকট সময় যেটা কোন মতেই উচিত নয়। অথচ, এই পাটনা থেকেই একদল ফন্দীবাজ এমন সব বে-আইনী কাজ বে-পরোয়া ভাবে চালাচ্ছে—মধ্য যুগের বর্বরতার স্মৃতিই নতুন করে জেগে ওঠে—তাদের কটাকে আপনারা ধরতে পেরেছেন? তার কারণ, এদিকে আপনাদের কোন উৎসাহই নেই। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই সব ক্রিমিন্যালের উচ্ছেদ আগে চান।

এর পর আর প্রতিবাদ তোলা চলে না, কাজেই আর কেউ কোন কথা বললেন না। গম্ভীর ভাবে একবার সমবেত সভ্যদের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রাও বাহাদুর সভা ভংগের হুকুম দিলেন।

১০

রামসদয়ের বাসায় ফিরে রাও বাহাদুরকে নিয়ে জাহ্নবী বহু আলোচনা করলেন। বললেন: আশ্চর্য, লোকটা প্রত্যেক অফিসারের কুলুচির সন্ধান রাখে হে! আমার সাবডিভিসানে দপদপার জন্যে লোকে যে নামটাকে ঘুরিয়ে 'জান-মারা মিত্তির' করে নিয়েছে, এ খবর পর্যন্ত বাদ যায় নি ওর কাছে—অদ্ভুত মানুষ ত দেখছি!

রামসদয়: শুধু তোমার কেন, প্রত্যেকেরই নাড়ির খবর রাখে—ওস্তাদ লোক। শুনতে পাই, এ রকম করিৎকর্মা আর সবদিক দিয়ে চৌখস অফিসার, এ প্রদেশে পুলিস-লাইনেই আসে নি।

জাহ্নবী: আমার সাহেব কিন্তু রাও বাহাদুরকে মোটেই পছন্দ

করে না; বলে—ও একটা ধড়িবাজ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, আর ইউনাইটেড-ষ্টেটস্ ঘুরে এসে যেন ধরাকে সরা দেখেছে, আর লাট সাহেবকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে! কোন কিছু ব্যাপার যদি প্রভিন্সে হলো ত অমনি সেক্রেটারীর ওপর হুকুম হবে, রাও বাহাদুরকে খবর দাও—উনি এসেই ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করবেন যেন!

সুহাসিনী দুই বন্ধুর কথা নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন, কনফারেন্সের খবরও তিনি আগেই জেনেছেন। এই সময় বললেন: কিন্তু এতে রাগ করবার কি আছে বলুন ত? আমাদের দেশের একজন লোককেই যদি লাটসাহেব এত খাতির করেন, সেটা কি আমাদের পক্ষে গর্বের কথা নয়? আর, হুইলার সাহেবের কথা কি বলুন না, এদেশী লোকের এত ক্ষমতা ওঁর সহ্য হবে কেন? কিন্তু এখন যে রাও বাহাদুরের তাঁবেতেই তাঁকে চাকরী করতে হবে!

মিঃ হুইলার হচ্ছেন জাহ্নবীর মস্ত মুরুব্বী, কাজেই স্ত্রীর কথাটা তাঁর ভাল লাগল না। কথা যেখানে ভাল লাগে না, একটা কিছু বিরুদ্ধে না বললে সম্ভ্রমটিও বজায় থাকে না; কাজেই রুক্ষকণ্ঠে বললেন: লোকের ওপরে গোয়েন্দাগিরি করা, আর একটা য়্যাডমিনেষ্ট্রেসান চালানো, দুটোতে অনেক তফাৎ। দিন কতক যাক, তারপর চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে। গবর্ণর বরং মিঃ হুইলারকে যদি ওঁর জায়গায় বসাতেন, কাজ অন্ততঃ ভাল চলত।

মৃদু হেসে সুহাসিনী বললেন: আর, তোমাদেরই রাম রাজত্ব বজায় থাকত! কিন্তু এক দিনেই যে-লোক এতগুলো হোমরা-চোমরা অফিসারের চায়ের পিয়ালায় তুফান তুলেছে, এর পর হয়ত নাভিশ্বাস তুলে ছাড়বে।

পত্নীর শ্লেষের কথাটাও জাহ্নবীকে রীতিমত আঘাত দিল, এক্ষেত্রে

প্রতি আঘাত করতে গেলে একটা অশান্তির সৃষ্টি অনিবার্য। তাই, প্রবাসে একজন বন্ধুর সম্মুখে জাহ্নবী আর কেলেংকারী বাড়ালেন না, গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললেন: অফিসারদের উচিত, আজকের ব্যাপারটা চুপ করে হজম না করে, ডিপার্টমেণ্টাল মিনিষ্টারের কাছে আপত্তি জানানো।

রামসদয় অমনি হাসতে হাসতে বললেন: ক্ষেপেছ! তার ফল আরো খারাপ হবে—মিনিষ্টার কিচ্ছু করবে না, আর এখানে কিছু করবার এক্তিয়ারও তাঁর নেই।

এর পর উঠল অধ্যাপক যদুপতির কথা। সেই সূত্রে তাঁর কর্মপীঠ এবং কর্মী ছেলেদের প্রসংগ। জাহ্নবী বললেন: ছোঁড়াগুলোকে আস্কারা দিয়ে দাদা এমনি মাথায় তুলেছেন যে, তারা ভেবেছে যেন এক একজন এক একটা সুভাষ বোস হে! কি লম্বা লম্বা কথা, আবার দাদারও তাদের ওপর কি বিশ্বাস! ওদের পক্ষ নিয়েই আমাকে বললেন কিনা—এরা প্রত্যেকেই এক একটা রাষ্ট্র চালাতে পারে, এমন কি ইচ্ছে করলে গবরমেণ্টের য়্যাডমিনষ্ট্রেসান পর্যন্ত পজ্যল করে দেবার সামর্থ রাখে।

রামসদয়: তাই নাকি? তা তুমি শুনে কি বললে?

জাহ্নবী: দাদা যখন, মুখের ওপর বেশী ত কিছু বলতে পারিনে, তাহলে ঝগড়া হয়ে যেত। অবিশ্যি, তারপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ছোঁড়াগুলোর তেজ তেমনি আছে। আমি ভেবেছিলাম রামসদয়, মহাজাতি সংঘটাকে সার্চ করবার প্রস্তাবটি রাও বাহাদুর যদি বাতিল না করতেন, আমি ঐ রাস্কেলগুলোকে একবার দেখে নিতাম।

রামসদয় বললেন: তোমার মতলব আমি তখুনি বুঝেছিলুম—সিটি

অফিসারের সংগে যখন আলাপ জমিয়েছিলে। কিন্তু আমি ভাই কাজটার সমর্থন করিনে, আর প্রস্তাবটা পাশ হলেও সহজে সাকসেস্‌ফুল করতে দিতাম না। ছোঁড়াগুলোকে জব্দ করতে গেলে তোমার দাদাকেও অপদস্ত হতে হতো। জান ত, শিবের গায়ের সাপ ওরা!

মুখখানার এক ক্রূর ভংগি করে জাহ্নবী বলে উঠলেন: আমি যে ওদের আস্পর্ধার কথা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনে; আমার এলাকা হলে চাবুক মেরে প্রত্যেকের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতুম—স্কাউণ্ড্রেল সব!

সুহাসিনী বললেন: কেন মিছি মিছি মাথা গরম করছ বলত! তোমার যখন এলাকা নয়, ওদের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো।

ফোঁস করে উঠে জাহ্নবী বললেন: ভুলতে আমি পারব না কিছুতেই—যতক্ষণ না ওদের সায়েস্তা করতে পারি! জানো, আমার ডায়েরীতে লিখে রেখেছি কথাটা?

রামসদয় ও সুহাসিনী দুজনেই জাহ্নবীর বিকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে রইলেন।

১১

ভাগিরথীর এ-পারে পাটনা, ও-পারে শোনপুর। কার্তিক পূর্ণিমাকে উপলক্ষ করে প্রতি বছর এখানে ভারত বিশ্রুত যে বিখ্যাত মেলাটি কয়েক সপ্তাহ ধরে লক্ষ লক্ষ লোককে আকর্ষণ করে—সর্বসাধরণের কাছে 'হরিহর সত্রের মেলা' নামেই সেটি পরিচিত। এত বড় মেলা শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয় কি না সন্দেহ। হাতী,

ঘোড়া, উট থেকে সুরু করে কত রকমের জীবজন্তু, সুদুর্লভ কত শ্রেণীর বস্তু, কত অদ্ভুত অদ্ভুত দ্রব্যজাত ও অসংখ্য পণ্যের সমাবেশ হয়ে থাকে এ মেলায়, তা নির্ণয় করাও কঠিন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজের নর-নারীর সমাগমে পক্ষাধিক কাল এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটি যেন জম জম করতে থাকে। ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশের বহু পর্যটক এবং উৎসাহী ব্যক্তিকেও এই বিখ্যাত মেলায় দেখা যায়।

বহু জন সমাগমের জন্য এই মেলা প্রচারকদের পক্ষেও অপরিহার্য। তাই, মহাজাতি সংঘের প্রচারোদ্দেশ্যে এখান থেকে নানা ভাষায় লিখিত প্রচার পত্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং অপরাহ্নের দিকে বক্তৃতাদি চলে।

পুলিস কনফারেন্সের পর দিন। বাহির থেকে পাটনায় যে সব পুলিস অফিসার সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদিন মেলায় উপস্থিত—পাটনায় এসেছেন যখন, গঙ্গা পেরিয়ে এত বড় মেলাটা না দেখে গেলে একটা ক্ষোভ থাকবারই কথা; বিশেষত, ইতিমধ্যেই যখন দলের অনেকে মেলায় যাবার জন্যে রামসদয় বাবুর সংগে আলোচনাও করেছেন।

সুহাসিনী এই মেলা দেখবার লোভেই দেওঘর থেকে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছেন; যদিও জাহ্নবীর মনটা খুব প্রসন্ন নয়, তবুও স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এদিন সপরিবার জাহ্নবী মিত্রও মেলাস্থলে সমবেত হয়েছেন। ঘটনাচক্রে সংঘের ছেলেরাও এদিন সংঘের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সর্বসাধারণের আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে একটা নতুন ধরণের পন্থাবলম্বন করেছেন। কতকগুলি ছেলেকে যোগাড় করে তাদের দ্বারা নাটকাকারে একটা পালার ভিতর দিয়ে সংঘের বক্তব্য বিষয়গুলি অভিনয় করে দেখবার আয়োজন হয়েছে।

গানে, বক্তৃতায় সংঘের অভিনয় খুব জমে উঠেছে ; শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণ সাগ্রহে সেটা উপভোগ করছে।

পালার মধ্যে সংঘ-প্রচারক বলতে চেয়েছেন : মাটিকে বাদ দিয়ে আকাশে যেমন ইমারত ফাঁদা চলে না। তেমনি আমাদের অতীতকালের ঐতিহ্য স্বরূপ এই সব মেলা, জাতীয় উৎসব, পালপার্বণ আত্মার মত আমাদের সংগে জড়িয়ে আছে—সর্ব জাতি, সম্প্রদায় ও সমাজের সংগে এর মিলও রয়েছে। এদের বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারিনে। এদের মধ্যে আমরা যেন এক হয়ে মিশে যাই—যেমন এই মহামেলায় হয়েছে। এমনি করেই সংগতি রেখে আমরা এখন এক রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে চাই—যার মাঝে ভারতের জাতীয় আত্মা ফুটে উঠবে। তখন দেখবে, সমস্ত দেশের নাগরিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক বিশাল যৌথ পরিবার ; সবাই তারা মিলে মিশে সেখানে কাজ করছে, আর সেই কাজের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছে ধন ঐশ্বর্য সুখ শান্তিময় নতুন মহাদেশ—তার বাসিন্দারা সকলেই এক, সমান ; কারুর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তারা সবাই—মহাজাতি।

পুলিস অফিসারগণও সকৌতুকে সংঘের ছেলেদের এই নতুন ধরণের প্রচার-পর্ব উপভোগ করছিলেন—কেউ কেউ রীতিটার প্রশংসা করলেন, কেউ বা অবজ্ঞায় মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন। জাহ্নবীও এ দলে ছিলেন ; বিদ্রূপের সুরে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন : বেনা বনে মুক্তো ছড়াচ্ছে !

পরক্ষণেই পিছন থেকে একটি ছেলে ভীড় কাটিয়ে জাহ্নবীর নিকটে এসে দাঁড়াল, তারপর শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কথাটার উত্তর করল : কিন্তু স্যার, বেনা বনেও মানুষ আসে—দু চারটে মুক্তো তারা কুড়িয়ে নিতেও পারে !

চোক দুটো পাকিয়ে তাকাতেই জাহ্নবী ছেলেটিকে চিনলেন—তাঁর জোষ্ঠের ছাত্র-দলের সেই দুর্মুখ ও দুর্ধর্ষ সরদারটি! রাগে তাঁর সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠল—অমনি অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন: রাস্কেল কোথাকার, আমার সামনে এসে জ্যেঠামি কর, এতবড় আস্পর্ধা! এই মিসির—

তাঁর এই অশোভন ক্রোধ দেখে প্রতাপ হেসে ফেলল—তারপর হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করল: আপনি এভাবে ক্ষেপে উঠলেন কেন, স্যার? মুক্তো ছড়াবার কথা আপনি বলতে পারলেন, আর সেগুলো কুড়োবার কথা বলাটাই আমার আস্পর্ধা হয়ে গেল?

জাহ্নবীর উভয় পাশেই অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন—একটু তফাতে একখানা টাংগার মধ্যে বসে সুহাসিনী ছেলে মেয়েকে নিয়ে সংঘের অভিনয় দেখছিলেন। অফিসাররা সকৌতুকে স্পষ্টবক্তা এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির পানে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতেই রামসদয় বললেন: প্রফেসার যদু মিত্রের ছাত্র—শিবের গায়ের সাপ!

জাহ্নবী সরোষে হাতের চাবুকটা উঁচিয়ে বললেন: তোমাকে চাবকে সায়েস্তা করব, ইডিয়াট—

এ অবস্থায় সাধারণভাবে ছেলেটির সরে পড়বার কথা; কিন্তু প্রতাপ তৎক্ষণাৎ জাহ্নবীর একেবারে সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: ইডিয়াট কাকে, বলছেন স্যার, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন ত আগে। না, পুলিসে চাকরী করে সেটাও খুইয়ে বসে আছেন?

'সাট আপ্!' আশে পাশের অফিসারদের মুখ থেকে সমস্বরে হুমকিটা নির্গত হলো—সংগে সংগে জাহ্নবীর হাতের মোটা বেতখানা প্রতাপের মুখখানা লক্ষ্য করে তীর্যক গতিতে ছুটল। কিন্তু তার দৃষ্টি সতর্ক থাকায়, অংগ স্পর্শের আগেই খপ করে বেতখানা ধরে ফেলল

সবলে জাহ্নবীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে বলল : আপনি আমাদের গুরুর অনুজ, সেই খাতিরে বেতখানা আপনার পীঠে না ভেঙে নিজের হাতেই ভেঙে ফেললাম।

কথাগুলি বলতে বলতেই সে অমন শক্ত বেতখানা দু'হাতে দুমড়ে ভেঙে মাটির উপর ফেলে দিল। জাহ্নবীর সামনে পিছনে আশে পাশে যে ক'জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন, নির্বাক বিস্ময়ে তাঁরা এই দুঃসাহসী শক্তিমান ছেলেটির কাণ্ড দেখছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁদের পৌরুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বে-সরকারী একটা ছেলের এত বড় ঔদ্ধত্য সহ্য করা তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শোনপুর যে অফিসারটির এলাকাধীন, তাঁর রক্তে তখন তরংগ উঠেছে, অধীনস্থ বরকন্দাজকে বজ্রকণ্ঠে তিনি হুকুম করলেন : ডাকুকো পাকড়ো—

ততোধিক দৃঢ়স্বরে প্রতাপ বলে উঠল : ডাকু বলছেন কাকে স্যার ?

—চুপ রও! এই, হ্যাণ্ডকাপ লাগাও।

গোলযোগের কথাটা তখন ছড়িয়ে পড়েছে—ক্যাম্প থেকে সংঘের ছেলেরাও ছুটে এসেছে ; এদিকে পুলিস অফিসারদের বরকন্দাজদলও রুখে দাঁড়িয়েছে—ডাকু ছেলেটিকে ধরবার জন্যে।

এই সংগিন অবস্থায় বিচিত্র আকৃতি এক বৃদ্ধ যেন মাটি ফুঁড়ে দু-পক্ষের সামনে এসে বলল : হুঁসিয়ার! যদি এখানে হাংগামা বাধে, মেলার তছরূপ হয়, তার জন্যে তোমারই দায়ী হবে—পুলিস বলে রেহাই পাবে না।

গাঁইয়া এক বৃদ্ধের মুখে এরূপ ধৃষ্টতার কথা শুনে অফিসারদের মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল—এই অসভ্য লোকটির প্রায় সামনেই

ছিলেন জাহ্নবী, তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দুহাতে বৃদ্ধের গলা চেপে ধরলেন।

পরক্ষণে ভীড়ের ভিতর থেকে সাধারণ বেশে এক ব্যক্তি ছুটে এসে জাহ্নবীকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে ধরল। কিন্তু বৃদ্ধ তাকে গুলী করবার অবসর দিল না—শংখধ্বনির মত তার কণ্ঠ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল: সবুর!

তারপর ময়লা পিরাণের পকেট থেকে একখানা কার্ড বা'র করে সে এমনভাবে সেখানা প্রসারিত করল, যাতে সমবেত পুলিস অফিসারদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। চক্ষুগুলি বিস্ফারিত করে তাঁরা আইভরি কার্ডে মুদ্রিত নামটি পড়লেন: রাও বাহাদুর স্যার শংকরলাল উপাধ্যায়!

১২

মেলার এক প্রান্তে—গঙ্গার প্রায় উপকূলে ধূসরবর্ণের যে পট-মণ্ডপটি কেউ লক্ষ্য করেন নি, তার চারদিকে এখন ভীড় জমে গেছে এবং বন্দুকধারী কতিপয় উর্দীপরা পুলিস-প্রহরী অতিকষ্টে জনতাকে সংযত করছে। মেলার মধ্যে যে নাটকীয় ব্যাপারটি একটু আগেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল—এই ক্ষুদ্র তাঁবুটির ভিতরেই তার শেষাংকের অভিনয় চলেছে।

সংঘর্ষের প্রাক্কালে যে লোকটির হাতে কার্ড দেখে হোমরা-চোমরা পুলিস অফিসারগণ অবাক হয়ে যান, এখন আর তাঁর সে বেশ বা ভংগি নেই। খাকির ইউনিফরম পরে একখানা বেতের কেদারায় বসে সামনে

দণ্ডায়মান অফিসারগুলিকে কড়া সুরেই তিনি বলছিলেন: আমি যদি মেলায় না আসতাম, আপনারা এমন একটা কাণ্ড বাধাতেন—যার ফল খুবই সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াত; আর চার্জটা হাতে নিয়েই আমাকে গভর্ণমেণ্টের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। পাবলিকের সংগে আপনারা কি রকম ব্যবহার করেন, আমি আজ স্বচক্ষেই তা দেখলাম।

অফিসারদের ভিতর থেকে জাহ্নবীই স্যার শংকরলালের অনুযোগের উত্তরে বললেন: কিন্তু পাবলিকও আজকাল কি রকম 'ডিস্‌অবিডিয়েণ্ট' হয়েছে—আশা করি সেটাও আপনি লক্ষ্য করেছেন স্যার!

স্যার শংকরলাল দৃঢ়স্বরে কথাটার প্রতিবাদ করলেন: মিষ্টার মিত্র, খুবই লজ্জার কথা যে, একটা সাবডিভিসনের চার্জ পেয়েও আপনি ওজন করে কথা বলতে শেখেন নি! কি হিসেবে পাবলিক সম্বন্ধে ও-কথা আপনি বললেন? পাবলিক নিশ্চয়ই আপনার অনুগত ভৃত্য নয় যে, সর্বদা পুলিস প্রভুদের অনুগত বা একান্ত বাধ্য হয়ে থাকবে! জানেন, বিলেতে পুলিসকে ভৃত্য সাব্যস্ত করবার এক্তিয়ার পাবলিকই রাখে—সংঘের ছেলেরা এটা জানে, তাই আপনাদের অনুচিত প্রভুত্বকে ওরা প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়।

জাহ্নবী কিন্তু তথাপি নরম হতে চান না—তিনিও পাল্‌টা প্রতিবাদ করলেন: ওদেশের এসব নজির কি এদেশে চালানো উচিত, স্যার? স্বাধীন দেশে এটা খাটতে পারে—যেখানে গভর্ণরও পাবলিকের সারভেণ্ট।

স্যার শংকরলাল বললেন: স্বাধীনতার হাওয়া এখানেও এসেছে—ধাপ্পা দিয়ে চোখ রাঙিয়ে জুলুম করবার যুগ চলে গেছে। আমি চাইনে মিষ্টার মিত্র, পুলিসের নাম শুনেই পাবলিকের মনে একটা তিক্ত ভাব

জেগে ওঠে। আমরা একটু চেষ্টা করলেই ও ভাবটা পাল্টে দিতে পারি। গভর্ণমেণ্টের একটা বড় রকমের দুর্বলতা কি জানেন, পাবলিকের সম্বন্ধে পুলিসের দোষ চেপে যাওয়া—আর, এই জন্যেই আপনারাও এত বে-পরোয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা পছন্দ করি না।

এ কথার জবাব আর জাহ্নবীর মুখে এল না—বিশেষত, আজকের ব্যাপারে তিনিই সর্বসমক্ষে বে-পরোয়া আচরণের জন্য চিহ্নিত হয়েছেন এবং স্যার শংকরলাল স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দিলেন যে, পাবলিকের সম্বন্ধে পুলিসের দোষ চেপে যাওয়া সরকারের নীতি বলেই তাঁকেও চুপ করে থাকতে হয়েছে। পুলিস-বিভাগের সর্বোচ্চ পদ থেকে পুলিসকে যিনি এতখানি নিচুতে নামাতে চান, সেখানে পুলিসের পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

এর পর স্যার শংকরলাল পুলিসের চিরন্তনী বদনাম ঘুচিয়ে জনপ্রিয় হবার অনুকূলে আরো কিছু উপদেশামৃত বর্ষণ করে তাঁদের বিদায় দিলেন।

নিজেদের ক্যাম্পে এসে এঁরাও এক বৈঠক বসালেন। সব কটি মস্তিষ্ক থেকেই তখন এই যুক্তি বেরিয়ে এল যে, এ-লোকের উপরে পুলিস-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব যদি থাকে, তাহলে পুলিসের আর ভদ্রস্থ নেই—এর পর পাবলিক এসে পুলিসকে চালাবে, হুকুম বাতলাবে।

একজন প্রবীণ অফিসার বললেন: শুনেছিলাম, লর্ড রিপণ ভাইসরয় হয়ে এসে পাবলিকের সংগে এমনি দহরম মহরম সুরু করে দেন যে, সিবিলিয়ানরা তাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন; বড়লাট সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা তাঁকে জোর করে জাহাজে তুলে বিলেতে পাঠিয়ে দেবার এক ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন।

আর এক অফিসার বললেন : কিন্তু ইনি যে এই দেশেরই বাস্তুঘুঘু— ধরে বেঁধে কোথায় পাঠাতে চাও বলো ?

আগের অফিসারটি বললেন : কথাটা আমি এই ভেবে তুলেছি যে, আসল কলকাঠি সব ঐ সিবিলিয়ানদের হাতে, গবর্ণর পর্যন্ত তাদের হাতে পুতুল। ওদের হাত করতে পারলে শংকরলালকে সরানো শক্ত হবে না। আমরা যদি সব অফিসার এক যোট হয়ে ওঁর পিছনে লাগি, আর ক্রমাগত নালিশ করতে থাকি—সরকার ওঁকে তাড়াতে বাধ্য হবেনই।

কিন্তু পাটনার অফিসারটি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলেন : এ সব করে কিছুই হবে না ; জানো, সরকার ওঁর পিছনে কত টাকা খরচ করেছেন, আর কত আস্থাও ওঁর ওপরে রাখেন ! স্যার শংকরের পিছনে লেগে কিছু করতে পারবে না, বরং জলে বাস করে কুমীরকেই ঘাটানো হবে। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে।

সে কাজটি কি, শোনবার জন্যে সকলেই উৎকর্ণ হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই অফিসারটি বললেন : যে পাবলিকের ওপরে স্যার শংকরের এত দরদ, সেই পাবলিককে দিয়েই যদি এমন কিছু করানো যায় যাতে ওঁর মান সম্ভ্রমে রীতিমত একটা আঘাত পড়ে—তাহলে তখন দেখবে, ঐ লোকই পাবলিকের যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাহ্নবী বললেন : পাবলিকের সংগে ওঁর সম্পর্ক কোথায়—আর ক'টা লোকই বা পুলিস সাহেবের তোয়াক্কা রাখে ! তাদের যা কিছু কাজ দারোগাদের সংগে ; তবে ইদানীং থানার সংগেও আমরা রীতিমত যোগাযোগ রাখি বলেই পাবলিক আমাদের জানে, আর যমের মতন ভয় করে। স্যার শংকরের সেইটিই হয়েছে চক্ষুশূল ! পাবলিকের জন্যে ওঁর দরদ একেবারে উথলে উঠেছে। তা, আমার ফ্রেণ্ড যা বললেন, সেটাও ভাববার মত। আমরা অন্তত পাবলিকের মনে এমনি একটা

ধারণা জাগিয়ে দিতে পারি যে, নতুন পুলিস-সাহেব দেশের লোক হলে কি হবে—দেশবাসীর সে মহা দুষমন, এত বড় দুর্জন এই পোষ্টে আর আসে নি। আসল কথা, স্যার শংকরের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে তোলা, আর খবরের কাগজগুলোতেও ওঁর বিরুদ্ধে এই ধরণের লেখা সব ছেপে বা'র করা।

জাহ্নবীর প্রস্তাবটি মোটের উপর অফিসারদের মন্দ লাগল না; তাঁরা প্রত্যেকেই এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং তাঁদের স্বার্থ ও সামর্থের অন্তরায় রূপে যে অবাঞ্ছিত মানুষটি উপরওয়ালার আসনে বসেছেন—তাঁকে অপদস্থ করতে যাঁর যতখানি শক্তি সবটুকুই প্রয়োগ করবেন—এরূপ অভিমত জানিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরুলেন।

অফিসারদের মধ্যে জাহ্নবীই সপরিবার মেলায় এসেছিলেন এবং সোনপুর ডিষ্ট্রিক্টের পুলিস অফিসারের ব্যবস্থায় জাহ্নবীর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার মেলা দেখবার বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে নি। তথাপি, একটা গোল-যোগ যে ঘটেছে এবং তাঁর স্বামীই সেটি সৃষ্টি করবার উপলক্ষ হয়েছেন, সুহাসিনী মোটরে বসে স্বচক্ষেই তা দেখেছেন। সুতরাং বেশ স্বচ্ছন্দ মনে মেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

স্বামীর সংগে দেখা হতেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুহাসিনী বললেন: চলো, আজকের রাতের ট্রেণেই আমরা দেওঘর রওনা হই।

জাহ্নবী বললেন: এত তাড়া কেন, শুনি?

সুহাসিনী উত্তর করলেন: এসে অবধি দেখছি—কেবলি ঝগড়া, আর ঝগড়া। লোকের গায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধানো, টিকি টেনে খর মেজাজে কথা বলা—এ অভ্যেস আর তোমার গেল না! দেশের লোক যে দিনে দিনে জেগে উঠেছে, তারা এখন নিজেদের দাবী বুঝে

নিতে শিখেছে—এ কথাগুলো তোমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না—তার কারণ, তোমরা পুলিসের লোক বলে।

জাহ্নবী বললেন, মুখখানা শক্ত ও আরক্ত এবং কথাগুলো মনে বেঁধবার মত করেই বললেন: ঠিক ধরেছ; পুলিসের লোক বলেই আমরা পায়ের জুতো মাথায় তুলিনি; আমরা জানি—পয়জার চিরদিন পায়ের তলাতেই থাকে।

শুব্ধ হয়ে সুহাসিনী স্বামীর এই অতি রূঢ় এবং অতি অশোভন ও অনুচিত কথাগুলি শুনলেন। পুলিসের উপর প্রচুর পক্ষপাতিতা নানা কারণে থাকা সত্ত্বেও স্বামীর এই ঔদ্ধত্য তাঁর বুকে যেন শূলের মত বিঁধতে লাগল।

১৩

আশ্চর্য এই যে, ক্যাম্পের বৈঠকে অফিসারদের গোপন পরামর্শ সংক্রান্ত রিপোর্টটি অবিকলভাবে পরদিন বেলা ঠিক এগারোটার সময় স্যার শংকরলালের আফিসের টেবিলে একটা ফাইল আশ্রয় করে উপনীত হলো। খবরটি পড়তে পড়তে তাঁর ওষ্ঠের দুটি প্রান্তেই হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল। পড়ার পর পকেট থেকে মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো কালো রঙের একটা নোট বুক বার করে তার একটা পাতায় লেখা নোটগুলির সংগে কাগজে লেখা রিপোর্টটি মিলিয়ে নিলেন। রিপোর্টের একটা স্থানে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে সেটা ঠিক সামনেই একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন।

এই সময় খর্বাকৃতি, খাঁকির হাফ প্যাণ্ট ও কোট পরা একটি যুবক তাঁর টেবিলের সামনে এসে অভিবাদন করল।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে স্তার শংকর বললেন: তোমার রিপোর্ট দেখলাম—কিন্তু একটা ভুল আছে।

যুবকের বিস্মিত কণ্ঠ থেকে অর্ধস্ফুট স্বরে প্রশ্ন উঠল: ভুল?

স্তার বললেন: হ্যাঁ। কাল রাতেই এ রিপোর্ট আমি পেয়েছি—

রিপোর্টের কথা শুনেই মুখখানা বিবর্ণ করে যুবক বলল: এ রিপোর্ট পেয়েছেন স্তার--কাল রাতেই?

মৃদু হেসে স্তার বললেন: শুধু কি একটা রিপোর্ট পেয়ে তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি হে! প্রত্যেক খবরটাই আমাকে 'ভেরিফাই' করে নিতে হয়।

যুবক বলল: কিন্তু স্তার, ভুলটা—

স্তার বললেন: ভুলটা হয়েছে নামের। ওদের বৈঠকের শেষের কথাগুলো মিঃ কার্লেকার বলেন নি—বলেছিলেন মিঃ মিত্র।

যুবক বলল: হ্যাঁ, স্তার! মিঃ মিত্রই বলেছিলেন। আমার তাহলে নামটাই লেখবার ভুল হয়েছে।

স্তার বললেন: ভুলটায় আমি দাগ দিয়েছি। কিন্তু নামের ভুলটাও উপেক্ষা করবার মত নয়। জানো ত, নাম নিয়েই আমাদের কারবার। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে নোট নেবে। যা হোক, আর এই ভুলটুকুর জন্যে তোমার বিলটা কাটাকুটি করলাম না; কিন্তু—Beware for future, my friend! হ্যাঁ, রিপোর্টের নামটা—যেখানে লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়েছি, ওটা কেটে মিঃ জাহ্নবী মিত্র করে দাও—ব'স।

স্তার রিপোর্টখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। এতক্ষণ যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছিল—বসবার নির্দেশ পেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে স্তারের টেবিলের সামনে চেয়ারখানায় বসে রিপোর্টের চিহ্নিত স্থানটিতে মিঃ মিত্রের নামটি লিখে কাগজখানি ফিরিয়ে দিল।

স্যার শংকরলাল ফাইলের মধ্যে কাগজখানা রেখে ফাইল থেকে আর একখানা কাগজ টেনে নিলেন। সেখানা এই যুবকের বিল—ক্যাম্প থেকে যে খবর আশ্চর্যভাবে সে সংগ্রহ করে আগের কাগজে লিখে দাখিল করেছে, তারই পারিশ্রমিকের ভাউচার। স্যার শংকরলাল নির্বিচারেই এ সব বিলের টাকা নিজের কাছ থেকে নিজের হাতেই দিয়ে থাকেন। বিলখানা এক নজরে দেখে তার উপর Paid অর্থাৎ 'দেওয়া হলো' শব্দটা নীল পেন্সিলে লিখে মনিব্যাগ থেকে দশটাকার দশখানি নোট বার করে যুবকের হাতে দিলেন। যুবক সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আফিসের উপরতলায় স্যার শংকরলালের কোয়ার্টার। তারই একটা নিরিবিলি অংশে আলাদা একটি ব্লকে তিনি নিজে থাকেন। ব্লকটির শেষের দিকে একখানি ঘরের দরজার আংটা দুটিতে সর্বক্ষণ তালা লাগানো থাকে। আফিসের কাজ সেরে স্যার তাঁর ব্লকের এই রুদ্ধ দ্বারটির সামনে এলেন; তারপর পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলে সেই ঘরখানির ভিতরে ঢুকলেন—ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে ঘর থেকে যে বৃদ্ধ লোকটি বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দ্বারের আংটায় পুনরায় তালা কুলুপ লাগিয়ে ব্লকের মুখে আলাদা একটা সরু ঘুরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন—কে বলবে, স্যার শংকরলালের সংগে এই মানুষটির কোন রকম সাদৃশ্য আছে! বাড়ীর পিছনে সরু একটা গলির মুখে এই সিঁড়ির দরজা—ভিতর থেকে তালা বন্ধ। বৃদ্ধ তালা খুলে বাইরে গেলেন; তার পর সেই তালা বাইরে থেকে দরজায় লাগিয়ে, চাবি বন্ধ করে গলি পথে নেমে পড়লেন—অদূরেই প্রশস্ত রাজপথ।

অধ্যাপক যদুপতি সংঘের পাঠাগারে বসে দুর্গা ও প্রতাপের সংগে মেলার সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি নিয়েই আলোচনা করছিলেন। পড়াশুনায় এখনো পর্যন্ত অধ্যাপকের যেরূপ গভীর অনুরাগ, স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহে তাঁর আগ্রহও তেমনি বিস্ময়াবহ। ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রত্যেক খবরটি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে থাকেন এবং এই সংগ্রহ ব্যাপারে রীতিমত একটা ব্যবস্থাও আছে। তাঁর মতে, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, সাহিত্যসেবী, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক ও পুলিস—এঁদের ভাতভিত্তি হচ্ছে—সংবাদ। নব নব বার্তাই এঁদের মস্তিষ্কে বাস্তব প্রেরণা যোগায়। মেলার ব্যাপারটির বার্তা সহরে প্রচারিত হবার অনেক আগেই তিনি জানতে পারেন এবং সেই রহস্যময় ছদ্মবেশী মানুষটির সম্বন্ধে একটা ধারণাও স্থির করে ফেলেন। কাল আর প্রতাপের মেলা থেকে ফেরা হয়নি। সেখানকার ক্যাম্পে রাত্রিবাস করে আজ সকালেই পাটনায় এসেছে। অধ্যাপক যদুপতি তাঁর অনুভূতির কথাই প্রতাপ ও কন্যাকে বলছিলেন: স্যার শংকরলাল পুলিস বিভাগের ভার পেয়েছেন শোনা গেছে। ওরকম কাজ এ যুগে তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব।

প্রতাপ: তাঁর মত পদস্থ লোক মেলায় এসে ওভাবে বড় বড় পুলিস অফিসারদের 'ফলো' করবেন, এ কি সম্ভব, স্যার?

যদুপতি: বড় বড় অফিসারদের উপরেই যে ওঁর যত কিছু বিরাগ আর সন্দেহ। যেখানেই উনি গেছেন, সেখানকার পুলিস বিভাগকে ঢেলে সেজেছেন। পুলিস যে ইচ্ছা করলে অনেক বড় বড় কাজ করতে

পারে—বহু দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ যে পুলিসের দ্বারাতেই সম্ভব, এই শংকরের মত লোকের কাজ দেখেই সেগুলো জানা যায়; অথচ, বাইরে ওর সুনাম নেই, বড় বড় অফিসাররা সবাই ওর বিরুদ্ধে; তবে শংকর কিছুই পরোয়া করে না—নিজের নাম যশেরও তোয়াক্কা রাখে না। ও চায়—সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত অন্যায়কে দাবিয়ে দিতে।

দুর্গা: সত্যি, একথা শুনলেও অহ্লাদ হয়। পুলিসের কথা উঠলেই আমাদের মনে জুলুমের কথা জেগে ওঠে। কিন্তু বৃটিশ সরকার পুলিসকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, পুলিস সে ক্ষমতা দেশের অনেক কাজেই লাগাতে পারতো—

প্রতাপ: কি করে পারবে বলো! নিছক স্বদেশ বাৎসল্য নিয়ে ত আর কেউ পুলিস-লাইনে ঢোকে না! পুলিসের তকমাই তখন জানিয়ে দেয় যে—দেশের লোকের উপরে যত জুলুম করতে পারবে, ততই হবে উন্নতি। অন্যের কথা কি বলব, তোমার কাকার মত শিক্ষিত ভদ্র অফিসারের ব্যবহারও ত দেখলে?

যদুপতি: জাহ্নবী যখন আমার উপরে অভিমান করে পুলিসে চাকরী নিয়ে আমাকে সে কথা জানায়, আমি তাতে খুসি মনেই ওকে বলেছিলাম—ইচ্ছা করলে পুলিস লাইনে ঢুকেও তুমি দেশের অনেক কাজ করতে পার। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, উল্‌টো রাস্তাই সে ধরেছে। এই কালকের কথাই ধরো, যা শোনা গেছে—তাতে ভুল নেই যে, সে লোকটা সাধারণ কেউ নয়—তাহলে তার হাতের কার্ড দেখে অতগুলো পুলিস অফিসারের মুখগুলো চুণ হয়ে যেত না; কিন্তু সে শংকরলালই হোক বা আর যে কেউ হোক, কত বড় একটা হাংগামা থেকে মেলার শান্তিটুকু রক্ষা করেছে ভাব দেখি? একেই বলি—দেশের কাজ। আমি ত এই সার মনে করি—হাতে ক্ষমতা এলে, সেই ক্ষমতা পুরোপুরি ভাল কাজে—

দেশের মংগলের কাজে লাগানোই হচ্ছে সত্যকার মনুষ্যত্ব। হতে পারে, সরকার হয়ত সেটা সুনজরে দেখবেন না—কিন্তু সে কাজটা যদি হয় সমাজের বা দেশের কল্যাণাত্মক, সরকারও অন্তত অন্তরে তার সমর্থন করতে বাধ্য। এমন সাহসী পুরুষ এ লাইনেও মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই। পাঠ্যজীবন থেকেই শংকরের মনেও ঐ ইচ্ছেটাই বড় হয়ে উঠে; কথায় কথায় সে বলত, পুলিস লাইনে ঢুকতে পেরে আমি যদি কোনদিন রীতিমত ক্ষমতা হাতে পাই—কি করে সে ক্ষমতা দেশের কাজে লাগাতে পারা যায় তা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দেব।

দুর্গা: তাঁর সঙ্গে কি তোমার জানাশোনা ছিল, বাবা?

যদুপতি: আমরা এক সংগেই বি-এ পাশ করি—শংকর ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বি-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শংকর পুলিস ট্রেণিং নিতে যান; তারপর ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই ঘোরাঘুরি করে ছেন। ওঁর ক্ষমতা দেখেই ভারত-সরকার ওঁকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান—সেখানকার পুলিসী ব্যাপারে কৃতবিদ্য হয়েই উনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সেই জন্যেই ওঁকে বিভাগের চুড়োয় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—কোন ভারতীয়ের পক্ষে যে জায়গাটি এ পর্য্যন্ত দখল করা সম্ভব হয়নি।

দুর্গা: তাহলে তোমার বন্ধুর স্বপ্নও এবার সফল হয়েছে বলতে হবে। এখন ক্ষমতাটা চুটিয়ে কিভাবে ব্যবহার করেন, সেইটিই হচ্ছে দেখবার বিষয়। আবার ক্ষমতা জিনিসটা এমনি বেয়াড়া যে, হাতে এলে মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে যায়—মতিগতি সব পালটে দেয় ঐ ক্ষমতা।

প্রতাপ: কিন্তু স্যার যা বললেন, আর আমরা যা দেখলুম, সত্যিই যদি উনি সেই লোক হন—তাহলে বলতেই হবে যে, তিনি তাঁর ছাত্র-জীবনের স্বপ্ন ভোলেননি।

—আরে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? পরদাখানা তুলে ঘরের ভিতরে চলে যান না; স্যার ঐ ঘরেই আছেন—বললুম না!

পাঠাগারের বাইরে দরদালানে দরজার ঠিক পাশটিতে এক বৃদ্ধকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সংঘের একটি ছেলে তাঁর উদ্দেশে কথাগুলি বললে। বৃদ্ধ একখানা টাঙ্গা থেকে সংঘের ফটকে নামতেই এই ছেলেটির সংগে দেখা হয়। অধ্যাপক যদুপতি মিত্রের সংগে দেখা করতে চান শুনেই সে হাতখানা বাড়িয়ে বলে দেয়—এই পথ ধরে সোজা চলে যান; খানিক গেলে ডাইনে বাঁয়ে দুখানা বড় বড় ঘর দেখতে পাবেন—বাঁ-দিকের বারাণ্ডায় উঠলেই দালানের সামনে দরজায় নীল পরদা ফেলা যে ঘরখানা দেখবেন—সেটা হচ্ছে পাঠাগার; স্যারকে সেই ঘরেই পাবেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নির্দেশমত ঠিকই এসেছেন; কিন্তু বারাণ্ডায় উঠে সরাসরি ঘরে না ঢুকে, কিম্বা সাড়া দিয়ে কাউকে না ডেকে, তিনি বারাণ্ডা থেকে দালানে এগিয়ে গিয়ে পরদা ফেলা দরজাটির পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফটকে দেখা সেই ছেলেটি এদিকে এসেই এই-ভাবে তাঁকে দেখে প্রাংগণ থেকেই ডেকে ভিতরে যাবার কথা পুনরায় বলে তার কাজে চলে গেল।

কথাগুলি জোরে বলায় ঘরের ভিতরেও তার রেশ ঢুকল—সংগে সংগে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল প্রতাপ। বৃদ্ধ ভদ্রলোকও এই সময় ভিতরে যাবার জন্যে পরদায় হাতখানি দিয়েছেন; ফলে দ্বারদেশেই দুজনে গায়ে গায়ে মিশে গেলেন।

বৃদ্ধের আপাদমস্তক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করল: কি দরকার আপনার?

বৃদ্ধ বললেন: সে কথা তোমার স্যারকেই বলব হে! তিনি ত ঘরেই—

বলেই বৃদ্ধ পরদাখানা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। প্রতাপও পিছু পিছু ঘরে ঢুকে দরজার কাছে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আগন্তুক যে বর্ষীয়ান পুরুষ, সে পরিচয় তাঁর আকৃতি থেকেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। হয়ত এক সময় দেহ-যষ্টি যষ্টির মতই সোজা, দৃঢ় ও দীর্ঘ ছিল, কিন্তু এখন ভেঙে পড়ায় তাঁকে ঈষৎ ন্যুব্জ হতে হয়েছে। চোখের কোলেও যে বার্ধক্যের ছায়া পড়ছে তার নানা নিদর্শন সুস্পষ্ট। মাথার চুল এবং স্থূল গুম্ফজোড়াটির অধিকাংশই পরিপক্ব। তাঁর পরিধানে ধোপদুরস্ত সাদা ধুতি, গায়ে সাদা বেনিয়ান, তার উপরে এলোমেলো ভাবে একখানা উড়ানি আস্তৃত, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের পেনেলা জুতা, হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি। বয়স সোত্তরের কম নয়—এমনি অনুমান হয়।

ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধ বললেন: আমি অবশ্যই মহাজাতি সংঘের প্রেসিডেন্টের সামনে এসেছি—নমস্কার।

যদুপতিবাবুও প্রতি নমস্কার করে একখানি খালি কেদারার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন: বসুন। কোথা থেকে মহাশয়ের আসা হচ্ছে?

ঝপ করে কেদারায় বসে পড়ে বৃদ্ধ উত্তর করলেন: এই সহর থেকেই; আমার নাম শ্রীশিবলাল শর্মা। চিনবেন না অবিশ্যি, তবুও আগন্তুকের অগ্রকর্তব্য হচ্ছে—আত্মপরিচয় দেওয়া।

দুর্গাও এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে বৃদ্ধটিকে দেখছিল; এই সময় মুখ টিপে মৃদু হেসে বলল: বয়সের তুলনায় আপনার দেহে কিন্তু বেশ শক্তি আছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বৃদ্ধ দুর্গার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কিসে বুঝলে বলত মা?

তেমনি সহাস্যে দুর্গা উত্তর করল: আপনার বসবার ভংগি দেখে। এত বয়সে অত জোরে কেউ চেয়ারে বসে না।

প্রতাপ এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ছিল; এই সময় তার জায়গায় ফিরে এসে বলল: দুর্গা ঠিক বলেছে—আমরাও অত জোরে বসিনে।

বৃদ্ধ বললেন: আমার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের মতন বয়স থেকে এই চলা বলা বসা—তিনটের উপরেই রীতিমত জোর দিয়ে এসেছি; কিন্তু বয়স যে এদিকে গড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে—সে হুঁস নেই!—বলেই বৃদ্ধ জোরে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে যদুপতি বললেন: ওটা হচ্ছে সংস্কার। বয়স গড়িয়ে গেলেই মনও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে—একথা ঠিক নয়। মন শক্ত থাকলে মানুষকে জানতে দেয় না যে তার বয়স বেড়েছে। আপনার বয়স কত হবে?

বৃদ্ধ বললেন: বাহাত্তরে এখনো পড়ি নি—তবে বাষট্টি পার হয়ে এসেছি।

দুর্গা বলল: তাহলে এমন বেশী কি হয়েছে বলুন? ওদেশের যাঁরা বিখ্যাত লোক, এই বয়সে কত কি করছেন! বড় বড় মিনিষ্টার কিম্বা জেনারেলদের কথাই ধরুন—যাঁরই নাম করবেন, ষাটের নিচে কেউ নেই!

বৃদ্ধ বললেন: ওঁদের কথা আলাদা—স্বাধীন দেশের লোক ত? তা তুমি ত মা, অনেক খপর রাখ—বেশ বেশ! আপনারই মেয়ে নিশ্চয়ই?

যদুপতি: আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ: আর, এ ছেলেটি? আপনার—

যদুপতি: আমার ঠিক ছেলে না হলেও, ছেলের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নয়—ছাত্র। যাক্, এখন আপনার কথাই বলুন—কি উদ্দেশ্যে এখানে আসা হয়েছে?

বৃদ্ধ: আমি এ সহরে নতুন এসেছি। এসেই আপনার সংঘের কথা সব শুনলাম। উদ্দেশ্য মহৎ—মহামিলন মস্ত কথা। বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী—চার চারটে জাতকে মিলিয়ে মহাজাতি করে গড়ে তোলার কথা শুনলেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত ভারত-তীর্থ কবিতার লাইনগুলি যেন মনের পাতায় ফুটে ওঠে। কিন্তু অধ্যাপক মশাই, বলুন ত—পারবেন এটা গড়ে তুলতে? ডোমিসাইল্ড সারটিফিকেটের ঠেলায় এই বিহারবাসীরা আর সব প্রদেশের বাসীন্দাগুলোকে কি রকম কোণ ঠেসে রেখেছিল, সে ত আপনার হাড়ে হাড়ে জানা আছে! সামান্য একটা চলতি প্রথা তুলতে যেখানে গোটা দুই তিন যুগ কেটে গেছে—চারটে প্রদেশকে মেলাতে কতগুলো যুগের দরকার সেটা মনে ভেবে দেখেছেন? তারপর, ইংরেজ সরকার এ মিলনের একান্ত বিরোধী; দেশ যদি রাজি হয়, জাত যদি তৈরী হয় মেলবার জন্যে, তবুও ইংরেজ মিলতে দেবে না—ইংরেজের রাজত্ব থাকতে ত নয়ই।

যদুপতি: দেখুন, একশো বছর ধরে দেশকে স্বাধীন করবার আন্দোলন চলে আসছে, দেশ এখনো স্বাধীন হয় নি—কিন্তু আন্দোলন থামেনি—একই ভাবে চলেছে। এবং স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবেই। আমার এ আন্দোলনও তাই। ইংরেজ রাজত্বের অবসান হলেই যে হবে—এমন আশাও করিনে; কারণ, তখনও বাধা আসতে পারে—স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হালটি ধরতে না পারেন! তবে, দেশ যদি রাজি হয়, জাতি মিলন চায়, তাহলে মহাজাতি

সংঘের সাধনা কখনই ব্যর্থ হবে না—হতে পারে না। আমার জীবনে না হয়, এদের জীবনে তা সিদ্ধ হবেই।

বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনছিলেন; এই সময় বললেন: সে ধৈর্য যদি আপনাদের থাকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়ে একে তুলে যেতে পারেন—তাহলে এর মার নেই। তবে এ কথাও বলি যদুপতিবাবু, স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন বাধা দিচ্ছে ইংরেজ, আপনার এই আন্দোলনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তেমনি প্রত্যেক প্রদেশের কতকগুলো সুবিধাবাদী স্বার্থপর। পরের মারের চেয়ে ঘরের মারটাই যে মর্মান্তিক!

বৃদ্ধের কথাগুলি শুনতে শুনতে অধ্যাপক যদুপতির চোখ দুটি হঠাৎ অস্বাভাবিক রূপে বড় হয়ে যেন কপালের দিকে ঠেলে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি শক্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর মুখের এই ভাব পরিবর্তন প্রতাপ ও দুর্গার দৃষ্টি এড়াল না, তারা পরস্পর একটা ইঙ্গিতময় দৃষ্টি বিনিময় করল।

যদুপতি এই সময় সোজা হয়ে বসে দুর্গাকে ইসারায় কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন: এঁর জন্যে কিছু ফল মিষ্টি নিয়ে এস ত মা!

দুর্গা তৎক্ষণাৎ ভিতরের দিকের দরজাটি খুলে চলে গেল। যদুপতি প্রতাপের দিকে চেয়ে বললেন: তুমিও যাও প্রতাপ, দুর্গাকে সাহায্য কর।...প্রতাপও সেই পথে ভিতরে গেল। সংগে সংগে যদুপতি উঠে ভিতরের দিকের দরজাটি বন্ধ করে এবং বাইরের দরজার সামনে দোদুল্যমান পরদাটির পাশ দিয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে নিজের আসনে সোজা হয়ে বসলেন—তাঁর মুখখানা তখন হাসিতে ভরে গেছে।

নির্বাক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ যদুপতির গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, তাঁরও মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি।

হঠাৎ যদুপতি বললেন: কত আশ্চর্য ব্যাপার একান্ত অপ্রত্যাশিত

ভাবেই আমাদের সামনে এসে পড়ে! এই দেখ না—তুমি আসবার মিনিট কয়েক আগেই তোমার কথা হচ্ছিল—কাল বিকেলে সোনপুরে যে রোমাঞ্চ নাটকের অভিনয় করেছিলে—সেই সম্বন্ধে!

বৃদ্ধ অতি বিস্ময়ে মুখখানা বিবর্ণ করে বললেন: কাকে বলছেন একথা প্রফেসর?

গম্ভীরমুখে যদুপতি উত্তর করলেন: স্যার শংকরলাল ছাড়া একথা আর কাকে বলতে পারি, স্যার? কিন্তু তোমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে হে! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড—আর ওয়াসিংটন পুলিস-ওয়ার্ডের মেক্‌আপ-এর কায়দা কিন্তু বানচাল হয়ে গেল এদেশী এক গুরুমশাইয়ের চোখে! খুবই তাজ্জবের কথা নিশ্চয়ই—কি বল ভায়া?

স্যার শংকরলাল সহাস্যে বললেন: তাজ্জব নয় হে—লজ্জার কথা যে, তাতে ভুল নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা আহ্লাদও যে হচ্ছে না তা নয়! শুনেছিলাম, তুমি নাকি মানুষ দেখে চিনতে পারো—কে কোন প্রকৃতির। এখানকার পুলিস থেকে কতকগুলো গোয়েন্দা নাকি তোমার সংঘে ভর্তি হতে এসেছিল; কিন্তু তুমি তাদের নাওনি—তাড়িয়ে দিয়েছিলে! এখন বুঝছি—মেকি জলুসের চেয়ে সাধকের দৃষ্টির জলুস অনেক—অনেকগুণ বেশী। এ পর্য্যন্ত আমার ছদ্মবেশ কেউ কিন্তু ধরতে পারেনি, তুমিই আজ আমাকে হারিয়ে দিলে। যাহোক, একটা কথা নিরালায় চট্ করে বলে রাখি যদু—তোমার মেয়ে আর ঐ ছেলেটির কাছে যেন আমাকে—

কথায় বাধা দিয়ে যদুপতি বললেন: তাহলে, তোমাকে চিনতে পেরেই ওদের দিই ঘর থেকে সরিয়ে? তবে ওরা তোমার জলখাবার নিয়ে এল বলে।

স্যার শংকরলাল স্মিতমুখে বললেন: তাই নাকি হে! জল না

খাইয়ে তাহলে ছাড়ছ না দেখছি? কিন্তু ও হাংগামা না করলেই পারতে।

যদুপতি বললেন: হাংগামা না করলে এভাবে আলাপ জমতো না, শেষে হয়তো ওদের সামনেই কেস্‌টাকে ফাঁস করতে হতো—তাতে বাহাদুরীটা খুব পাওয়া গেলেও তোমার আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকত না। তাই ওদের সামনে আর ভাঙিনি যে তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে—Sailing under false colours.

স্যার শংকরলাল সহাস্যে বললেন: খুব বুদ্ধিমানের মতই কাজটা করেছ। কেননা, তোমার কাছে অনেক বারই আসা-যাওয়া আমাকে করতে হবে—আর, এই সাজেই প্রতিবার আসা যাবে। এখন ওরা এলে ওদের সঙ্গেও আলাপটা ভাল করে জমিয়ে ফেলা চাই। তোমার মেয়েটি কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী, আর ছাত্রটিও বেশ চালাক চতুর ও সাহসী—সব দিক দিয়ে চৌখোস। সোনপুরেই এর আসল পরিচয় পেয়েছি হে!

ভিতরের দরজার কড়া দুটি এ সময় বেজে উঠতেই যদুপতি বললেন: চুপ—আসছে ওরা।

বলেই তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটি খুলে দিতেই হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করল দুর্গা—হাতে খাবারের থালা এবং পিছনে প্রতাপ, তারও উভয় হাতে ফলের পাত্র ও জলের গেলাস।

১৫

জলযোগের পর যদুপতি ছদ্মবেশী শংকরলালকে নিয়ে তাঁর বিস্তীর্ণ উদ্যানটির বিভিন্ন অংশগুলি দেখাতে বেরুলেন।

অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে বিচক্ষণ যদুপতির এতখানি মাখামাখি কৌতুকাবহ হলেও দুর্গা বা প্রতাপকে কোনরূপ অনুসন্ধিৎসু হতে দেখা গেল না। তিনি যে একান্তে এই বৃদ্ধের সংগে আলাপ করতে একান্ত ইচ্ছুক, উভয়েই তা বুঝেছিল বলেই এ সম্বন্ধে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কৌতূহল দমনে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের এরূপ দৃঢ়তাও এদের শিক্ষার অংগস্বরূপ।

উদ্যানের মধ্যে ছাত্রগণের শিক্ষা সম্পর্কে যত কিছু অভিনব ব্যবস্থা ছিল, যদুপতিবাবু তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটি স্থার শংকরলালকে দেখালেন, প্রয়োজন স্থলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। শংকরলাল বললেন: স্বাধীন দেশের ছেলেদের উপযোগী শিক্ষাই তুমি এদের দিয়েছ। ওদেশে গিয়ে, নিজে শিক্ষা নেবার সংগে শিক্ষা দেবার সংকল্প করেছিলে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

যদুপতি বললেন: আমাদের দেশেই দেখি, প্রাসংগিক শিক্ষাগুলির কোন তোয়াক্কা না রেখেই, সামান্য একটু সুযোগ সুবিধা পেলেই এমন সব কঠিন ব্যাপারে সুবিধাবাদীরা নেমে পড়েন, দায়িত্বের দিক দিয়ে যার অন্ত নেই। এই সব বড় বড় দলগুলোর দিকেই চেয়ে দেখ না— নেতা হবার জন্যে সবাই পাগল; এর জন্যে যে প্রচুর শিক্ষা আর কঠোর সাধনা চাই—সে দিকে কিন্তু কারুর লক্ষ্য নেই। এই যে সন্ত্রাসবাদ— এদেশের বেশীর ভাগ ছেলেই সাহসকে সম্বল করে এগিয়ে পড়ে, কিন্তু

এটাও যে শিক্ষার ব্যাপার—তা তারা ভাবে না। রাশিয়ার সন্ত্রাস-বাদীদের শিক্ষার যে সব ব্যবস্থা ছিল, শুনলে চমকে যেতে হয়। ভুঁইফোড় সন্ত্রাসবাদীরাই যে দলের পক্ষে অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এদেশে আমরা তার পরিচয়ও যথেষ্ট পেয়েছি! কোন একটা হিংস্র প্রচেষ্টার পর কি করে পালাতে হয়, দক্ষ গোয়েন্দার সামনে পড়লেও কি ভাবে তার নজর এড়াতে পারা যায়—এগুলো হাতে কলমে শিখবার বিষয়। এমন বিপ্লবীর কথাও আমরা জানি, একটা হুলস্থূল কাণ্ড করে এসে ময়রার দোকানে সামনের বেঞ্চিতে বসে খাবার খাচ্ছে—অথচ তার পাঞ্জাবীর পকেটের মুখে রিভলবারের বাঁটটি উঁকি দিচ্ছে! এরই জন্যে ধরা পড়ে সে সমগ্র দলটাকেই ধরিয়ে দেবার উপলক্ষ হয়। এ সব ব্যাপারে শিক্ষিত-পটু ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, যতীন মুখুজ্যে—এঁরা বুঝেছিলেন, দেশে সন্ত্রাসবাদ চালাতে হলে, দলের প্রতিটি ছেলেকে শিক্ষা দিতে হবে—ভুঁইফোড় দিয়ে এ কাজ হবে না।

শংকরলাল নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনছিলেন, বললেন: বাস্তব কথাই তুমি বলেছ, আর এ সম্বন্ধে চিন্তাও করেছ অনেক দেখছি। আরো আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এমন খোলাখুলি ভাবে আমার সংগে তুমি এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করে গেলে!

মৃদু হেসে যদুপতি বললেন: দেখ শংকর, পাঠ্যজীবনের যে অনুভূতি, সেটা কখনই ভুল হয় না। আজ তুমি পুলিসের যত বড় হোমরা চোমরা অফিসার হও না কেন, তোমার প্রকৃতির যে ছাঁচ আমার মনে উঠে গেছে, সেটা বদলাতে পারে না কিছুতেই; আমরা যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা পাই না কেন, আসলে কিন্তু আমরা প্রাচীন ভারতের সনাতন নীতির আদর্শ কেউ ভুলিনি—ভুলতে পারব না। মনে আছে, মহাভারত ও রাজস্থানের যোদ্ধাদের উদারতা নিয়ে আমরা দুজনে কত আনন্দই

উপভোগ করতাম। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করছে দুই পক্ষ—সেখানে মায়া নেই, দয়া নেই, একে অপরকে বধ করবার জন্যে পাগল। আবার দেখি, যুদ্ধের পর শিবিরে দিব্যি তাঁদের মিলন পর্ব চলেছে, পানভোজন গল্পগুজব কত কি! পর দিনই আবার যে এঁরাই মুখোমুখী অস্ত্র হাতে করে হানাহানি করবেন—ভাবতেও সারা মন দুলে উঠে! এই হচ্ছে—ভারতের আদর্শবাদ, ভারতীয় সমাজের চিরন্তনী কর্মনীতি। মনে আছে ত, পাঠ্যজীবনেও আমরা এ নীতির অনুসরণ করে কলেজে কি রকম চাঞ্চল্য তুলতাম?

শংকরলাল সহাস্যে বললেন: খুব আছে। আমাদের বিপক্ষ ড্যানিয়েলের সংগে তখন রীতিমত বিবাদ চলেছে, কথাবার্তা বন্ধ; তারপর একদিন সন্ধ্যের পর দুই বন্ধু তার ড্রয়িংরুমে চড়াও করে চায়ের কাপ নিয়ে বসে গেলাম—ড্যানিয়েল ত' অবাক! তাকে যেই বলা গেল—ঝগড়া আছে কলেজে, তা বলে বাড়ীতেও তার জের টানতে হবে নাকি? তখন ড্যানিয়েল হেসেই অস্থির—তার কি আহ্লাদ!

যদুপতি: তাই ভাবছিলাম, যদিই এমন দিন আসে, তোমাকেই হয় ত বাধ্য হয়ে মহাজাতি সংঘকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে; জানি, সরকারী চাকরীর তকমা যখন পরেছ—ওটা না ছাড়া পর্যন্ত তাকে তুমি কখনই কলংকিত করবে না—এটা যেমন সত্য; ভারতীয় আদর্শ থেকে কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না—এও তেমনি নির্ঘাত সত্য।

শংকরলাল: কিন্তু আমার আশংকা কি জান যদু, হয় ত সে দুর্দিন একদা আসবে—তোমার এ অনুমান বাস্তব হওয়াও আশ্চর্য নয়!

যদুপতি: দেখ ভাই, পাকা ব্যবসাদার যারা—কোন কারবার ফাঁদবার আগেই লোকসানটাকেই বড় করে খতিয়ে দেখে। লাভ যদি হয় বহুৎ আচ্ছা—কিন্তু লোকসানটা কতদূর পর্যন্ত হতে পারে, আর

সেটা সহ্য করবার ক্ষমতা তাদের পর্যাপ্ত কি না···এইটিই তারা ভাল করে বাজিয়ে নিয়ে তবে কাজে নামে। আমিও যে ব্যবসায় ধরেছি, গোড়াতেই ঐ লোকসানটার সংগেই আচ্ছা করে বোঝাপড়া করে তবে ভাই কাজে নেমেছি। আমার দেশ, আমার দেশের ছেলে—এই দুটোকে নিয়েই আমার কারবার। শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে এই ছেলে-গুলিকে মানুষ করতে হবে—মানুষের মত মানুষ! শুধু কলেজী শিক্ষাই কি মানুষ হবার মাপকাঠি? ওদেশে কি শুধু এই শিক্ষাই যথেষ্ট? যে শিক্ষার পথ ওদেশের ছেলেদের জন্যে অবাধ ও উন্মুক্ত—সেই পথ আমিও এদের সামনে খুলে দিয়েছি, শংকর! এখানে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই—লুকোছাপা কিছু নেই, খোলাখুলি ভাবেই আমি এদের দিয়েছি শিক্ষা।

শংকরলাল: তার হরেক রকম নিশানা ত চোখ দুটোকে ডবল করে দেখলাম হে—এত বড় বাগানটায় সব ছড়িয়ে রয়েছে! রিভলভার নিয়ে টারগেট, ট্রেঞ্চ ফাইট, বুস ফাইট, গেরিলা অ্যাটাক—সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার সংঘের ছেলেগুলোকে পাকাপোক্ত করেছ। সত্যি, মানুষ হতে হলে এগুলো অপরিহার্য—কিন্তু ওদেশের পক্ষে; যেহেতু তারা স্বাধীনদেশের ছেলে—রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়—কবির ছড়াটার মতনই। আর এদেশে এগুলো মস্ত অপরাধ!

বদুপতি: এইখানেই সরকারের সংগে মতবাদ নিয়ে আমার বিভেদ। আমি একে অপরাধ বলে মানবো না; আমি শিক্ষাব্রতী—ওদেশে যে সব শিক্ষা পেয়েছি, এদেশে ফিরে এসে আমার দেশের ছেলেদের সেই শিক্ষাতেই শিক্ষিত করে তোলা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি অবশ্যই বলতে বাধ্য হব যে, দেশ থেকে এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার

পাট তুলে দেওয়া হোক ; শিক্ষার এ দীনতা, শিক্ষার ব্যাপারে এ রকম পক্ষপাতিতা, শিক্ষাব্রতীরূপে আমি কিছুতেই সমর্থন করব না!

শংকরলাল : অবিশ্যি, একথাও সত্যি যে, সরকার সহজে তোমার মত শিক্ষাব্রতীকে ঘাঁটাতে সাহস পাবেন না ; কিন্তু এটাও ঠিক যে, তোমার এ শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থনও করবেন না—যেমন করেই হোক বন্ধ করে দেবেনই। শুধু তাই নয়, শিখিয়ে পড়িয়ে যতগুলি ছেলেকে তুমি কৃতবিদ্য করে তুলেছ, তাদের ওপরেই সরকার কড়া নজর রাখবে।

যদুপতি : তোমাকে ত আগেই বলেছি, সব রকম লোকসানের সংগেই বোঝাপাড়া আমার আগেই হয়ে গেছে।

শংকরলাল : মুস্কিল হচ্ছে কি জান যদু, আমাদের দেশের লোকই আমাদের দুষমন। এই যে ছেলেগুলিকে তুমি এত যত্নে তৈরী করেছ, এটা অল্প লোকই ভালভাবে নেবে। বেশী কথা কি বলব, তোমার ভাই জাহ্নবী পর্যন্ত তোমার সংঘের প্রতি প্রসন্ন নন, বরং তাঁরই আক্রোশ সবার চেয়ে বেশী!

যদুপতি : আমি তা জানি।

শংকরলাল : তোমাদের বিতর্কের মূল কথাটা আমি শুনেছি। তাই, আমার মাথায় একটা খেয়াল জেগেছে, তোমার মত শিক্ষাব্রতীর মুখ দিয়ে যে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে, সেইটেকেই একটা 'চ্যালেঞ্জ' বলে নেওয়া—

যদুপতি : সর্ব্বনাশ! এ কথা তুমিও বলছ শংকর? জানো, কথাটা বলবার পরই, আবার আমি অন্য কথা পেড়ে সেটাকে চাপা দিই—যাতে জাহ্নবী সত্যিই না ভাবে, আমার সংঘের ছেলেগুলোকে নিয়ে আমি তাকে 'চ্যালেঞ্জ' করছি!

শংকরলাল : তাহলে একটা কথা বলি যদু, বেশ মন দিয়ে শোনো।

যখন তুমি ভারতীয় আদর্শের পক্ষপাতী, তোমার এই শিক্ষাব্রতটাকে ভারতীয় আদর্শে যাচিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু এইখানেই তোমার ত্রুটি রহে গেছে।

যদুপতিঃ তোমার কথাটা দুর্বোধ্য হলেও আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছ—সংঘের ছেলে ও লোক দিয়ে আমি এমন কিছু একটা বড় রকমের কাণ্ড বাধাই, যাতে আমার শিক্ষা ও ছেলেদের তাতে পটুতার একটা খোলাখুলি ভাবে পরীক্ষা হয়ে যায়—এই ত?

শংকরলাল: ইয়া! এই আমার আইডিয়া—তুমি ঠিক ধরেছ। এ ব্যাপারে মহাভারতের নজিরটা ভাব ত! দ্রোণাচার্য তাঁর ছাত্রগুলিকে শিক্ষা দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না; তাঁর শিক্ষাগুলো ছেলেরা কি ভাবে নিয়েছে, সেটা হাতে কলমে যাচাই করবার জন্যে তিনি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। পাঠ্যজীবনে পাঞ্চাল রাজপুত্র দ্রুপদ ছিলেন তাঁর সহপাঠী, দুজনের মধ্যে খুবই সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু রাজতক্তে বসেই দ্রুপদের মাথা গেল ঘুরে—ছাত্রজীবনের বন্ধু দ্রোণকে নীচের তলার মানুষ ভেবে অপমান করে বসলেন। দ্রোণাচার্যের মনে সেটা সর্বদাই খচখচ করে বিঁধতে লাগল। কুরুবংশের ছেলেদের কৃতবিদ্য করে তুলে দ্রোণ বুঝলেন, একটা সুযোগ এসেছে। ভাবলেন, এক সংগে দুটো কাজই হাসিল হবে। ছেলেগুলিকে দ্রুপদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে তাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা নেওয়া হবে, আর সে পরীক্ষায় যদি তারা সাফল্য লাভ করে, তাহলে বন্ধুকৃত অপমানের রীতিমত প্রতিশোধ নিয়ে গর্ব বোধ করবেন। দ্রোণাচার্যের সে পরীক্ষার কি ফল হয়েছিল, সে ত জানোই! দ্রোণাচার্য বুঝলেন, তাঁর শিক্ষা হয়েছে সার্থক এবং তাই আচার্যরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠাও হলো অপ্রতিহত! অবস্থা বুঝে আমিও দ্রোণাচার্যের এই দৃষ্টান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিলাম, ভায়া!

যদুপতির প্রশান্ত মুখখানা সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—আদর্শবাদী বন্ধুর যুক্তি তাঁর মনোরাজ্যে যেন এক নূতন আলোকপাত করল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, পরক্ষণেই তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন: মহাভারতের যুগ যদিও এখন নয়, কিন্তু ভারতীয় আদর্শে আমরা যখন আস্থাবান—অতীতের সে ঘটনাকে যে রূপ দেওয়া যায় না এমন কথা আমি বলিনে। মহাত্মা বিবেকানন্দের বীর-বাণীর আমরা যখন সাধক, অসাধ্য সাধন আমাদের পক্ষেই সম্ভব। তোমার কথা শুনে শংকর, স্বামীজির সেই কথা মনে পড়ছে: জীবনে যারা চরিত্রবলে শক্তিমান, তাদের স্থান সবার আগে—জীবন-সংগ্রামে তারাই হবে জয়ী, দেরী হতে পারে কিন্তু হবেই হবে।…আমার সংঘের ছাত্রগুলিকে লক্ষ্য করে আমিও একথা বলতে পারি।

এরপর দুই বন্ধুর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আরো অনেক কথা হলো এবং সে সব কথা তাঁদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রইল।

১৬

সে'দিন আহারাদির পর জাহ্নবী সপরিবার দেওবর রওনা হবেন, এই ব্যবস্থা হয়েছে। রামসদয়বাবু খুবই ব্যস্ত। ক'দিন আতিথ্য সৎকারে বাড়াবাড়ি কাণ্ড করেও তিনি তৃপ্তি পাননি; খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যে-গুলি বাদ পড়ে গিয়েছিল, হয়ত পাওয়া যায়নি কিম্বা সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি—যাবার দিনে সর্বপ্রযত্নে সে-গুলির ব্যবস্থা ত করেছেনই, উপরন্তু সুপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য যে সব বস্তুর আয়োজন করেছেন, তাদের একীকরণ সত্যই বিস্ময়াবহ।

সূপকার্যে উপযুক্ত পাঁচক থাকা সত্বেও সুহাসিনী নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি ; এইখানেই বাঙালী মেয়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। দুই বেলাই তিনি পাকশালায় গিয়ে তত্ত্বাবধান করতেন, এবং প্রতিদিনই অত্যধিক আয়োজনের জন্য তাঁকে রামসদয়বাবুর সংগে ঝগড়া করতে হতো ; গৃহস্বামীর একান্ত আগ্রহ সত্বেও জোর করে তিনি খাদ্যের মেনু কমিয়ে দিতেন। খাবার সময় সহাস্যে বলতেন—দেখুন ত, তবুও কত নষ্ট হলো ; যে গুলো জোর করে তুলে রেখেছি—এবেলা রাঁধতে দিইনি, এর ওপর সে গুলো পাতে পড়লে কি হতো ?

রামসদয়বাবু উত্তর করতেন—সেগুলোও চাকা যেতো। কত চেষ্টা যত্ন করে আনালাম, আপনি ঠাকুরকে রাঁধতে দিলেন না। এই নিয়ে আপনার ভগিনীর সংগেও আমার নিত্যি কিচ্‌কিচ্‌ হতো।

সুহাসিনী বলেন—দেখুন, যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। আপনাদের দপ্তরের কাজে আমরা যেমন মাথা দিতে যাইনে, আমাদের এলাকাতেও তেমনি আপনাদের মাথা গলানো উচিত নয়। অনুচিত করেন বলেই কিচ্‌কিচ্‌ বাধে, ঠোকাঠুকি হয়।

জাহ্নবী এসব ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত। তাঁর ধারণা, খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে সাংসারিক ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে যাওয়াটা মানেই নিজেকে খাটো করা। নিতান্ত সাধারণ স্তরের স্বামীরাই এসব করে থাকে। তাই রামসদয়ের মত পদস্থ বন্ধুকে রান্নাবান্না সম্বন্ধে এত মাথামাথি করতে দেখে তিনি ভেবে পান না যে, এ পাগলামী তার কেন? যাবার দিনেও খাইদাই ব্যাপারে আয়োজনের বাড়াবাড়ি দেখে সুহাসিনী যখন গজ গজ করছিলেন, রামসদয়বাবু সেটা তাঁর কর্তব্য আর স্বভাব বলে জানাতে চাইছিলেন, সেই সময় জাহ্নবী হঠাৎ একটা খোঁচা দিয়ে বললেন : তুমি এতও পার রামসদয়! যে সব সরকারী ঝক্কি নিয়ে থাকো,

তার ওপরে খাওয়া দাওয়ার আইটেমও তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে! এর জন্যে ত লোক যথেষ্ট রয়েছে, এ কাজ যাদের, তারাই করবে, তোমার এ সব বাজে খাটুনি কেন বলত? এতে যে নিজেকে ছোট করা হয়, আর ওরাও আস্কারা পায়।

কথাটা বেশী করে সুহাসিনীর গায়ে লাগল। মেয়েদের স্বভাব হচ্ছে, গৃহস্থালী ব্যাপারে তাঁদের ব্যবস্থার উপরে স্বামীর হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না, কিন্তু স্বামী একেবারে নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকেন—সেটাও তাঁরা চান না। জাহ্নবীর ত এসব কোন বালাই নেই—'কত ধানে কত চাল' তার খোঁজ খবর রাখাটাও তিনি অগৌরবের কথা মনে করতেন। কিন্তু এখানে এসে সুহাসিনী দেখলেন, রামসদয়বাবু তার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন গৃহিণী না হয় অনুপস্থিত, কিন্তু খবর নিয়ে জানলেন তিনি, রান্নাবান্নার ব্যাপারে বরাবরই নিজের কর্তৃত্বটুকু রামসদয়বাবু বজায় রেখেছেন; বাজার করা থেকে রান্নার ব্যবস্থা, খাবার 'মেনু' সবকিছু তিনিই ঠিক করে দেন। একটু নড়চড় হলেই মুস্কিল। আগের দিকটা সমর্থন করলেও শেষের দিকটা সুহাসিনীর চোখে খুব বাড়াবাড়ি ঠেকেছিল; তাই পুরুষের এই কর্তৃত্ব ত্রুটি বেলাই তিনি সংকোচ করতে চাইতেন, তাঁর ব্যবস্থাকে অব্যবস্থার অপবাদ দিয়ে। কিন্তু এদিন গৃহস্থালী ব্যাপারে গৃহস্বামীর ঘনিষ্ঠতাকে কটাক্ষ করায় অর্থাৎ এ কাজটা ছোটলোকের—একথা জাহ্নবী বলাতে, সুহাসিনী ফোঁস করে উঠলেন; মুখখানা উঁচু করে বললেন: জানো, কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে এ কাজ করেছেন?

জাহ্নবীও কথাটা শুনে জ্বলে উঠলেন; কোন বিখ্যাত লোকের প্রসংগ তুলে কেউ তাঁকে খাটো করতে এলে কোনদিনই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, নিজের ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে ছোট করতে চাইতেন জোর করে। তাই স্ত্রীর কথার সংগে সংগেই

বলে উঠলেন : তিনি করতে পারতেন ; তাঁর ত আর কোন কাজ থাকত না—বসে বসে শুধু পদ্য বাঁধা ছাড়া।

রামসদয়বাবু হেসে উঠলেন। সুহাসিনী আরো জ্বলে গেলেন, কিন্তু তখনই মুখখানা শক্ত করে বললেন : কবিকে যদি ধরতে না চাও, পুলিসই তোমার মাপকাঠি হয়, তাহলে আমার জেঠামশাই কলকাতা পুলিসের যিনি ছিলেন মাথা, তিনিও রামসদয়বাবুর মতন এ কাজ করতেন। কিন্তু এই সময় রামসদয়বাবুর এক মুহুরী ব্যস্তভাবে এসে বলল : ডুমকা থেকে পুলিস সাহেব ট্রাংক কলে ফোন করেছেন—আপনাকেই ডাকছেন মিঃ মিত্র।

তখনি জাহ্নবীকে কথা ফেলে উঠতে হলো। তাড়াতাড়ি রামসদয়-বাবুর আফিস ঘরে গিয়ে ফোন ধরলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে সাহেবের সঙ্গে কথা হলো তাঁর।

রামসদয়বাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। কারণ, হুইলার সাহেবকে পাটনার ব্যাপারগুলো সবই জানানো হয়েছে, সেই সম্পর্কেই যে তিনি জাহ্নবী মিত্রকে ফোনে ডেকেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

জাহ্নবী এসে গম্ভীর ভাবে বললেন : যাওয়া আজ হলো না রামসদয়।

এ কথায় রামসদয়বাবুর মুখখানা খুবই প্রসন্ন হলো, কিন্তু সুহাসিনী বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন : কেন, কি হলো ?

জাহ্নবী বললেন : হুইলার সাহেব পাটনায় আসছেন নিজে। সেক্রেটারীর সংগে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব, তিনি স্যার শংকরকে সরাবার জন্যে কি একটা মোক্ষম চাল চালবেন বললেন। তাঁর না আসা পর্যন্ত যাওয়া হবে না। কাল বিকালে পাঁচটায় সেক্রেটারীর বাড়ীতে আমাকে দেখা করতে বললেন, তিনি ওখানেই উঠবেন।

সুহাসিনী বললেন : একেই বলে—নিজের নাক কান কেটে অন্যের

যাত্রা ভঙ্গ করা। হুইলার সাহেবের ত রাগ হবারই কথা—এদেশী লোক হয়েছেন তাঁর উপরওয়ালা। কিন্তু দেশবাসীর বিরুদ্ধে যাওয়াটা কি তোমাদের ভাল হচ্ছে?

জাহ্নবী বললেন: আমাদের ভাল মন্দ আমরা ভাল ভাবেই বুঝি। এ সব ব্যাপার নিয়ে তোমাদের কথা না বলাই ভাল—বুঝলে?

সুহাসিনী উত্তর করলেন: আমার বোঝা একদিনেই হয়ে গেছে। যে লোক পুলিসের অত বড় 'পাওয়ার' পেয়েও নিজেকে অমন করে চেহারা পাল্‌টে ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে, যতই তোমরা কর—কিছুতেই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

জাহ্নবী অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে তাকালেন মাত্র? কিছু বললেন না মুখে। রামসদয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন: আমি তোমার সঙ্গে থাকলে সাহেবকে একটা মস্ত ধন্যবাদ দিতাম।

মৃদু হেসে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন: কেন বলুন ত? সাহেবের ফোনে আমাদের যাওয়াটা বন্ধ হলো বলে?

তেমনি হেসে রামসদয়বাবু বললেন: সত্যি তাই—ঠিক ধরেছেন। আপনাদের তোয়াজ করতে যে-কাজগুলো বাকি আছে, এবার সাধ মিটিয়ে পূরণ করা যাবে। তারপর হুইলার সাহেব যখন আসছেন, এক-দিন তাঁকেও একটা ডিনার না দিলে কি ভাল দেখাবে?

জাহ্নবী বললেন: এটা আমিও সমর্থন করি; কেননা, হুইলার সাহেবই এখন আমাদের মস্ত আশা ভরসা। ওঁকে তোয়াজ করায় লাভ আছে। আর ওঁর জন্যে আমি নরকের শেষ প্রান্তেও নেমে যেতে পারি—বুঝলে?

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন: তাতে কি চতুর্বর্গ লাভ হবে, না চতুর্ভুজ হবে?

জাহ্নবী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন: দেখতেই পাবে।

পরদিন অপরাহ্নে বিহার গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ পার্শিভাল আই, সি, এস-এর বাংলোয় জাহ্নবী উপনীত হলেন—পাঁচটা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগেই।

হুইলার সাহেব জাহ্নবীর প্রতীক্ষা করছিলেন—কার্ড পেয়েই ডেকে পাঠালেন।

জাহ্নবীর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাটনার ব্যাপার—মায় হরিহর সত্রের মেলার অপ্রীতিকর ব্যাপারগুলো পর্যন্ত সব জেনে নিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস অফিসারদের কথাও সব শুনলেন।

হুইলার সাহেবের বয়স এখনো পঞ্চাশের নিম্নে—চুলে পাক ধরেনি, দেহের গঠনেও টোল খায় নি, দিব্যি নিটোল চেহারা, লম্বায় ছয় ফিটের কম নয়; মুখখানাও লম্বা এবং মুখের উপর একজোড়া জমকালো কুচকুচে কালো পুরু গোঁফ তার গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখের বড় বড় তারা দুটো ঘোলাটে হলেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী। কিন্তু প্রকৃতি তাঁর অত্যন্ত অস্থির ও অসহিষ্ণু। স্যার শংকরলালের প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে সাহেব মধ্যে মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনো বা কার্পেটের উপর বুট ঠুকে জড়িত কণ্ঠে এমন এক একটা অশিষ্ট বাণী বলছিলেন যে, তাতে তাঁর চরিত্রগত শালীনতার অভাবই সূচিত হচ্ছিল। জাহ্নবী কিন্তু তাতে বিরক্ত না হয়ে বরং মনে মনে খুসীই হচ্ছিলেন। সাহেব অনেক প্রশ্নই জাহ্নবীকে করলেন। এই সূত্রে জাহ্নবী অম্লান বদনে মহাজাতি সংঘের কথা তুলে তাঁকে ১৯০৫ অব্দের কলকাতা পুলিসের মস্ত আবিষ্কার—মুরারীপুকুর বাগানের বোমার কারখানার সঙ্গে তুলনা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না।

এ খবর শুনেই হুইলার সাহেব সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন: বল কি, স্যার শংকর সব জেনেও সেটা অগ্রাহ্য করলেন? 'ওয়াচ' করতেও বললেন না?

জাহ্নবী বললেন: এমনও হতে পারে, নিজের লোক দিয়ে 'ওয়াচ' করে বাহাদুরীটা শেষে নিজেই নেবেন।

সংঘের ভিতরকার ব্যাপারটির আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক যদুপতির কথা উঠতেই জাহ্নবী বললেন: এই লোক শ্রীঅরবিন্দ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মিলিত সংস্করণ। মিঃ বোস ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে জারমানিতে—সেখান থেকে বেতারে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচার করছে, আর এখানে তার এজেণ্ট হয়ে যারা কাজ করছে—তারাও এক একটা সুভাষ বোস। এই ব্যাপারটার ওপরেই আমরা জোর দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্যার শংকর তার জন্যে ধমকে দিয়েছেন।

মুখখানা লাল করে মিঃ হুইলার বললেন: স্যার শংকরের বিরুদ্ধে 'য়্যালিগেসান' চালাবার পক্ষে এটা একটা খুবই ধারালো অস্ত্র—যদি সংঘের ব্যাপারটা সত্যিই বে-আইনি হয়, আর প্রফেসর মিত্রকে পঞ্চম বাহিনীর লোক বলে প্রতিপন্ন করা যায়।

জাহ্নবী দৃঢ়স্বরে বললেন: সেটা শক্ত হবে না স্যার!

মিঃ হুইলার জিজ্ঞাসা করলেন: প্রফেসর মিত্রকে তুমি কি ভাল ভাবে জান?

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে জাহ্নবী উত্তর করলেন: পৃথিবীতে তাঁকে আমার চেয়েও ভাল করে জানবার মত উপযুক্ত লোক আর কেউ নেই, স্যার!

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে হুইলার জিজ্ঞাসা করলেন: একথা বলবার মানে?

তেমনি গাঢ়স্বরে জাহ্নবী বললেন: মানে হচ্ছে স্যার—প্রফেসর মিত্র আমার অগ্রজ—আমার সহোদর ভাই।

একটু আগে এই অস্থির প্রকৃতি সাহেব চেয়ারে বসেই মহাজাতি সংঘ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। এই সময় সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন: what! কি বললে তুমি জাহ্নবী, প্রফেসর মিত্র তোমার ভাই ?

সাহেবকে উঠতে দেখে জাহ্নবীও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: হ্যাঁ স্যার!

জাহ্নবীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সাহেব প্রশ্ন করলেন: ভাই হয়ে তুমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে এত বড় একটা চার্জ্জ আনতে চাইছ? জানো এর কি পরিণাম ?

মুখখানা উঁচু করে সুস্পষ্ট স্বরে জাহ্নবী বললেন: আমি স্যার, এইমাত্র জানি আমার কর্তব্য হচ্ছে—বৃটিশের প্রেষ্টিজ নষ্ট করতে যারা চুপি চুপি চোরের মত হাত বাড়াচ্ছে, তাদের মুখোস খুলে দেওয়া উচিত—এখানে ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, সন্তান বলে কেউ নেই।

আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মিষ্টার হুইলার জাহ্নবীর মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন; সমস্ত মুখখানা তাঁর মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে পড়বার মত করে দেখে মিঃ হুইলার বললেন: 'অলরাইট, জাহ্নবী! আমরা এ যুদ্ধ জয় করেছি। তোমাকে হাতে করেই আমি স্যার শংকরলালের মাথা ঘুরিয়ে দেব।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: এখন আমার ওপরে কি হুকুম—আমাকে কি করতে হবে ?

মিঃ হুইলার বললেন: আজ রাতেই আমি সেক্রেটারীকে সব কথা বলব। তুমি একটা রিপোর্ট তৈরী করে ফেল। আর পাটনার ইনচার্জ্জের ফাইলটাও চাই—স্যার শংকর যেটা দেখাও দরকার মনে করেন নি। আমি তাকেও তলব করছি। আর এ হপ্তাটা তুমি

এখানে থেকে যাও। সাত দিনের মধ্যেই আমরা একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে পারব। কাল আবার এই সময় আমাদের দেখা হবে।

সাহেবকে অভিবাদন করে প্রফুল্ল মুখে জাহ্নবী বিদায় নিলেন।

১৮

পাটনার সিটি অফিসার পণ্ডিত মহাদেব মিশ্র কোতোয়ালী সংলগ্ন সরকারী ভবনে সপরিবার বসবাস করেন। বেশ সুশ্রী ও সুপুরুষ, বয়স পঞ্চাশের নিচে; মুখখানা ভারি—মাংসল, দাড়ি গোঁফ কামানো; ভ্রু দুটি প্রায় কেশহীন, নাকটা যেমন মোটা, তেমনি উঁচু। চোখ দুটি ছোট হলেও তীক্ষ্ণ; দেহ চওড়া ও মজবুত। এক কথায় আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে পুলিস অফিসার জাহ্নবী মিত্র ও রামসদয় বাবুর সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য আছে। ইনিই পুলিস কনফারেন্সে মহাজাতি সংঘের বিরুদ্ধে লম্বা একটা রিপোর্ট তৈরী করে সংঘের কর্মপীঠ সার্চ করবার জন্যে প্রস্তাব তুলেছিলেন; কিন্তু স্যার শংকরলাল সে প্রস্তাব ত গ্রাহ্য করেনই নি, উপরন্তু এই শ্রেণীর ব্যাপারে শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে প্রকৃত অপরাধীদের সন্ধানে সচেতন হবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন।

পণ্ডিত মিশ্র ভেবেছিলেন, এমন একটি চমৎকৃত হবার মত রিপোর্ট দাখিল করে কোথায় তিনি রীতিমত একটা বাহোবা পাবেন; কিন্তু সেক্ষেত্রে স্যার শংকর কিনা তাঁর রিপোর্টখানা পড়ে দেখাও দরকার মনে করলেন না; কিন্তু যদি এই পোষ্টে পূর্বতন অফিসার গর্ডন সাহেব বাহাল থাকতেন, তাহলে তিনি এ রিপোর্টের কি কদরই না করতেন!

কথাটা হুইলার সাহেবের কানে উঠতেই তাঁর ঝুনো মাথার মধ্যেও এই ব্যাপারটা তাল-গোল পাকাতে থাকে ; তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্যার শংকরলালকে কাবু করবার পক্ষে, সত্যই এটি মোক্ষম অস্ত্র। তারপর পাটনায় এসে জাহ্নবী মিত্রের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনার পর তিনি যে কি ভাবে আশান্বিত হয়ে ওঠেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

জাহ্নবীর সঙ্গে আলোচনার পর দিনই হুইলার সাহেব সেক্রেটারীর এক চাপরাশীকে পণ্ডিত মিশ্রের বাসায় পাঠালেন। চাপরাশী বাসায় গিয়ে শুনল, ঘণ্টাখানেক আগেই মিশ্রজী বেরিয়ে গেছেন। চাপরাশীর হাতে হুইলার সাহেব একখানি চিঠি দিয়েছিলেন, তার উপর হুকুম ছিল—চিঠিখানা মিশ্রজীর হাতে দেবে এবং তাকে সঙ্গে করে সাহেবের বাসায় আনবে। কাজেই, মিশ্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো কোতোয়ালীর ওয়েটিং রুমে।

এদিকে পণ্ডিত মিশ্রের বাড়ীতে সকাল ঠিক আটটার সময় এক সওয়ার এসে হাজির। মিশ্রজী তখন প্রাতঃক্রিয়া শেষ করে ধড়াচূড়া পরে কোতোয়ালীতে যাবার উপক্রম করছেন। সওয়ার এক চিঠি দিল তাঁকে। চিঠিখানা পড়তে পড়তে পণ্ডিত মিশ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল; একি তাজ্জবের কথা। মহাজাতি সংঘের যে রিপোর্ট স্যার শংকরলালকে সেদিন দাখিল করতে গিয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, গোটাকতক শক্ত শক্ত কথাও শুনতে হয়েছিল তাঁকে, আজ সেই রিপোর্ট এবং সেই সংক্রান্ত সব কিছু কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি—শুধু চেয়ে পাঠানো নয়, জরুরী হুকুম জানিয়েছেন যে, সেগুলি নিয়ে এখনি তাঁকে স্যার শংকরলালের কুঠিতে হাজির হতে হবে—তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছেন।

চিঠি খানা পড়তে পড়তে পণ্ডিতজীর মুখখানা প্রফুল্ল হয়ে উঠল, মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদও এলো—স্যার শংকরকে এভাবে উপযাচক হয়ে তাঁর তৈরী রিপোর্টকে সাদর আহ্বান করতে দেখে। বুঝলেন, এই নিয়ে যে সব কাণা-ঘুষা চলেছে—তার আভাস পেয়ে সরকারই সম্ভবত স্যার শংকরকে হুড়ো দিয়েছেন। যাই হোক, পণ্ডিত মিশ্র তাড়াতাড়ি মহাজাতি সংঘ সংক্রান্ত ফাইলটি নিয়ে স্যার শংকরের উদ্দেশে রওনা হলেন।

পণ্ডিতজী যখন কোতোয়ালীতে ফিরলেন,—এগারোটা বেজে গেছে। হুইলার সাহেব ঠিক দশটার সময় সেক্রেটারীর বাসা থেকে তাঁর কাছে যখন চাপরাশী পাঠাচ্ছেন, তখনও পণ্ডিত মিশ্র স্যার শংকরলালের খাস কামরায় তাঁর সামনে বসে কাঠগড়ার আসামীর মত কম্পিত কণ্ঠে এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

গাড়ী থেকে নেমে পণ্ডিত মিশ্র যখন কোতোয়ালীর বারাণ্ডায় উঠলেন, তাঁর মুখখানা তখন গম্ভীর—ঘণ্টা আড়াই পূর্বে যে প্রসন্নতা নিয়ে তিনি স্যার শংকরলালের কুঠির উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন, তার কোন চিহ্নই নাই।

এই সময় চাপরাশী সামনে এসে একটা লম্বা সেলাম করে হুইলার সাহেবের চিঠিখানা তাঁর হাতে দিল। চিঠি পড়েই পণ্ডিতজীর দুই চক্ষু আর একবার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কি মুস্কিল! হুইলার সাহেব লিখেছেন—মহাজাতি সংঘের ফাইলটী নিয়ে এখনি তুমি এই লোকের সংগে আমার বাসায় আসবে। কিন্তু সে ফাইল ত তিনি এইমাত্র স্যার শংকরলালের কাছে দাখিল করে এসেছেন!

যাই হোক, চাপরাশীকে সংগে নিয়েই তিনি গাড়ীতে উঠলেন। স্যার শংকরলালের বিরুদ্ধে সংগোপনে তাঁরা যে দল পাকাচ্ছেন, হুইলার সাহেব

হচ্ছেন তার সর্বেসর্বা ; সুতরাং তাঁকে হাতে রাখতেই হবে এবং যে সব ব্যাপার আজ ঘটেছে তাঁকে জানাতে পারলে তবে তিনি কতকটা স্বস্তিও পাবেন। মিঃ হুইলার চঞ্চল ভাবে ড্রয়িং রুমে পাইচারি করছিলেন—তাঁর মাথার মধ্যে তখন মহাজাতি সংঘের মানুষগুলি নানারূপ অপরাধ-প্রবণ-মূর্তি ধরে যেন ছুটো-ছুটী করছিল ; সেগুলোকে ধরে তাদের হাতে হাত-কড়া পরিয়ে স্যার শংকরলালের উপর টেক্কা দেবার একটা পরিকল্পনাও গড়ে উঠছিল। এমন সময় চাপরাশী এসে পণ্ডিতজীর আগমন সংবাদ দিল তাঁকে।

সোল্লাসে ও সোৎসাহে পণ্ডিত মিশ্রের করমর্দন করে মিঃ হুইলার তাঁকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে হঠাৎ যেন দমে গেলেন। পণ্ডিত মিশ্র যে খালি হাতে এসেছেন, কোন ফাইল ত সঙ্গে নেই—সেটা এতক্ষণে সাহেবের নজরে পড়ল। ভগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যালো মিশ্রা, ফাইলটা ছেড়ে এসেছ নাকি—আনোনি ?

শুষ্ক কণ্ঠে পণ্ডিতজী বললেন : এক্সট্রিমলি স্যরী স্যার ! আপনার চিঠি পাবার অনেক আগে—সকাল তখন সাড়ে আটটা; স্যার শংকরলাল এক সওয়ার পাঠিয়ে জানান—তখুনি যেন সেই ফাইল নিয়ে তাঁর কুঠিতে হাজির হই।

অতি বিস্ময়ের একটা চাপে বুঝি মিঃ হুইলারের সর্বাংগ আড়ষ্ট হয়ে গেল ; পণ্ডিত মিশ্রের মুখে ম্লান দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন : ফাইল তাহলে তাঁকে দিয়ে এসেছ ?

পণ্ডিতজী জড়িত স্বরে বললেন : আমি ত কিছুই জানতাম না স্যার, দিতে বাধ্য হয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে আপনার চিঠি পাই। যদি আগেই আপনার চিঠিখানা পেতাম স্যার !

মিঃ হুইলার বললেন : আমিই গোড়ায় ভুল করেছি, পণ্ডিত মিশ্রা !

এখানে এসেই যদি তোমাকে ডাকতাম। যাক, হঠাৎ স্যার শংকর ঐ নেগলেকটেড কেসটার ব্যাপারে এত উৎসাহী হলেন কেন—কিছু বুঝতে পেরেছ?

পণ্ডিত মিশ্র মুখখানার এক বিচিত্র ভংগি করে বললেন: স্যার শংকর একবারে দুর্বোধ্য স্যার! ওঁকে বোঝবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। সেদিন ফাইলটা দেখতেই চাইলেন না, অথচ এখন দেখবার কি তাড়া—যেন এর জন্যে তাঁর চোখে ঘুম নেই!

তোমাকে কিছু বললেন?

কিছু? অনেক স্যার—অনেক; আসামীকে আমরা যেমন ক্রস করি, তেমনি করে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। তার মানে হচ্ছে স্যার, রিপোর্টে যা লিখিছি, তার সংগে মিল আছে কি না যাচিয়ে নেওয়া।

সেদিন তোমার রিপোর্ট নেগলেক্ট করেছিলেন কেন, তা কিছু বললেন?

বলেছেন স্যার! কিন্তু সে বলার মানে কিছু বুঝলাম না; বললেন, ব্যাপার কি জানো, সবার সামনে সেদিন এ কেস্‌টাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত মনে করিনি—ডিষ্ট্রিক্টের ব্যাপার নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসাররাই মাথা ঘামাবে। কনফারেন্সে—হোল প্রভিন্সের অফিসাররা ছিলেন কিনা!

কণ্ঠস্বরে এখন জোর দিয়ে মিঃ হুইলার বললেন: নন্‌সেন্স! স্যার শংকরের সন্দেহ কেন তা আমি বুঝিছি। কিন্তু অপর ডিষ্ট্রিক্টের এমন এক অফিসারকে খাড়া করে আমি এই ব্যাপারটা হ্যাণ্ডেল করতাম যে, সমস্ত প্রভিন্স তাতে চমকে উঠত। যাই হোক, আমি ছাড়ছি না—আজ দুটোর সময় সেক্রেটারীর আফিসে আমার এনগেজমেন্ট আছে,

গবর্ণরের সংগেও তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছেন।

পণ্ডিত মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে আমার উপরে এখন কি হুকুম, স্যার?

মিঃ হুইলার বললেন: সন্ধ্যার পর এইখানেই আমাদের মিটিং হবে। মিঃ মিত্রও আসবে, তুমিও উপস্থিত থাকবে।

মিশ্রজী সাহেবকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার পর সেক্রেটারী পারসিভ্যাল সাহেবের বাসার ড্রয়িং রুমে জাহ্নবী ও পণ্ডিত মিশ্র উপস্থিত হলেন। পারসিভ্যাল ও হুইলার দুজনেই তখন ড্রয়িং রুমে বসে পাইপ টানতে টানতে আলাপ করছিলেন।

আগন্তুকদ্বয়কে সাদর অভ্যর্থনা করে মিঃ হুইলার সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করে দিলেন। আদর আপ্যায়নের পর মিঃ পারসিভ্যাল বললেন: মিঃ মিশ্রা কেসটাকে বানচাল করে ফেলেছেন— ফাইলটা স্যার শংকরকে দিয়ে। গবর্ণরের কাছে আমাকেই বেকুব বনতে হলো। হিজ এক্সসেলেন্সী আমাকে ঠাট্টা করে বললেন 'তুমি কি পুলিস লাইনে সেঁধুতে চাইছ মিষ্টার পারসিভ্যাল—যে স্যার শংকরের পিছু নিয়েছ?' তারপর নিজেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি নালিশ করছিলে, মহাজাতি সংঘের মত একটা বিপজ্জনক দলের বিরুদ্ধে সিটি অফিসারের রিপোর্ট পেয়েও স্যার শংকর সেটাকে নেগলেক্ট করেছেন, আর আজই স্যার শংকর সিটি অফিসারের সেই ফাইল নিয়ে আমার সঙ্গে ঐ সম্পর্কেই পরামর্শ করতে এসেছিলেন।' তারপর গবর্ণর আমাকে বললেন—'এসব ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই, স্যার শংকর যখন ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন, এবং তাঁর উপরে সরকারের বিশেষ আস্থাও আছে।' এর পর আমাদের আর কি বলবার থাকতে পারে?

মিঃ হুইলার বললেন : স্যার শংকর আমাদের বেওকুব বানিয়ে দিয়েছে।

জাহ্নবী মিত্র বললেন : পণ্ডিত মিশ্রের কাছে ব্যাপার শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, স্যার শংকর আমাদের মতলবটা জানতে পেরে-ছিলেন ; এমন কি, হুইলার কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, সে খবরও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : এখন আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা নিজের হাতে নিয়ে বাহাদুরীটা উনি নিজেই নেবেন। তা ছাড়া ফাইলটা যখন হাতে পেয়েছেন—কেস্‌টা নিজেই সাজিয়ে আমাদের নোটস্‌গুলোকে বাতিল করে দিবেন।

পারসিভ্যাল বললেন : দেখাই যাক না, স্যার শংকর কোন রাস্তায় যেতে চান। কিন্তু এখন আর এই ব্যাপার নিয়ে দল পাকানো ঠিক নয়। আমার যতদূর মনে হলো, হিজ এক্সেলেন্সীও পছন্দ করেন না যে, আমরা এই কেস্‌ নিয়ে কোনরকম মন্তব্য করি বা স্যার শংকরের বিরুদ্ধে যাই।

জাহ্নবীই বেশী দমে গিয়েছিলেন এই ব্যাপারে : তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন : তা হলেও আমি বলে রাখছি, যদি কোন রকম সাহায্য প্রয়োজন হয়, আমি তাতে কুণ্ঠিত হবনা একথা যেন মিঃ পারসিভ্যাল নোট করে রাখেন। স্যার শংকর অসমর্থ হলেও, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ থেকে যেন সিটি পুলিসের রিপোর্টটি বাতিল করে দেওয়া না হয়—অন্তত আমাকে যেন একটা চান্স দেওয়া হয়।

মিঃ হুইলারের মুখে পারসিভ্যাল সাহেব মহাজাতি সংঘের নেতার সঙ্গে জাহ্নবীর সম্পর্কের কথা শুনেছিলেন ; তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হুইলারের মুখের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে হুইলার সাহেবের মুখখানা উৎফুল্ল

হয়ে উঠল। তিনি সহাস্যে জাহ্নবীর হাতখানা চেপে ধরে বললেন অলরাইট, মিঃ পারসিভ্যাল নিশ্চয়ই তোমাকে মনে রাখবেন।

১৯

পাটনা থেকে সপরিবার জাহ্নবী দেওঘরে কর্মস্থলে ফিরে এসেই মহাজাতিসংঘ সংক্রান্ত সরকারী তদন্ত ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িয়ে পড়েছেন; যেহেতু,—সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক যদুপতি তাঁর অগ্রজ এবং তাঁর প্রকৃতির সংগে তিনি সুপরিচিত। এলাকা বহির্ভূত হলেও—জাহ্নবী মহাজাতি-সংঘ-সংক্রান্ত পাটনার তদন্ত-কার্যে কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় স্যার শংকরলাল সরাসরি জাহ্নবীর সংগে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছেন; জাহ্নবীও তৎপরতার সঙ্গে যথোচিত উত্তর দিয়ে তাঁর মনোরঞ্জনে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এ সকল কথা তিনি পত্নী সুহাসিনীর কাছে এপর্যন্ত চেপেই গেছেন; তার কারণ, মহাজাতি সংঘ বা তার প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সুহাসিনীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা; বিশেষত, স্বামী অগ্রজের বিরুদ্ধে কিছু করেন, তিনি তার পক্ষপাতিনী নন। কিন্তু জাহ্নবীর প্রকৃতি বিধাতা এমন ধাতুতে গড়েছিলেন যে, স্বার্থ বিরুদ্ধ কোন কার্য বা স্বার্থের পরিপন্থী কোন ব্যক্তিকে সহ্য করবার মত ধৈর্যের কোন অস্তিত্বই সেখানে ছিল না। স্যার শংকরলালের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষটিকে চিনে ফেলা কঠিন হয় নাই—স্বল্প পরিচয়সূত্রেই তিনি তার প্রকৃতিটিকেও আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন। মহাজাতি সংঘ সংক্রান্ত গোপনীয় ফাইলে জাহ্নবীর তথ্যগুলি খুব যে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি যদুপতি ও তাঁর শিষ্যগণের পক্ষে বিপজ্জনক, স্যার

শংকরলালকেও মনে মনে তা স্বীকার করতে হয়েছিল। সেদিন কোতোয়ালীর খাস কামরায় বসে জাহ্নবী একটা ফাইল দেখছেন, এমন সময় পাটনা থেকে স্যার শংকরলালের এক জরুরী পত্র এল তাঁর নামে। পাটনা পুলিস অফিসের এক কর্মচারী কোন কার্যোপলক্ষে দেওঘরে আসেন; স্যার শংকর তাঁর মারফতেই চিঠিখানি পাঠিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে জাহ্নবীর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। স্যার শংকরলাল তাঁকে জানিয়েছেন যে, মহাজাতি সংঘের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ সব শেষ হয়ে গেছে, এই সপ্তাহেই যে কোন দিন সংঘের উপর হামলা করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন; সুতরাং এই চিঠি পাবামাত্রই জাহ্নবী যেন পাটনায় রওয়ানা হন—তাঁর উপস্থিতি ও সহায়তা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন।

চিঠি পড়ে জাহ্নবী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। মনে মনে ভাবতে থাকেন, লোকটা সত্যিই জাঁহাবাজ; এত শীঘ্র যে সংঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা ভাবতেই পারা যায় নি। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদেও অন্তরটা তাঁর দুলে উঠল।

খানিক পরে স্নানাহারের জন্য বাংলোয় পৌঁছাতেই একখানা জরুরী তার পেলেন জাহ্নবী। তার পাঠিয়েছে পাটনা থেকে দুর্গা। তারের সংক্ষিপ্ত বার্তা জাহ্নবীকে উৎকণ্ঠিত করে তুলল। দুর্গা লিখেছে:

বাবা মৃত্যুশয্যায়—তার পেয়েই চলে আসুন।—দুর্গা

কি মুস্কিল! আফিসে ওপরয়ালার পত্রে এই দাদার সংঘ সার্চ করবার জন্যে তাঁকে পাটনায় আহ্বান করা হয়েছে; এদিকে পাটনা থেকে দুর্গা জানাচ্ছে—তিনি মৃত্যুশয্যায়! এখন জাহ্নবী কি করেন?

শেষের খবরটি সুহাসিনীকে জানিয়ে জাহ্নবী তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে টানা মোটরেই পাটনা রওয়ানা হলেন। এখন তাঁর মনে প্রশ্ন

জাগলো, আগে কোথায় যাবেন—স্যার শংকরলালের বাংলোয়, কিম্বা যদুপতির মহাজাতি সংঘে? অনেক চিন্তার পর স্যার শংকরলালের সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ করাই জাহ্নবী বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

স্যার শংকরলাল কোতোয়ালীতে যাবার জন্যে মোটরে উঠবেন, এমন সময় জাহ্নবীর মোটর পুলিস আফিসের দেউড়ীর মধ্যে ঢুকল। শংকরলালকে দেখেই জাহ্নবী মোটর থেকে নেমে দ্রুতপদে তাঁর সামনে এসে অভিবাদন করলেন।

স্যার শংকর উৎফুল্ল মুখে বললেন: আমি জানতাম তুমি আসবে, আফিসে তোমার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েই বেরুচ্ছিলাম।

জাহ্নবী সকালে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম খানা খাম থেকে খুলে স্যার শংকরের সামনে ধরলেন। এক নিশ্বাসে সেটা পড়েই তিনি বললেন: আমিও শুনেছি তাঁর অসুখের কথা। তুমি নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে কিছু ভেবেছ—অর্থাৎ এখন কি করা উচিত, এই আর কি?

জাহ্নবী বললেন: অসুখটা সাজানো নয় ত? মনে করুন, ওঁর সংঘের উপর পুলিসের নজর পড়েছে—এটা কোন রকমে জেনে উপস্থিত তাল সামলে নেবার জন্যে এই অসুখের সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন না, দাদার অসুখের কথা কখনো শুনিনি, আর হলেও আমাকে কোন দিন ডাকেন নি।

স্যার শংকর একটু হেসে বললেন: যখন ডাকেন নি কোন দিন, অসুখ বিসুখ হয়ে থাকলেও জানবে কি করে? তবে, তোমার কথাটাও আমার মনে ধরেছে—ভাণ করাও আজকাল পলিটিসিয়ানদের একটা চাল হয়ে দাঁড়িয়েছে; মারাঠী পলিটিসিয়ান শিবাজীই এটা শিখিয়ে গেছেন।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি স্থির করেছেন?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহ্নবীর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে স্যার শংকর বললেন: এসেছ যখন, অবিশ্যি তা জানতে পারবে। তুমি নিশ্চয়ই সরাসরি দেওঘর থেকে মোটরে আসছ, আর পাটনায় এসেই—

জাহ্নবী বললেন: আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথমেই আপনার কাছে এসেছি। দাদাকে এখনো দেখতে যাইনি, আর আপনার পরামর্শ না নিয়ে যাওয়া উচিত মনে করিনি।

মুখখানা গম্ভীর করে স্যার শংকর বললেন: অলরাইট! উপস্থিত তোমার ভাইঝির আমন্ত্রণটাই রক্ষা করা উচিত। সামাজিক ভদ্রতা বোধটা অন্তত বাহ্যিক ভাবেও আমাদের দেখানো দরকার হে! তুমি যেন দুর্গার তার পেয়েই ব্যাকুল হয়ে টানা মোটরে ছুটে এসেছ, এইটিই জানাবে; আর—

স্যার শংকর হঠাৎ থেমে তাঁর সেই মর্মভেদী দৃষ্টি জাহ্নবীর মুখে নিবদ্ধ করলেন।

জাহ্নবীও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মৃদুস্বরে বললেন: আর কি করতে বলেন?

অতি ক্ষীণভাবে হাসির একটু রেখা চোখে ও মুখে ফুটিয়ে স্যার শংকর বললেন: ডুবুরি কেমন করে গভীর সমুদ্রের তলদেশে নেমে ধন রত্নের সন্ধান করে, ছবিতে তা নিশ্চয়ই দেখেছ, সেইভাবে ওদের ভিতরকার খবর নেওয়া। আসল কথা হচ্ছে, তোমারি আর পণ্ডিত মিশ্রের কতকগুলো তথ্য ছাড়াও ওখানকার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু ব্যাপার জানতে পারলে কাজেরও বেশী সুবিধা হয়। আর, তুমি ত এসব দিক দিয়ে খুব চোখস, বেশী বলা অনাবশ্যক মনে করি। আচ্ছা—

স্যার শংকর তাঁর মোটরের দিকে এগিয়ে গেলেন; জাহ্নবীও তাঁর অনুগমন করে বললেন: তাহলে কখন দেখা করব আপনার সঙ্গে?

মোটরে বসেই স্যার শংকর উত্তর করলেন: মৃত্যুশয্যাশায়ী দাদাকে দেখতে চলেছ যখন, তোমার দেখা করবার ফুরসদ না হতেও ত পারে—দেখা আমিই করব।

স্যার শংকরের মোটর হর্ণ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। সেদিকে দৃষ্টি রেখে সোজা হয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন জাহ্নবী, তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের মোটরে উঠলেন। নির্দেশ পেয়ে সোফার মহাজাতি সংঘের দিকে মোটরের মুখ ফেরাল।

২০

মহাজাতি সংঘের দেউড়ির ভিতর মোটর ঢুকতেই জাহ্নবী মুখ বাড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, দাদার যে শিষ্যদল সেদিন এই বাড়ীখানাকে লংগরখানা করে তুলেছিল, আজ তারাই তাকে যেন হাঁসপাতালে পরিণত করেছে। কেউ আনছে বরফ, কেউ করছে তার তদ্বির, কেউ আইসব্যাগে ভাঙ্গা বরফ ভরে ভিতরে যোগান দিচ্ছে—বাইরের সেই লম্বা টানা বারন্দাটির সর্বত্র ঔষধ ও পথ্যের বিবিধ নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

জাহ্নবীকে দেখেই ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে নত মস্তকে অভিবাদন করল। জাহ্নবী একটিবার শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেগুলিকে লক্ষ্য করলেন—পরক্ষণে নীরবেই তিনি যদুপতির ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন।

জাহ্নবীর মানসপটে এই সময় একটা ঘটনা ছবির মত ফুটে উঠল।

একদা তিনি জৈনদের এক উদ্যানে কোন একটা তদন্ত ব্যাপারে গিয়েছেন। সেখানে একটা বিশাল দিঘীর মধ্যে বড় বড় মাছগুলোর নির্ভীক সঞ্চরণ তাঁকে চমৎকৃত করে। হাত বাড়ালেই অতি সহজে তাদের হাতের মধ্যে আনা যায়, অথচ তাদের গায়ে হাত দেবার কোন উপায় শক্তিমান পুলিস সুপারের পক্ষেও সেখানে সম্ভব ছিল না। সংঘের প্রাংগনে সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক এতগুলি বলিষ্ঠকায় তরুণের এই সমাবেশ অতীতের সেই স্মৃতিই তাঁকে বিচলিত করল মাত্র। হায়, ক্ষণকালের জন্যও যদি তিনি স্যার শংকরের ক্ষমতাটুকু হাতে পেতেন!

প্রশস্ত একখানি ঘরে পালঙ্কের উপর পরিচ্ছন্ন শয্যায় যদুপতি অবসন্নের মত শুয়ে আছেন, চক্ষু দুইটি নিমীলিত। দুর্গা শিয়রে বসে মাথায় আইস ব্যাগ দিচ্ছে; পায়ের দিকে বসে পাঞ্জাবী প্যাটার্ণের একটি ছেলে তার বলিষ্ঠ দুটী হাতে রোগীর পদসেবা করছে। এই লম্বা চওড়া গুণ্ডাকৃতি ছেলেটিকে দেখেই জাহ্নবীর চোখ দুটি ক্রোধে ও বিরাগে ধক ধক করে সহসা জ্বলে উঠল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনের এই বিক্ষোভটুকু সামলে নিয়ে মুখে একটা উদ্বেগ ও চিন্তার চিহ্ন ফুটিয়ে জাহ্নবী দুর্গার দিকে চাইলেন।

তবে তাঁর প্রশ্নের পূর্বেই দুর্গা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্বর সংযত করে বলে উঠল: এসেছেন কাকাবাবু, বাঁচলুম। আমি খালি খালি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

ব্যগ্রকণ্ঠে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: কি কাণ্ড—অসুখটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিলেন রোগী নিজে। চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুলে, অনুজের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে আস্তে আস্তে বললেন: হার্ট আর ব্রেনের ট্রাবল, বাইরে থেকে ধরবার যোটি নেইরে ভাই—আর, ডাক্তারদের সাধ্যও নেই যে সারায়।

জাহ্নবী : কে দেখছেন ?

রোগী : সবাই। আমাদের হরি ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে সিভিল সার্জন পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ে নি। কিন্তু মজা এই, রোগটা যে আসলে কি—সেইটিই কেউ দেখতে পান নি। যাক্, তোমাকে পেয়ে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম! কথা কিছু আছে। তুমি আগে কাপড় চোপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে নাও। দুর্গা, কাকাবাবুকে নিয়ে যাও মা!

জাহ্নবী : আমি ওখান থেকে খেয়ে দেয়েই টানা মোটরে এসেছি। আমার জন্ম ব্যস্ত হবার দরকার নেই। দুর্গা, তুমি বরং খেয়ে দেয়ে নাও মা—আমি ততক্ষণ আইস-ব্যাগ দিচ্ছি—

রোগী : না—আইস-ব্যাগের দরকার এখন হবে না। তুমি বস ভাই।

দুর্গা বিছানা থেকে নেমে, আইস-ব্যাগ থেকে জল ও কুঁচা বরফগুলি ঢেলে ফেলে যথাস্থানে আগে গুছিয়ে রাখল; তারপর হেঁট হয়ে জাহ্নবীকে প্রণাম করে ছেলেটির দিকে চেয়ে দিব্য সহজ ভাবেই বলল : প্রতাপবাবু, আপনিও স্নান-টান সেরে নিন—বেলাও অনেক হয়েছে, একটা বেজে গেছে।

যদুপতিও বললেন : যাও বাবা প্রতাপ, দেরী ক'র না।

প্রায় এক সঙ্গেই দুর্গা ও প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জাহ্নবী আড় চোখে ছেলেটির মুখখানা আর একবার দেখে নিলেন। হ্যাঁ, সেই অশিষ্ট ছেলেটাই বটে! পদে পদে সেবার যে তাঁর মত পদস্থ পুলিস অফিসারকে অপ্রস্তুত করেছিল!

জাহ্নবী শয্যাপ্রান্তে বসতেই যদুপতি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন : স্বাস্থ্য রক্ষার এত বড় পাণ্ডাটাকেও ভগবান জটিল ব্যাধির নাগপাশে

এমন করে বেঁধে ফেলেছেন যে, নিষ্কৃতির আর কোন রাস্তাই তার নেই। তাই তোমাকে আর না ডেকে পারিনি। ভায়ে ভায়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যত তফাতেই থাকি না কেন, আপদ বিপদ এলে তখন ভায়ের কথাই মনে পড়ে আগে। তাই, এখন কেবলই মনে হচ্ছে—আমার অবর্তমানে দুর্গার আপনার বলতে, মাথার উপরে অভিভাবক হয়ে দাঁড়াতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। জীবনে সঞ্চয় কিছু করতে পারেনি ভাই; তবে সান্ত্বনা এইটুকু, দুর্গাকে মনের মত করে তৈরী করতে পেরেছি—চলার পথে এগিয়ে যাবার মত সত্যকার শিক্ষা-সামর্থ ও পেয়েছে। বাকী আছে শুধু, একটি সৎপাত্রের হাতে ওকে তুলে দেওয়া—তা সে পাত্রও ঠিক আছে, টাকার দিকে তার লক্ষ্যই নেই, অথচ ছেলেটি খুব ভালো এবং দুর্গার উপযুক্ত—সে শুধু দুর্গাকেই চায়। কাজেই ওদিক দিয়েও তোমার ভাববার কিছু নেই!

সন্দিগ্ধকণ্ঠে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেটি কে?

এতগুলি কথা এক সঙ্গে বলে যদুপতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন: তুমি তাকে আগেও দেখেছ, আর আজ এখানে এসেও দেখেছ—যে ছেলেটি এইমাত্র উঠে গেল; নাম প্রতাপ—প্রতাপ দত্ত। উচ্চ শিক্ষিত—সায়েন্স এবং ফিজিওলজিতে ডবল এম, এ। সাঁওতাল পরগণায় কিছু সম্পত্তি আছে—সব দিক দিয়েই ছেলেটি অসাধারণ। দুর্গার যোগ্য পাত্র ভেবেই—

জাহ্নবী এখানে জ্যেষ্ঠের কথায় বাধা দিয়ে বললেন: কিন্তু ওর পদবী শুনলুম ত দত্ত; আমাদের বংশে বরাবর চলে আসছে—বড় মেয়েকে কুলীনের ঘরে—

মৃদু হেসে যদুপতি বললেন: কৌলীন্যের কথা বলছ? সেদিক দিয়েও তুমি ধরে নিতে পার—প্রতাপ বল্লালী যুগের কল্পিত কুলীন

নয়, এ যুগের বাস্তব কুলীন, মস্ত কুলীন; আর এ কৌলীন্য উপার্জন করেছে নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বিনয়, সাহস, শৌর্য এবং মহত্ব দিয়ে। কি বলব, সে সুযোগ আর নেই—নতুবা আমি তোমাকে ওজন করে দেখিয়ে দিতাম প্রতাপের স্বকৃত কৌলীন্যের ভারটা কত বেশী।

মুখখানা গম্ভীর করে জাহ্নবী বললেন: আর কি বলতে চাও শুনি?

একটু থেমে যদুপতি বলতে লাগলেন: বলা আমার সবই হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তেই আমার কথা বন্ধ হতে পারে—তাই এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা তোমাকে বলে ফেলেছি। দুর্গা কাছে থাকলে মুখ চেপে ধরতো। আমার শেষ কথা—দেনা-পত্র কিছু নেই, কলেজে হাজার পাঁচেক টাকা জমা আছে, বাড়ীতে আছে তোমার বৌদির হাজার দুই টাকার গহনা, দুর্গা নিজে হার আর কংকন ছাড়া আর কোন গহনা পরতে চায় না সহজে—যেগুলো দেহের ভার বৃদ্ধি করে। তা ছাড়া ওর জামা, কাপড় যথেষ্ট আছে—মেয়েটা খুব সঞ্চয়ী, সেভিংস ব্যাঙ্কেও অল্প-সল্প করে কিছু টাকা জমিয়েছে, আর কাগজ-পত্রে লিখে মাসে মাসে যা উপার্জন করে ওর নিজের খরচ পত্র সবই তাতে নির্বাহ হবে। কাজেই দুর্গা তোমার সংসারের বোঝা হবে না। হঠাৎ আমার মন্দ কিছু হলে ওকে তোমার কাছেই নিয়ে যাবে—আর বছর খানেকের মধ্যেই প্রতাপের হাতে ওকে সম্প্রদান করে আমার এই বড় সাধটি পূর্ণ করবে। মনে রেখো, আজ থেকেই তুমি দুর্গার অভিভাবক হলে।

অগ্রজের কথাগুলিই জাহ্নবী শুনলেন; কিন্তু সে সব কথার সমর্থনে নিজের মুখ থেকে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না—পাছে যদুপতি তাঁর কাছে কোন প্রতিশ্রুতি চেয়ে বসেন। সেটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই অন্য প্রসংগ তুলে সহসা জিজ্ঞাসা করলেন: এখন একটা কথা

শুধু জানতে চাই দাদা, সংঘ থেকে এমন কোন কাজ কি করা হয়েছে—যেটা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে ?

এমন প্রশ্নেও যদুপতির মুখে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। তেমনি একটু হেসে তিনি বললেন : বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে না এমন কোন কাজ কেউ কি কোন দিন করেছে বলতে পারো—যার শিক্ষিত মন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ? আমাদের এই সরকার চান—প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনে চলি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না তুলি, কোন রকম চাঞ্চল্যকর শ্লোগান আউড়ে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করতে সচেষ্ট না হই। কিন্তু আমরা এই সরকারের দেওয়া শিক্ষার সঙ্গেই এগুলো শিখেছি, আর জেনেছি এসব অন্যায় নয়। আমার সংঘের লক্ষ্য হচ্ছে—অন্যায়কে যেন তেন প্রকারে দমন করা, আর—তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তি সঞ্চয় করা। সংঘ থেকে আমি সেই শিক্ষাই দিয়েছি।

তথাপি জাহ্নবী সংঘের ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে জানবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন : সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন কাজ কি সম্প্রতি করা হয়েছে সংঘ থেকে ?

তেমনি হেসে যদুপতি বললেন : আমার সংঘের উদ্দেশ্য তুমি ত শুনেছ, তা থেকেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। আমার সংঘের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে—সংহতি। এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হওয়াকে তোমরা যদি সরকারবিরোধী মনোবৃত্তি বলতে চাও, তাহলে ধরে নিতে হবে বৈকি, সংঘ বিদেশী সরকারের অনভিপ্রেত পথই ধরেছে। তবে সংঘের ধারণা—সে ঠিক পথেই চলেছে।

জাহ্নবী : কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ত সংঘের চলা শেষ হবে ?

যদুপতি : পাগল ! আমার সংঘের জপমন্ত্র হচ্ছে—চরৈবেতি,

চরৈবতি—চলো। যাদের তুমি চোখে দেখেছ। প্রত্যেকেই সংঘ, দুর্গাও তাদের একজন—প্রত্যেকেই চলমান, এরা চলতে জানে—চলতে চলতে থামে না।

অগ্রজের কথাগুলো হেঁয়ালীর মত জাহ্নবীর কানে একটা বিশ্রী ঝংকার তুলল যেন। কিন্তু পরক্ষণেই বক্তার মুখের দিকে চেয়েই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। লক্ষ্য করলেন, যদুপতির প্রশান্ত মুখের উপর নিমেষে একটা কালো ছায়া পড়েছে—বুকের ভিতর থেকে একটা দারুণ বেদনা উঠে তাঁর বাকশক্তিকেও তখন রুদ্ধ করেছে, আর শ্বাসযন্ত্রের গতিকে সচল করতে সমস্ত মুখখানা যেন বিকৃত হয়ে উঠেছে।

নিজের অজ্ঞাতেই জাহ্নবীর কণ্ঠ থেকে একটা স্বর নির্গত হলো: ওরে দুর্গা শীগ্‌গীর আয়, দাদা বুঝি পালাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে দুর্গা এ-ঘরেই আসছিল। কাকার চীৎকার শুনে এক রকম ছুটতে ছুটতেই ঘরে এসে ঢুকল। তারপর যদুপতির কাতর মুখখানার দিকে একটি বার স্থির দৃষ্টিতে চেয়েই সে ক্ষিপ্রহস্তে পাশের টিপয়ে রাখা শিশি থেকে খানিকটা ঔষধ ঢেলে রোগীকে খাইয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছাতে মুছাতে বিস্মিত জাহ্নবীর দিকে চেয়ে বলল: আপনাকে বলে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম কাকাবাবু, এক এক সময় বুকের ভিতর থেকে একটা যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে—তাতেই এ-রকম হয়ে পড়েন; ওষুধটি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সামলে ওঠেন।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: পেনটা সম্বন্ধে ডাক্তার কি বলেন?

দুর্গা উত্তর করল: বলেন—পাকস্থলী থেকেই ওঠে।

ঔষধের ক্রিয়া ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে দেখা গেল। যদুপতির মুখখানা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দুর্গা তাঁর বুকটা আস্তে আস্তে

ডলে দিতে দিতে বলল : বাবার দেহের এই অবস্থা—এর উপর বাইরে থেকে একটা বিপত্তি আসছে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন : বিপত্তি আবার কি এল?

অপলক দৃষ্টি জাহ্নবীর মুখে নিবদ্ধ করে দুর্গা বলল : পুলিস আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে—

সোজা হয়ে বসে এবং মুখে চোখে বিস্ময়ের একটা রেখা ফুটিয়ে জাহ্নবী বললেন : সে কি, পুলিস বাড়ী ঘিরেছে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্গা জাহ্নবীর দিকেই চেয়ে ছিল; প্রশ্নটা শুনে মৃদু হেসে বলল : ভাগ্যিস্ আপনি এসে পড়েছেন কাকাবাবু! আপনাকে এখানে দেখলেই পুলিসের মুখ চুণ হয়ে যাবে।

কিন্তু কথাটা বলেই অপাঙ্গে কাকাবাবুর মুখখানা দেখে দুর্গাও চমকে উঠল—তার কথায় জাহ্নবীর মুখখানাই সহসা চুণ হয়ে গেছে যেন!

যদুপতি এতক্ষণ দুই চক্ষু মুদিত করেই ছিলেন; এই সময় তাঁর চোখের উপরকার দুটি চামড়া আস্তে আস্তে খুলে গেল—ম্লান দৃষ্টিটা পড়ল প্রথমে দুর্গার মুখে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন : কি হয়েছে মা? পুলিসের কথা শুনলাম যে!

দুর্গা সহজ কণ্ঠেই বলল : হ্যাঁ বাবা, পুলিস এসে আমাদের বাড়ীখানা ঘিরে ফেলেছে; তাই কাকাবাবুকে বলছিলাম—ভাগ্যিস্ আপনি এসে পড়েছেন!

যদুপতিবাবুর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ক্ষীণরেখা ফুটে উঠল; বললেন : তোমার কাকাবাবুও যে পুলিসের লোক মা! এই ত একটু আগে কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—আমার সংঘ এমন কোন কাজ কি করেছে, যেটা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে? এ'থেকেই

মনে হচ্ছে, হয় ত উনিও কাণাঘুষায় কিছু শুনে থাকবেন, নইলে ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন ?

জাহ্নবী বললেন : এ কথা এখানকার সকলেই জানে ; সে-বারেই আমিও জেনে গেছি। সেই জন্যেই কথাটা তুলেছিলাম।

যদুপতি বললেন : পুলিস্ যে এই সংঘের সঙ্গে আমাকেও নজরবন্দী করতে চায়—এ খবর আমারো অজানা নয়।

জাহ্নবী বললেন : দুর্গা যে বললে—পুলিস বাড়ী ঘিরেছে ; কিন্তু—

ম্লানভাবে একটু হেসে যদুপতি বললেন : কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছ না—এই ত বলতে চাও ? কিন্তু পুলিসের বড় অফিসার হয়ে এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে ? পুলিস নিঃশব্দে এসেই, বাড়ীর চার পাশ পরিবেষ্টন করে—বাড়ী থেকে কেউ যাতে কোন ফাঁক পেয়ে সরে না পড়ে। তারপর—কাজ যখন শুরু করে, তার শব্দে সারা পাড়াটাই তোলপাড় হয়ে ওঠে। নয় কি ?

কিন্তু জাহ্নবী এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবার অবকাশ পেলেন না, যদুপতির প্রশ্নের পরেই দুর্গা বলে উঠল : তবে পুলিসের খুবই দুর্ভাগ্য কাকাবাবু, আসাই সার হবে—সংঘে কারুর টিকিটিও দেখতে পাবে না, থাকবার মধ্যে এই ঘরে আছি আমরা ক'টি প্রাণী !

সবিস্ময়ে জাহ্নবী বললেন : সে কি ! আসবার সময় দেখলাম ত সংঘের ছেলেরা বাইরেটা যেন হাসপাতাল করে তুলেছে ! অন্ততঃ দশ বারোটা ছোকরা ঘোরা ফেরা করছিল—

একটু গম্ভীর হয়ে দুর্গা বলল : হ্যাঁ, পুলিস তাদের খুঁজছে—বাইরের ঘর, বাগান সব পাতি পাতি করে। হয়ত ওরা আগেই খবর পেয়েছিল, তাই পুলিস আসবার আগেই সরে পড়েছে। ওরা যে শিক্ষা পেয়েছে কাকাবাবু, অকারণ ধরা দেবে না ; আর, অন্যায় করে মিছি মিছি

যদি পুলিস ধরতে আসে—তখন পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়াটাই হচ্ছে মস্ত বাহাদুরী!

জাহ্নবীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও প্রখর হয়ে যেন দুর্গাকে বিদ্ধ করল। শ্রদ্ধাভাজন পিতৃব্যের চোখ মুখের সেই ভংগি দুর্গাও আড় চোখে দেখতে লাগল। জাহ্নবীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, তাঁর মনের মধ্যেও তখন এই কথাগুলি তোলপাড় করতে লাগল যে, পুলিস বাড়ী ঘিরেছে, পিতা মৃত্যুশয্যাশায়ী, অথচ অষ্টাদশী এক তরুণীর মুখে এই সব কথা—ভয়ের একটু চিহ্ন কোথাও নেই!

বাইরে থেকে এই সময় গম্ভীর স্বরে একটা শব্দ এলো: এরা সব গেল কোথায়? একটা টিকটিকিরও দেখা নেই যে!

জাহ্নবীর কানে স্বরটি যেন বিউগ্যল্যের সুরের মত বাজলো; তিনি বুঝতে পারলেন—স্যার শংকরলাল স্বয়ং এসেছেন। বুকের ভিতরটা তাঁর দুর্ দুর্ করে উঠল। কিন্তু দুর্গা ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে টাঙানো পরদাটির পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল: পুলিসের টিকটিকি দেখেই সংঘের টিকটিকিরা সব হয়ত সরে পড়েছে, তাই দেখতে পাচ্ছেন না—এই ঘরে আসুন দয়া করে।

মৃদু স্বরে যদুপতি প্রশ্ন করলেন: কে?

দুর্গা উত্তর করল: পুলিসের কোন ধাড়ী টিকটিকি হবেন নিশ্চয়ই; আসছেন এখানে।

পরক্ষণেই পরদা ঠেলে প্রবেশ করলেন স্যার শংকরলাল। পুলিসের ইউনিফরমের উপর তাঁর পরিচয়টি দুটি পিতলের অক্ষরে জল জল করছে; কোমরে চামড়ার খাপের মধ্যে অগ্নিগর্ভ রিভলবার তার অস্তিত্ব জানাচ্ছে; হাতে একটা ফ্ল্যাট ফাইল।

স্যার শংকরকে দেখেই জাহ্নবী দাঁড়িয়ে উঠে মিলিটারী কায়দায় 'স্যালুট' করলেন। কিন্তু স্যার শংকর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমেই এক নজরে ঘরের তিনটি প্রাণী ও প্রত্যেকটি জিনিষ দেখে নিয়ে সে দৃষ্টি দুর্গার মুখে নিবদ্ধ করে বললেন: তুমি নিশ্চয়ই অধ্যাপক মিত্রের কন্যা—মিস্ দুর্গা মিত্র?

দুর্গা: শ্রীমতী মিত্র বলবেন দয়া করে। বাঙালী ঘরের কুমারী কন্যাকে মিস্ বলে সম্বোধন করা—বিশেষ ক'রে কোন ভারতীয়ের মুখে—আমি অপমান বলে মনে করি।

স্যার শংকর: বা! ইনফরমারদের রিপোর্টের সঙ্গে মেয়ের প্রকৃতি ঠিক মিলে যাচ্ছে ত! আচ্ছা, সংঘের ছেলেরা সব কোথায় লুকালো বলত?

দুর্গা: আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? লুকোচুরি খেলতে এসেছেন—খুঁজে দেখুন।

স্যার শংকর: একথার মানে?

দুর্গা: মানে খুব সোজা। ছেলেবেলায় বুঝি ও খেলা করেন নি কোনদিন? কেউ লুকোলে, তাকে খুঁজে বার করতে হয় নিজের দুটো চোখ আর বুদ্ধি দিয়ে—অপরকে জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তাতে খেলা ভেঙ্গে যায়।

স্যার শংকর: তুমি ত দেখছি সাধারণ মেয়ে নও!

দুর্গা: আপনার সরকার কি কখনো সাধারণ ব্যাপারে আপনাদের পাঠান স্যার? যেখানেই কাজের ধারা হয় অসাধারণ, সেইখানেই সরকারের নজর পড়ে, আর পুলিসের আগমন হয়ে থাকে। কাজেই আমাকেও যদি ঐ সূত্রে অসাধারণ মনে করেন, বিস্মিত হব না।

কথাগুলি বলেই দুর্গা একখানা কেদারা স্যার শংকরের দিকে এগিয়ে

দিয়ে বলল : আপনি বসুন ; যদিও রুগীর ঘর, এখানে বসাবার কথা নয়, তবুও অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করতে আমরা বাধ্য।

স্যার শংকর : বিশেষত, সে অভ্যাগত যখন পুলিশের একজন হোমরাচোমরা অফিসার!

দুর্গা : মাপ করবেন, জানেন ত আমাদের সংঘের নাম 'মহাজাতি' আমরা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এই তিনের উপাসনা করি। আপনি পুলিসের অফিসার বলে আপনাকে এভাবে বসবার জন্যে অভ্যর্থনা করছিনে, মানুষ ভেবেই করছি।

'বেশ আমিও নিজেকে মানুষ ভেবেই তোমার অভ্যর্থনা গ্রহণ করছি।' বলেই স্যার শংকর চেয়ারে বসলেন, তারপর জাহ্নবী ও দুর্গাকে বসবার জন্যে ইংগিত করলেন।

স্যার শংকরের মত পদস্থ অফিসারের সঙ্গে দুর্গার এরূপ অবিনীত সংলাপ জাহ্নবীকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল, যদিও স্যার শংকরের মুখে কাঠিন্যের কোন ছাপ পড়েনি, এবং ব্যাপারটি তিনি উপেক্ষা করেই প্রীতির ভাব দেখিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। তথাপি জাহ্নবী তাতে আশ্বস্ত হতে পারলেন না ; চেয়ারে পুনরুপবেশন করেই তিনি বললেন : এভাবে কার সংগে কথা কইছ—তা বোধ হয় জান না তুমি দুর্গা?

হাসিমুখে দুর্গা বলল : জানি না মানে? আমি ত এসেই আপনাকে বললাম যে, পুলিস এসে বাড়ী ঘিরেছে। ইনিও পুলিস ছাড়া আর কিছু নন নিশ্চয়ই!

জাহ্নবী আরও গম্ভীর হয়ে বললেন : ইনি বিহার প্রভিন্সের চীফ পুলিস অফিসার স্যার শংকরলাল!

এই বিখ্যাত নাম শুনেও দুর্গার মুখে কোন পরিবর্তন এলো না ;

তেমনি হাসিমুখে সে বলল : ওর ইউনিফর্মেই ত পদবীর পরিচয় রয়েছে কাকাবাবু !

আশ্চর্য্য, এত বড় একটা লোকের পরিচয় আগে থেকে জেনেও বাঙালী পরিবারের এই মেয়েটি একটুও বিহ্বল হয়নি—এখনো পর্যন্ত তার অশোভন উক্তির জন্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা শংকিত নয় ! জাহ্নবীর মুখখানা পুনরায় কঠিন হয়ে উঠল।

এই সময় শয্যাশায়ী যদুপতির দিকে চেয়ে স্যার শংকরলাল বললেন : অধ্যাপক মিত্র কি অসুস্থ ?

শ্লেষের সুরে দুর্গা বলল : এতক্ষণে কি অধ্যাপক মিত্রের উপর নজর পড়ল আপনার ?

জাহ্নবীর চক্ষু দুটি পুনরায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; মেয়েটা কি আজ একটা বিপরীত কাণ্ড বাধিয়ে বসবে—এত বড় ফাজিল হয়ে উঠেছে ! দাদাও কিছু বলছেন না ত !

স্যার শংকর বললেন : পুলিসের নজরকে খাটো কোর না মা লক্ষ্মী ! জানি, উনি অসুস্থ হয়েছেন, সাকরেদদের মত পুলিসের চোখে ধূলো দিতে পারবেন না—তা ছাড়া অসুস্থ ব্যক্তিকে এসেই বিরক্ত করাটা সংগত মনে করিনি। আর, তুমিও নিশ্চয় মানবে যে, রোগীকে অভিবাদন বা সম্ভাষণ করতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে ?

তেমনি শ্লেষের সুরে দুর্গা বলল : কিন্তু রোগীর বাড়ী চড়াও হয়ে তাঁকে ব্যস্ত করবার নির্দেশও বোধ হয় আপনার শাস্ত্রেই আছে ?

স্যার শংকর : নিশ্চয়ই ; অধ্যাপক মিত্রের মত অদ্ভুত রোগীরা রোগশয্যায় পড়ে থেকেও যে-সব কাণ্ড করেন, সুস্থ ব্যক্তিরাও তা ভাবতে পারে না। সে জন্যেও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ওঁর নিরাপত্তার অনুরোধে আমাদেরই সতর্ক না হয়ে উপায় নেই।

দুর্গা : আপনার কথাগুলো শুনে খুব একটা সন্দেহই মনে জাগছে—স্পষ্ট করে বলবেন, আপনারা তাহলে কি উদ্দেশ্য—আপনি কি করতে চান আমার অসুস্থ বাবার সম্বন্ধে ?

স্যার শংকর : করবার আমাদের অনেক কিছুই আছে, কিন্তু প্রফেসার মিত্রের বর্তমান দৈহিক অবস্থায়, বিশেষতঃ তাঁর চোখের উপর তা করতে চাইনে। অনেকগুলি ছেলে যে এই সংঘে থেকে আত্মিক ও দৈহিক উন্নতির সাধনা করে—সে খবরও আমরা পেয়েছি ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হঠাৎ হানা দিয়েও আমরা তাদের ছায়াও দেখতে পাইনি ! তাদের কথা জিজ্ঞাসা করাও বৃথা, যেহেতু একটু আগেই তুমি বলেছ—কেউ লুকালে খুঁজে বার করতে হয় নিজের চোখ আর বুদ্ধি দিয়ে ! এরপর সেই চেষ্টাই করা যাবে। অগত্যা, এখন সংঘের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা আমাদের হাতেই রাখতে চাই—অধ্যাপক মিত্র সুস্থ হলে ধীরে সুস্থে তখন তদন্ত ও তল্লাশ করা যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যক বেশ সুস্পষ্ট হলো না কি ?

দুর্গা : না। আপনাদের কথা সুস্পষ্ট ত নয়ই—বরং রহস্যাবৃত বলে মনে হচ্ছে। আপনি সংঘের দরজায় তালা বন্ধ করে চাবিটা পকেটে করে নিয়ে যেতে চাইছেন—কিন্তু আমাদের কোথায় রেখে যাচ্ছেন ? আমরাও কি তালাবদ্ধ অবস্থায় সংঘের মধ্যে থাকব ?

স্যার শংকর : ক্ষেপেছ নাকি ! তোমার মত মেয়েকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখবার দুঃসাহস আমার মোটেই নেই। বিশেষতঃ, বন্ধ ঘরে রোগীর স্বাস্থ্য কথনো সুস্থ থাকতে পারে না। সেই জন্যে অধ্যাপক মিত্রের ভার উপস্থিত সরকারই নিচ্ছেন ; আর, তোমার ভার নেবার জন্যে ঘটনাচক্রে কাকতালিয়বৎ এসে পড়েছেন তোমার কাকা সাহেব। এখন কথাটা সুস্পষ্ট হচ্ছে ?

দুর্গা : বুঝতে পেরেছি আপনার উদ্দেশ্য ; আপনি বাবাকে রাজবন্দী-রূপে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখতে চান। তারপর মর্জি-মাফিক তাঁর সংঘ সার্চ করবেন—

স্যার শংকর : তোমার প্রথম অনুমানটা ঠিক। প্রফেসর মিত্রকে এখান থেকে সরানোই সরকারের ইচ্ছা। তবে এই সংঘ যে আমাদের মর্জি-মাফিক সার্চ হবে না, সার্চের সময় রীতিমত সাক্ষী থাকবে—এ সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ হতে পার।

দুর্গা : বাবার এই অবস্থায় এখান থেকে ওঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া আপনি সংগত মনে করেন ?

স্যার শংকর : আমি যে নিরুপায় মা-লক্ষ্মী—সরকারের এই ইচ্ছা।

দুর্গা : কিন্তু বাবার অবস্থার কথা ত আপনি সরকারকে জানাতে পারতেন ?

স্যার : অধ্যাপক মিত্রের সম্বন্ধে যখন সরকারের আদেশ আসে, আমি ওঁর অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার থেকে উত্তর এসেছে—এদেশের পলিটিক্যাল লীডারদের অসুখকে বিশ্বাস করবেন না !

দুর্গা : বুঝিছি, দেশবরেণ্য নেতা শ্রদ্ধেয় সুভাষ বাবুকে লক্ষ্য করেই সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।—বলতে বলতে দুর্গার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এলো, সে হাত দুটি যুক্ত করে কপালে ঠেকাল।

স্যার শংকর জিজ্ঞাসা করলেন : ওভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্য ?

এক ঝলক জলন্ত দৃষ্টি স্যার শংকরের মুখে নিক্ষেপ করে দুর্গা বলল : ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলাম, ভারতবাসীর প্রিয় নেতা যে উদ্দেশ্যে সরকারকে বিভ্রান্ত করে অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক।

স্যার শংকর বক্রদৃষ্টিতে দুর্গাকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণস্বরে বললেন :

তুমি ত সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি! সুভাষ বাবুকে এ ভাবে সমর্থন করলে কি রকম বিপত্তি আসতে পারে তা জান?

মুখখানা তুলে দৃঢ়স্বরে দুর্গা উত্তর করল: যে কোন বিপত্তিকে আমি এ জন্যে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। বেশ ত, বাবার সঙ্গে আমাকেও আটক রাখবার ব্যবস্থা করুন না—আমি তাহলে খুসিই হব।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে এবং মৌন দৃষ্টি দুর্গার উত্তেজিত মুখে নিবদ্ধ করে স্যার শংকর বললেন: আশ্চর্য, তোমার বাবার এই অবস্থা, শুনছ—এখনি তাঁকে তোমার চোখের উপরই ঐ শয্যা থেকে ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, তুমি ওঁর একমাত্র সন্তান, অথচ তোমার মুখে বেদনার কোন চিহ্নই নেই—ভয় পেয়েছ বা ভাবছ বলে মনেই হচ্ছে না! এটা কি ঠিক?

তেমনি দৃঢ়স্বরেই দুর্গা উত্তর করল: যাঁকে ঠেস দিয়ে আপনি এ কথা বললেন, তিনিই এ শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকের রাজত্বে আমরা জীবন আর মৃত্যুকে কবির ভাষায় ভৃত্যের সামিল করতে অভ্যস্ত হয়েছি স্যার! দুঃখ কষ্ট আর অভাবকে আমরা সহ্য করতে শিখেছি বলেই এমন সংকটেও বিহ্বল হয়ে পড়িনি।

স্যার শংকর মৃদু হেসে বললেন: কিন্তু জীবনের গতির কথা ত বলা যায় না, যদি কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়—চারদিক থেকে দুঃখ কষ্টের উপরে যদি লাঞ্ছনাও এসে ভয় দেখায়, তখন কি করবে?

মৃদু হেসে দুর্গা উত্তর করল: সব রকম অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা না থাকলে আপনার সঙ্গে এমন করে তর্ক করতে পারি?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে স্যার শংকরলাল বললেন: তাহলে

আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। ভেবেছিলাম, এ কঠিন ব্যাপারটার সম্পর্কে খুবই একটা বেদনা পেতে হবে, অনেক শাপ মন্যি কুড়াতে হবে, একটা কান্নার রোল উঠবে; কিন্তু এখন দেখছি—যা ভেবেছিলাম, সব ভুয়ো। অধ্যাপক মিত্র পাকা লোক, কোন কথাই বলছেন না, আর তুমিও মা লক্ষ্মী, সব রকম অবস্থাই মেনে নিতে প্রস্তুত! তাহলে জাহ্নবীবাবু—

দুর্গা বলল: আমার কাকাকে তাহলে আপনি আগে থাকতেই জানতেন—আমাদের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত!

স্যার শংকর নীরবে দুর্গার মুখের পানে তাকালেন শুধু। পক্ষান্তরে অধ্যাপক যদুপতি এই সময় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাকে তাহলে এখনি নিয়ে যেতে চান বলুন?

স্যার শংকর: হ্যাঁ, মিষ্টার মিত্র। সরকারের 'অর্ডার'—ফাইলে আছে, দেখতে যদি ইচ্ছা করেন—

যদুপতি: না, না, কোন প্রয়োজন নেই।

দুর্গা: বাবাকে এখন কোথায় নিয়ে যাবেন?

যদুপতি: ওকথা কেন জিজ্ঞাসা করছ মা, ওটা বরাবর গোপন থাকবে—ওঁরা বলবেন না এবং বাইরের কেউ জানতেও পারবে না।

স্যার শংকর: তবে তোমার বাবা অসুস্থ; তাঁর জীবনের দায়িত্ব যখন সরকারের—কোন অবহেলা হবে না, এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

একটা নিশ্বাস ফেলে দুর্গা বলল: চিন্তিত হয়েই বা কি করতে পারি বলুন! যেখানে জাতিকে গড়ে তুলতে যাওয়াও অন্যায়, যে-সরকার নিজের দেশের শিক্ষা কানুনও অধীন দেশে চালাতে নারাজ, সেখানে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে!

স্যার শংকর যদুপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কন্যার

ভার এ অবস্থায় আপনার ভাই জাহ্নবীবাবুকে দেওয়া হচ্ছে বলে কোন আপত্তি নেই ত?

যত্নপতিবাবু বললেন: জাহ্নবীই জানে, উপর থেকে আমার ডাক এলে ওকেই দুর্গার অভিভাবক হতে অনুরোধ করেছিলাম; তখন জানিনি যে, সরকারের সেরেস্তা থেকে এভাবে এত শীগগীর ডাক আসবে—আর, স্যার শংকরলালই সেটা বহন করে আনবেন।

স্যার শংকরলাল বললেন: এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলি! অবস্থাটা আমার আপনি অবশ্যই বুঝেছেন, কিন্তু আপনার কন্যা দুর্গাদেবী যে অন্যরকম ভাবছেন তাতে ভুল নেই! কিন্তু একদিন এ ভুলও ওঁর ভেঙে যাবে—এ কথা বলে রাখলাম।

দুর্গা বলল: পুলিসের ভুলই বরাবর ভেঙে যেতে দেখে আসছি, আমাদের ভুল পুলিস ভেঙে দিয়েছে, এমন নজির ত জানা নেই!

একটু হেসে স্যার শংকর বললেন: বেশ ত সেই নজিরই না হয় তৈরী করা যাবে।

একজন সাব ইনেসপেক্টার এসে খবর দিল: ষ্ট্রেচার এসেছে, দুজন ডাক্তারও আসছেন।

স্যার শংকরলাল বললেন: তা আসুন, কিন্তু ডাক্তারের আর দরকার হবে না—অধ্যাপক এখন সামলে গেছেন, ভালই আছেন—

অতঃপর দুর্গার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেন: আর ভালই থাকবেন।

দুর্গা ধীরে ধীরে যত্নপতির শয্যাপ্রান্তে গিয়ে বসল—মুখখানা তাঁর বুকের উপর রেখে অস্ফুটস্বরে কি একটা কথা বলল। যত্নপতি নীরবে ডানহাতখানি আস্তে আস্তে তুলে তার মাথায় রাখলেন।

স্যার শংকরলাল বললেন: তোমার বাবার আর তোমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি আলাদা আলাদা গুছিয়ে ফেল মা-লক্ষ্মী—দুটো ট্রাঙ্ক

কিম্বা স্যুটকেসে। একটা যাবে তোমার বাবার সঙ্গে ; আর তোমারটা তুমিই নিয়ে যাবে।

মুখখানা তুলে দুর্গা বলল : ট্রাঙ্ক দুটো নিশ্চয়ই সার্চ করা হবে ?

স্যার শংকরলাল বললেন : না। তোমার বাবার সঙ্গে এমন কোন জিনিষ কিছু যাবে না, আর তুমিও এমন কিছু নিয়ে তোমার পুলিস-কাকার বাড়ীতে উঠবে না—যার জন্তে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে !

'কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে ভেবেই আপনার সরকার নিরীহ অধ্যাপকের স্বাধীনতাকে কয়েদ করতে এ ভাবে হাত বাড়িয়েছেন—এ কথা ভুলে যাবেন না !'—কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলে অগ্নিবর্ষীদৃষ্টি স্যার শংকরের মুখে নিক্ষেপ করে দুর্গা বিদ্যুত ঝলকের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২১

অভিভাবকের পালনীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে কর্তব্যনিষ্ঠ পিতৃব্যের পক্ষ থেকে কোন ক্রুটি হলো না—যদুপতি ও তাঁর সংঘের ভার স্যার শংকরলাল গ্রহণ করায়, জাহ্নবী ভ্রাতুষ্পুত্রী দুর্গাকে নিয়ে সেই দিনই মোটরে দেওঘরে ফিরে এলেন।

দুর্গাকে দেখেই জাহ্নবীর ছেলে মেয়ে সমীর ও শীলা আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে এল—পাটনাতেই নিজের মিষ্ট ব্যবহারে দুর্গা শিশু দুটিকে বাধ্য করেছিল। সুহাসিনী সারা দিনটাই উদ্বেগে কাটিয়েছেন—নির্বাক দৃষ্টিতে দুর্গার ম্লান মুখখানির দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে কোন কথাই নির্গত হলো না। দুর্গা নত হয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকাল, তিনি সস্নেহে তাকে বুকে টেনে নিলেন।

জাহ্নবী সংক্ষেপে পাটনার খবরটা সুহাসিনীকে শুনিয়ে দিয়ে বললেন : ছেলেদের পড়বার ঘরখানায় দুর্গা থাকবে, আর ওদের পড়ার ভার দুর্গাই নেবে। নিরিবিলি ঘর, ওর নিজের পড়াশোনারও সুবিধা হবে। দুর্গার জিনিষপত্তর সব ঐ ঘরেই রাখবার, তার বসবার, পড়বার, আর শোবার সব ব্যবস্থা করে দাও।

ব্যবস্থা সব দুর্গা নিজেই করে নিল—সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মত উপযুক্ত শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই হাতে কলমে পেয়েছে দুর্গা; কোন দিনই সে ঘর-গৃহস্থালী ব্যাপারে পরের উপর নির্ভরশীলা নয়, কাজেই এখানে নিজের হাতেই সব করে কর্মে নিল। পাটনার সেই বাক্-পটিয়সী চঞ্চল মেয়েটির সুসংযত কর্মপটুতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে গৃহকর্ত্রী সুহাসিনী চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

অল্প কয়েক দিনেই দুর্গা বুঝতে পারল যে, এ বাড়ীতে তার যত্নের অপ্রতুল বা অভাব না থাকলেও স্বাধীনতা এতটুও নেই। চায়ের টেবিলে পিতৃব্যের সদুপদেশ থেকে এই সত্যই সে আহরণ করেছে যে—পড়াশোনা, আমোদআহ্লাদ, গানবাজনা, শিল্পচর্চাদি খেয়াল খুসীমত চালিয়ে গেলে কেউ কোন রকম আপত্তি করবে না; কিন্তু খেয়াল খুসীমত বাংলোর বাইরে পা দিলেই মুস্কিল—সেটা তখন অন্যায় হয়ে দাঁড়াবে; এমনকি, গেটের কনেষ্টবলটাও যদি তাতে বাধা দেয়, সেটা তার কর্তব্য বলেই মনে করতে হবে।

দুর্গা এখানে নীরবেই সব শোনে। সে বেশ বুঝতে পারে, পিতৃব্য তার মুখে প্রতিবাদ শোনবার জন্য উন্মুখ; কিন্তু দুর্গা মুখখানি বুজে চুপ করে বসে থাকে—প্রত্যেক কথাটির যুক্তিসঙ্গত উত্তর তার মনের মধ্যে এক সঙ্গে জড় হলেও, আধার মধ্যে রক্ষিত দীপ শিখাটির মত সে সংযত ও অকম্পিতভাবে স্থির থাকে।

এক এক সময় দুর্গার এই বাক্ সংযমও প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে, যখন জাহ্নবী তার পিতার প্রসঙ্গে নানারূপ অপ্রীতিকর আলোচনা করেন—তাঁর পুত্রস্থানীয় নিরুদ্দিষ্ট শিষ্যদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকী দেন। এই খানেই ছিল এই মেয়েটির নির্ভীক চিত্তের একটা দুর্ব্বলতা—তার দেশমান্য মনীষী পিতার সুচিন্তিত কাজের অশোভন আলোচনা তার পক্ষে অসহ্যই ছিল, আলোচনাকারীর উক্তি যুক্তির দ্বারা ব্যর্থ না করা পর্যন্ত সে আশ্বস্ত হতে পারত না। এখানে এসে চিত্তের এই দুর্বল দিকটাকে ঘাতসহ করে তোলাই হলো দুর্গার আর একটা সাধনা।

এই সব অপ্রিয় আলোচনার সময় জাহ্নবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখভংগি লক্ষ্য করতেন; মধ্যে মধ্যে সহধর্মিনীর সঙ্গে চোখের দৃষ্টি বিনিময়ও হ'ত—স্বামীর মর্মজ্বালা উপলব্ধি করে সুহাসিনী মনে মনে হাসতেন, আর প্রশংসা করতেন দুর্গার।

আরো একটা বিষয় জাহ্নবীর কাজে খুবই আশ্চর্য ঠেকত। পাটনার ব্যাপার সম্পর্কে এই মেয়েটিকে একেবারে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ও অকৌতূহলী দেখে। এখানে এসে পর্যন্ত একটি প্রশ্নও তার মুখে ওঠেনি—কোন দিন কথাপ্রসঙ্গেও জানতে চায়নি—তার বাবা কেমন আছেন, সংঘের কি হলো, ছেলেগুলোর কোন খবর পাওয়া গেল কিনা?

জাহ্নবী আরো লক্ষ্য করেছেন—পাটনার প্রসংগ উঠলেই মেয়েটার প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মুখখানার উপর যেন একটা কালো আবরণ এসে পড়ে, তারপর থেকেই মনে হয় যেন পাথরে গড়া এক মূর্তি চেয়ারে বসে আছে। অথচ সাধারণভাবে সাংসারিক কাজে তার উৎসাহ ও প্রচেষ্টার অন্ত নেই—হাসি মুখে খুসি মনে চঞ্চলা হরিণীর মত সমীর ও শীলার সংগে বাড়ী ও বাগানে কত ছুটোছুটি করে! তখন কে বলবে যে, এই মেয়েটি এই বাড়ীতেই আবাল্যবর্ধিতা নয়, কিম্বা তার পশ্চাতে একটা বেদনাদায়ক ঘটনা রয়েছে।

সেদিন পাটনা থেকে ফোনে যখন স্যার শংকরলাল জাহ্নবীকে দুর্গার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, এই কথাগুলিই হুবহু তিনি বিস্ময়ের সুরে তাঁকে বলেছিলেন। জাহ্নবী একটা ফাইল দেখছিলেন তখন, হঠাৎ ফোনের অহ্বান শুনে রিসিভারটা কানের কাছে তুলেই জানতে পারলেন—স্যার শংকরলাল ফোন করেছেন তাঁকে। ফোনে কয়েকমিনিট ধরে যে সংলাপ চলে, তার মোটামুটি মর্ম এইরূপ :

স্যার শংকর : পাটনা হেড কোয়ার্টার থেকে ফোন করছি—আমি শংকরলাল ; পুলিস-সুপার মিঃ মিত্রকে চাই।

জাহ্নবী : আমিই জাহ্নবী, স্যার !

স্যার শংকর : দুর্গার খবর কি ?

জাহ্নবী : ভালো। রীতিমত নজরবন্দিনী করেই রাখা হয়েছে।

স্যার শংকর : কান্নাকাটি করছে ?

জাহ্নবী : মোটেই না—ঘরোয়া ব্যাপারে ত খুব হাসি খুসি ভাব দেখি। পড়াশোনাতেই বেশীক্ষণ কাটায় ; ওখানকার কোন ব্যাপারেই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে না—বাপের কথাও নয়।

স্যার শংকর : বল কি, অদ্ভুত মেয়ে ত !

জাহ্নবী : আরো আশ্চর্য ঠেকে স্যার, ওখানকার কথা উঠলেই মুখখানা ওর ভার হয়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত—একটি কথাও মুখে বলে না।

স্যার শংকর : তাহলে বোঝ কি রকম মেয়ে ! যাই হোক, খুব নজর রাখবে ওর ওপর। কিন্তু বাপের সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না—কেমন আছেন, কোথায় রাখা হয়েছে ?

জাহ্নবী : কিছু না। হয়তঃ ভেবেছে, জিজ্ঞাসা করা বৃথা—জানাবো না আমরা।

স্যার শংকর : তুমি কিছু বলেছ নিজে থেকে ?

জাহ্নবী : না স্যার, আপনার কাছ থেকে ত—

স্যার শংকর : জানাতে পারো, ভাল আছেন—তবে হার্টের ট্রাবলটা এখনো কমেনি ; ভালভাবেই চিকিৎসা চলছে।

জাহ্নবী : দাদার অসুখটা কি আপনি সত্য মনে করেন ?

স্যার শংকর : ডাক্তাররা ত তাই বলছেন।

জাহ্নবী : ওঁর সংঘ কি সার্চ করা হয়েছে ?

স্যার শংকর : না—প্রফেসর মিত্র সেরে না ওঠা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে, তবে চার দিকে পুলিসের পাহারা পড়েছে।

জাহ্নবী : ছেলেগুলোর কোন পাত্তা—

স্যার শংকর : না-হে, সংঘের কোন ছোকরাকেই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। হ্যাঁ, এখন যে জন্যে তোমাকে ফোনে ডেকেছি শোন—এই মাত্র একটা খবর পেলাম, ওরা নাকি তোমার সাব-ডিভিসানে গেছে একটা হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে।

জাহ্নবী : তাই নাকি ?

স্যার শংকর : ওদের সমস্ত রাগ আর আক্রোশ এখন তোমার উপর। নানারকম উপদ্রব চালিয়ে তোমার এলাকায় অরাজকতার সৃষ্টি করা, প্রফেসর মিত্রের কন্যাকে তোমার কাষ্টাডি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, নানা দিক দিয়ে তোমাকে অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত করা ওদের লক্ষ্য! সেইজন্যেই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

জাহ্নবী : আপনার খবর সত্য হোক স্যার, ওরা আমার এলাকাতেই আসুক—এই আমি চাই।

স্যার শংকর : কিন্তু এই চাওয়াটা না শেষে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে! সংঘের ঐ ছোকরাগুলোকে তুমি যে ছারপোকার মত টিপে মারতে

চাও, আমি তা জানি। কিন্তু ঐ ছারপোকাগুলোই শেষ পর্যন্ত তোমার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছারখার করে না দেয়!

জাহ্নবী: আপনি ত জানেন স্যার—এ অঞ্চলের স্বভাবদুর্বৃত্ত দলকে দুরস্ত করার পর থেকে আমার নাম হয়েছে—'জানমারা মিত্তির'। আপনার কৃপায় আমি ঠিক আছি, আর ঠিক থাকব।

স্যার শংকর: যদি প্রয়োজন মনে কর, আমি তোমার জন্তে এখান থেকে স্পেসাল ফোর্সের ব্যবস্থা করতে পারি।

জাহ্নবী: কোন প্রয়োজন হবে না স্যার! গোটাকতক চ্যাংড়া ছোকরাকে জব্দ করতে এখানকার পুলিস কনেষ্টবলরাই যথেষ্ট।

স্যার শংকর: বেশ, শুনে খুব খুসি হলাম।

বাসায় ফিরে জাহ্নবী এদিন সকলের সামনেই বললেন: দাদা অনেকটা ভাল আছেন আজ খবর পেয়েছি; তবে বুকের ট্রাবলটা এখনও যায় নি, ডাক্তাররা দেখছেন। আর, দাদার সংঘের ছেলেরা নাকি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করবার জন্তে তৈরী হচ্ছে—তীতুমীরের কেল্লাও নাকি গড়ে তুলছে।

দুর্গা নীরবেই পিতৃব্যের মুখের কথাগুলি শুনল—কিন্তু তার মুখে উদ্বেগের কোন চিহ্ন জাহ্নবী দেখতে পেলেন না।

* * *

ফোনে স্যর শংকরের সংগে সংলাপে জাহ্নবী যদিও সংঘের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেগুলিকে উপেক্ষা করলেন—প্রভিন্সের হেড্ কোয়ার্টার থেকে স্পেসাল ফোর্স পাঠাবার প্রয়োজন নেই জানালেন; কিন্তু নিজের এলাকায় তিনি সতর্কতা সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অবহিত হলেন। নিজেদের হেড কোয়াটারকে সুরক্ষিত করলেন, প্রত্যেক থানার দারোগাকে জরুরী নির্দেশ দিলেন—থানার কনেষ্টবল ও এলাকার

চৌকিদারদের পালা করে থানায় যেন মোতায়েন রাখা হয়। সাব ডিভিসনের থানাগুলিতে হঠাৎ যেন একটা 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল।

জাহ্নবীর স্ত্রী সুহাসিনী দেবীর পিতৃপক্ষের প্রত্যেকেই কৃতি ব্যক্তি এবং পুলিস বিভাগের বিশিষ্ট স্থানগুলি দখল করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল থেকেই। তাঁর এক মাতুলও পুলিসের স্পেসাল ব্র্যাঞ্চের বড় অফিসার—নাম বিপিন বসু। সম্প্রতি সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং নিজের কৃতবিদ্য পুত্র সুদর্শনকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ঐ বিভাগে। উচ্চশিক্ষার পর বিভাগীয় পরীক্ষাগুলিতে প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেটী কর্তৃপক্ষের খুবই আস্থা ভাজন হয়েছে; তার সুন্দর ও বলিষ্ঠ চেহারার উপর আভিজাত্যের একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়ায় ছাব্বিশ বছর বয়সেই এ বিভাগের সর্বময় কর্তার সুপারিশে পিতার চেয়ারেই বসেছে; পিতাও কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, নিজে অবসর গ্রহণ করলেও ছেলেকে নানারকম তালিম দিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলবেন। সেই বিপিনবাবু সম্প্রতি দেওঘরে এসেছেন কিছুকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে। সহর থেকে অনেকটা তফাতে রোহিণী অঞ্চলে একটা বাগানবাড়ীতে বিপিনবাবু সপরিবার উঠেছেন।

সেদিন সকালে প্রাতরাশের পর জাহ্নবী দুর্গার উপর সংসার ও ছেলে মেয়ের ভার দিয়ে পত্নী সুহাসিনাকে নিয়ে বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছেন।

রান্নাঘরে পাচককে সব বুঝিয়ে দিয়ে দুর্গা ড্রয়িং রুমে বসে একখণ্ড কার্পেটের উপর বৈদ্যনাথের মন্দিরের নক্সা তুলছিল, এমন সময় শীলা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল: দুর্গাদি, তোমার এক বন্ধু এসেছেন।

কৌতূহলী দৃষ্টি শীলার মুখের উপর ফেলে দুর্গা বলল: আমার আবার বন্ধু এখানে কে আছে—যে দেখা করতে আসবে?

শীলা মুখের এক বিচিত্র ভংগি করে বলে উঠল: বা-রে, সেই যে প্রতাপ বাবুর গল্প বলতে না—তিনি যে এসেছেন আমাদের বাড়ীতে, বাইরে কথা কইছেন—তুমি শীগগীর চলো।

দুর্গার বুকের ভিতরটা গুর গুর করে উঠল—আনন্দে কি আতংকে, কে বলবে! ক্ষণকাল চুপ করে কি ভাবল, তারপর হাতের সূঁচ সুতো কার্পেটখানার ভিতরে রেখে পাট করে সেখানি নিয়েই দরজার পরদা ঠেলে বাইরের দিকে ছুটল।

প্রতাপ ইতিমধ্যেই সমীরের সংগে ভাব জমিয়ে ফেলেছে এবং কথায় কথায় জেনে নিয়েছে যে, কর্তা ও গৃহিণী সকালে বেরিয়ে গেছেন রোহিণী অঞ্চলে। মৃদু হেসে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করল: তাহলে বাড়ীতে তোমরা তিন ভাই-বোনেই আছ?

সমীর উত্তর করল: রান্নাঘরে ঠাকুর আছে, দেওশরণ চাকর আছে, গেটে লাল সিংহ ত এতক্ষণ ছিল—হয় ত থানায় গেছে; আর মিসিরজী ত বাবার সঙ্গে থাকে।

বলতে বলতে ড্রয়িং রুমের দরজার দিকে নজর পড়তেই সমীর সহর্ষে বলে উঠল: ঐ যে দিদি এসেছে! সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের কঠিন হাতখানা কোমল দুটী হাতে চেপে ধরে দুর্গার দিকে চেয়ে বলল: দিদি, দেখ কে এসেছেন—তোমার গল্পের প্রতাপবাবু! কি মজা!

আরক্ত মুখখানা নত করে দুর্গা প্রতাপকে প্রণাম করল; তারপর চোখ দুটী তুলে অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলল: তবু ভালো, মনে পড়েছে!

সমীরকে দু'হাতে জড়িয়ে দুর্গার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রতাপ উত্তর করল: আমাদের মনের খবর কি তোমার অজানা আছে দুর্গা,

যে এভাবে কটাক্ষ করলে! নেপোলিয়ান বলতেন—উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত শক্তি, আর উপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশলই হচ্ছে জয়-যাত্রার পাথেয়।

মৃদু হেসে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: তাহলে উপযুক্ত হয়েই পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছ নাকি?

প্রতাপ উত্তর করল: প্রতীক্ষা আর করতে পারলুম কই! সংঘে চাবি-তালা পড়েছে, রোজকার অভ্যাস পর্যন্ত বিগড়ে যেতে বসেছে; আর যে পারছিনে, মন পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—চুপ করে বসে থাকার চেয়ে ডাকাতি করা ভালো। সেই নজিরটাকে লক্ষ্য করেই বেরিয়ে পড়া গেছে। সব নির্ভর করছে এখন গৃহস্বামীর উপর।

দুর্গা একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল: গৃহস্বামীর কাছে কি প্রত্যাশা কর, জানতে পারি?

প্রতাপ বলল: জানাজানির কি আছে! ধরে নাও—অতিথি হইয়েই এসেছি এ বাড়ীতে! সব দেশেই রেওয়াজ আছে—দূত আর অতিথি বিচারের বাইরে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে গৃহস্বামী মাত্রেই বাধ্য।

দুর্গা বলল: কিন্তু এখানকার গৃহস্বামীর মনের খবর জানতে কি আপনাদের এখনো বাকি আছে প্রতাপবাবু?

প্রতাপ উত্তর করল: যা জেনেছি, সেটা বাইরের ব্যাপার, তার উপর নির্ভর করে ঠিক মত বিচার করা চলে না। সদর বাইরে বলে দুটো দিক আছে। যেমন—ঘরে আটপৌরে কাপড়, আর বাইরের জন্যে কাচারীর পোষাক। ঐ পুলিস মার্কা মানুষটির ঘরোয়া রূপটা দেখবার জন্যেই এ ভাবে আসা! ধরে নিতে পারো—আমি তোমাদের গৃহাগত অতিথি।

মুচকি হেসে দুর্গা বলল: তাহলে শুনুন বলি: বাবা যেমন নির্বিচারে

তাঁর সহোদর ভাইটিকেই অভিভাবক করে তাঁর উপরে আমার সব ভার চাপিয়ে গেছেন, গৃহস্বামীও তেমনি ঘণ্টা দুয়েকের মতন এ বাড়ীর গৃহীর কর্তব্য ভার আমার উপর দিয়ে কাকিমাকে নিয়ে বেরিয়েছেন। কাজেই কর্তব্যের কোন ত্রুটি হতে আমি দিচ্ছিনে; অতিথিকে আমি সাদর অভ্যর্থনাই জানাচ্ছি—আপনি আসুন।

এর পর প্রতাপকে ড্রইং রুমে বসিয়ে গল্প করতে করতেই দুর্গা নিপুণভাবে অতিথির সময়োচিত পরিচর্য্যাটুকু সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি যে প্রাতরাশ সে অতিথিকে পরিবেষন করল, তা সাধারণ হলেও প্রতাপের যেমন বাঞ্ছিত, তেমনি তাদের নিত্য খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

তারপর অনেক কথাই হলো দুজনের মধ্যে এবং সে সকল কথা এমনি দুর্বোধ্য ও ইঙ্গিতময় যে, সমীর এবং শীলা সর্বক্ষণ সান্নিধ্যে থেকেও এক বর্ণই বুঝতে পারল না।

হঠাৎ দুর্গা বলে ফেলল: ওঁদের আসবার সময় প্রায় হয়ে এল; আত্মীয় বাড়ীতে যদিও গেছেন, এখানে এসেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আমার উপর যতটুকু ভার ছিল, আমি তা করেছি। এর পর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবার এক্তিয়ার আমার নেই—কাকীমা তার ব্যবস্থা করবেন; অবিশ্যি, ব্যবস্থাপক হচ্ছেন খোদ মালিক।

প্রতাপ বলল: প্রাতরাশে যা খাইয়েছ, মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রয়োজন হবে না আর? তবে ওঁরা যদি আদর করে আহ্বান করেন—না বলব না নিশ্চয়ই। এলেই বুঝতে পারা যাবে—ঢেউটা কোন দিকে গড়াবে।

ঠিক এই সময় বাইরে গেটের সামনে মোটর এসে থামল—হর্ণের কর্কশ শব্দ শুনে লাল সিং ছুটতে ছুটতে এসে মিলিটারী কায়দায় কুর্ণিশ করল। ফটক ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে তাকে রীতিমত ধমক দিয়ে জাহ্নবী গাড়ী থেকে নেমে সস্ত্রীক বাংলোয় ঢুকলেন।

মোটরের শব্দের সঙ্গে হর্ণের আওয়াজ 'হতেই দুর্গা বলে উঠল : ঐ কাকাবাবু এলেন।

সমীর ও শীলা তৎক্ষণাৎ বাইরে ছুটে গেল। সোজা হয়ে বসে প্রতাপ বলল : তুমি ভিতরে যাও দুর্গা।

কথাটার অর্থ উপলব্ধি করেই দুর্গা উঠে পড়ল এবং ওঁরা বাংলোর বারাণ্ডায় ওঠবার আগেই সাঁৎ করে ভিতরে চলে গেল।

পরমোল্লাসে বাড়ীর দুটি বালক বালিকা প্রতাপকে দেখেই যেভাবে তার আসার খবরটা দুর্গাকে দিয়েছিল, তেমনি উল্লাসে বারাণ্ডায় এসে পিতা মাতাকেও সেই খবরটি দিল। শুনেই জাহ্নবীর চেহারাটা একবারে বদলে গেল—পায়ের গতিও সঙ্গে সঙ্গে আপনি রুদ্ধ হলো। সুহাসিনীও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়েই সেই বিকৃত মুখভংগির অর্থ উপলব্ধি করলেন। অন্তপথে সুহাসিনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিতরে গেলেন; গম্ভীর মুখে জাহ্নবী সদর্পপদে বারাণ্ডা অতিক্রম করে ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন। চিহ্নিত কোন জবরদস্ত শিকারকে হাতের মধ্যে পেয়ে শিকারীর মনে যে উত্তেজনা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, তেমনি একটা আবেগ পুলিস সুপারের স্পর্ধিত অন্তরকে তখন মথিত করছিল। মনের উত্তেজনা পায়ের ভারি বুটের ইচ্ছাকৃত কর্কশ শব্দে প্রকাশ করে তিনি সামনের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ দুটো বড় করে দেখলেন—সেই দুর্বিনীত বলিষ্ঠ দেহ যুবকটি একটা বড় সোফার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে নির্ভয়ে নিদ্রা দিচ্ছে—তার নাকের গর্জনের সংগে সুপ্রশস্ত বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে। স্বদেশবাসী স্বজাতি কোন ছেলের আকৃতিগত

বৈশিষ্ট্য যেখানে দেশ ও জাতি-বৎসল সহৃদয় ব্যক্তির চিত্তে আনন্দ সঞ্চার না করে পারে না, জাহ্নবী মিত্রের বিদ্বেষপ্রবণ চিত্তে কিন্তু প্রতাপের অসাধারণ দেহ-সৌষ্ঠব একটুও নাড়া দিল না; বরং ক্রোধ ও বিরক্তির প্রাচুর্য্যে তিনি উপরের এক পাটি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটখানা চেপে ধরে ফুলতে লাগলেন। বেতের হাল্কা ছড়ি গাছটি তাঁর হাতেই ছিল; একবার ভাবলেন, হরিহর ছত্রের সেই উদ্ধত ছোকরার বেয়াদপির শোধটা এখানেই তুলে নেন—তার এই অসহায় নিদ্রাতুর অবস্থায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাতের চাবুকটা আচ্ছা করে চালিয়ে। সংকল্পের সঙ্গেই তিনি সামনের টেবিলটার উপরে সজোরে ছড়ির একটা ঘা দিয়ে তার মহলাও দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর শিক্ষিত মনের রুচিই হলো বিরোধী—এই নিষ্ঠুর সংকল্পটা তাঁকে ত্যাগ করতে হলো। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এই নিদ্রিত অবাঞ্ছিত যুবকটির মুখের দিকে একই ভাবে চেয়ে রইলেন; তারপর আস্তে আস্তে র‍্যাকটির কাছে গিয়ে মাথার টুপি ও গায়ের ইউনিফরমের কোটটি খুলে যথাস্থানে রাখলেন। এখন তাঁর মনে প্রশ্ন হলো, গ্রেপ্তার পর্বটা কি ভাবে চালানো উচিত? তাঁরই গৃহে যে লোক এসেছে, যতবড় অপরাধী হোক না কেন—তিনিই যদি সরাসরি তাকে হাজতে পাঠান, তাহলে একটা অখ্যাতি ত উঠবেই, এমন কি গৃহিণী সুহাসিনী দেবীর পক্ষেও সেটা মর্মান্তিক হবে—যেহেতু, সে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথি। কাজেই এক্ষেত্রে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রবচনটির অনুসরণ করে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করা সমীচীন মনে করলেন জাহ্নবী। আর একবার নিদ্রিত প্রতাপের সোফাটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি—বার দুই জোরে জোরে পায়ের বুটও ঠুকলেন; কিন্তু প্রতাপের গভীর নিদ্রার মধ্যে সে শব্দ মগ্ন হয়ে গেল। জাহ্নবী ভাবলেন—ভালোই, তাঁর সংকল্প সিদ্ধির পক্ষে এটা

অনুকূল। পাখার রেগুলেটারের গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি ভিতরে গেলেন।

মিনিট তিনেক পরেই দুর্গা অতি সন্তর্পণে ড্রয়িং রুমে ঢুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল: সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

চোখ দুটো খুলে চাপা গলায় প্রতাপ বলল: তোমার কাকাবাবু তার সাক্ষী, জোরে জোরে কানের কাছে বুট ঠুকেও ঘুম ভাঙাতে পারেন নি। তোমার মুখ দেখে বুঝছি ব্যাপার গুরুতর।

দুর্গা বলল: জিপে করে ছ'জন সিপাইকে পাঠাবার জন্যে কাকা-বাবু ফোন করলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা এসে পড়বে। খবরটা দিয়ে গেলুম—আর থাকবার জো নেই।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই দুর্গা চপলার গতিতে চলে গেল। প্রতাপও তৎক্ষণাৎ উঠে বসল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল র‍্যাকের উপরে পুলিস সুপারের ইউনিফরমটার উপরে। তার ভিতরের ঝোলা পকেটের মধ্যে সুরক্ষিত কোন গুরুভার বস্তু সেই অবস্থায় বিজলী পাখা চালিত বায়ুর চাপে দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে মিশে একটা শব্দ সৃষ্টি করছিল। গৃহাগত অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর অভ্যর্থনার আয়োজন পদ্ধতি প্রতাপের মত সহিষ্ণু ছেলের চিত্তকেও তখন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সেও তখন দায়িত্বশীল গৃহস্বামীর অনবধানকে তার প্রতি অশোভন আচরণের প্রত্যুত্তর স্বরূপ গ্রহণ করতে উঠে দাঁড়াল। চীল যে ভাবেই লক্ষ্য বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি ক্ষিপ্রভাবে প্রতাপ জাহ্নবীর ইউনিফরমের ঝোলা পকেট থেকে সেই বস্তুটি তুলে নিজের কোটের নিচে ফতুয়াটার পকেটে রেখেই পুনরায় নিদ্রার ভাণ করে নাক ডাকাতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এলেন জাহ্নবী। পায়ে চটি, প্যান্ট ছেড়ে কাপড় পরেছেন, গায়ে একটা পাঞ্জাবী, মুখে পাইপ। প্রতাপের

মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, আর একবার তাকালেন কপট নিদ্রাচ্ছন্ন নিশ্চিন্ত মুখখানার দিকে; তারপর পাইটা হাতে নিয়ে একটু জোরেই বললেন: তোমার ঘুম কি ভাঙবে না?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপের ঘুম ভেঙে গেল, চোখ দুটো দুহাতে রগড়েই সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে করযোড়ে নীরবে নমস্কার করলো।

গম্ভীর মুখে জাহ্নবী বললেন: ব'স।

সেই সঙ্গে তিনি পাশের সোফাটায় বসে মুখে পাইপটা গুঁজে দিলেন—চোখ দুটো প্রতাপের মুখেই নিবদ্ধ রইল।

না বসেই প্রতাপ মুখে একটু হাসি এনে আস্তে আস্তে বলল: এসেই শুনলাম, আপনি বেরিয়েছেন—ট্রেণ জার্ণিতে ঘুমাতে পারিনি রাতে, তাই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পাইপটা মুখের একপ্রান্তে চেপে রেখেই জাহ্নবী জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

প্রতাপ: উপস্থিত পাটনা থেকেই।

জাহ্নবী: পাটনাতেই আছ তাহলে? দলের সব কোথায়?

প্রতাপ: আমরা এক সঙ্গেই সকলে এসেছি।

জাহ্নবী: বটে! আর সব তাহলে কোথায়? এখানে এলো না যে?

প্রতাপ: সাহস করল না আসতে। অথচ, আমাদের গুরুকন্তাকে দেখতে সবাই উদ্‌গ্রীব। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত না জেনে ত আর আসতে পারে না—

জাহ্নবী: ও! তাই তোমাকে পাঠিয়েছে—বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝতে? তা, কোথায় তারা উঠেছে?

প্রতাপ: আপনি প্রসন্ন মনে তাদের আসতে অনুমতি যদি করেন—তাহলে আমি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি এখনি।

জাহ্নবী : তুমি আর কষ্ট করে নাইবা গেলে—আমি লোক দিচ্ছি, একটু চিরকুট লিখে দাও তার হাতে।

হাতের ঘড়িটা দেখে প্রতাপ একটু ব্যস্ত ভাবেই বলল : না, না, লোক পাঠাবার দরকার নেই—আমিই যাচ্ছি। আজ এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করা যাবে।

জাহ্নবীও ততোধিক ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন : বিলক্ষণ! তোমার গুরুগৃহের ব্যাপার ত দেখে এসেছি, আর আমিও ত তাঁরই ভাই—অতিথি সৎকারে আমিও অনভ্যস্ত নই। কিন্তু তা বলে তোমাকে ছাড়তে পারছি না হে! বাড়ীতে তাহলে আর আমার রক্ষা থাকবে না। তুমি ব'স। আর, একান্তই যদি তোমার দলের পাত্তা নাই দাও—তাদের খুঁজে বের করে আনা আমার পক্ষে কঠিন হবে না; জানত, এটা আমারই এলাকাধীন সাব ডিভিসান। অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাটা এক সঙ্গেই করা যাবে—ব'স তুমি, ব'স।

জাহ্নবী তাঁর উক্তির শেষের দিকে বলবার কথাটা এমন শক্ত করেই বললেন—যেন কড়া হুকুমের মতই শোনাল। প্রতাপের চোখ দুটোও জ্বলে উঠল, সেই জ্বলন্ত চোখে হাত ঘড়ির বড় কাঁটাটার পানে চেয়েই সে বলল : আপনিই বসুন স্যার, কেননা, আমার পক্ষে এখন বসাটা ঠিক হবে না; আপনার সাব ডিভিসনে আসা মানেই আপনার সহৃদয় আতিথ্যকে স্বীকার করে নেওয়া, আমি আসছি।

কথাগুলো বলতে বলতেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল প্রতাপ। কিন্তু দরজার কাছে পৌছাবার আগেই জাহ্নবী সবেগে তাঁর ইউনিফরমের কাছে গিয়ে ডান হাতখানি তার ভিতরে রেখে এবং বাম হাতে মুখের পাইপটা তুলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : Beware you brute, hands up.

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ ও সর্পচক্ষুবৎ হিংস্র

দুটি চক্ষুর দৃষ্টি ম্লান হয়ে গেল। সেই অবস্থায় নিষ্পলক দৃষ্টি জিজ্ঞাসাতে ভ'রে তিনি শুধু বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন—দরজার সামনে দৃঢ়-ভংগিতে দণ্ডায়মান যুবকটির দিকে।

পরদার ফাঁক দিয়ে বাহিরের আলোর একটা ঝলক তখন পড়েছে প্রতাপের মুখে—চোখের তারা দুটোও সেই আলোর ঝলকানিতে যেন প্রদীপ্ত হয়ে হাসছে। সেই হাসির মধ্যেই জিজ্ঞাসার জবাবটি যেন সুস্পষ্ট হয়ে জাহ্নবীর বিমূঢ় ভাবটা ভেঙে দিল, নির্বাক মুখে ফুটে উঠল ভাষা; রিক্ত ডান হাতখানি ইউনিফরমের পকেট থেকে টেনে বার করে তর্জনিটি প্রতাপের দিকে তুলে দৃঢ় স্বরে তিনি বলিলেন: You hound! It is you, who have done this.

পলকের মধ্যে নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে জিজ্ঞাস্যর বস্তুটি বার করে ক্ষিপ্রবৎ গৃহস্বামীর মুখের উপর তুলে প্রতাপ সহাস্যে উত্তর করল: Yes sir, that is the truth and the whole truth, so far as I am cognisant of it. I will keep this in memory of your kind hospitality. Take this as your compliments at least. আপনার সহৃদয় আতিথেয়তার স্মৃতিচিহ্নরূপেই আমি এটি নিয়ে চললাম স্যার!

শেষ কথাটির সঙ্গেই বক্তা কক্ষের পরদা ঠেলে সবেগে বেরিয়ে গেল। বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপের সুরের মত বিকৃত একটা স্বর জাহ্নবীর কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো: মিশির—পাকড়ো!

২৩

প্রতাপকে পাকড়াও করবার জন্য পুলিস-সুপারের বাংলোয় যখন চাঞ্চল্যের রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে—সেই সময় একখানা জিপ এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াল। ছ'জন বন্দুকধারী সিপাহী পুলিস-সুপারের নির্দেশমত এসে হাজির হয়েছে; কিন্তু যাকে ধরবার জন্য এদের আহ্বান করা হয়েছিল, মিনিট কয়েক পূর্বেই সে লোক খোদ পুলিস সুপারের রিভালভারটি হস্তগত করে আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে! কর্তার কঠোর আহ্বানে রসুই ঘর থেকে একা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় মিশির যখন ছুটে আসে এবং দেউড়ীর পাহারাওয়ালাটি এক ফেরিওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গালাপে ব্যস্ত থাকে—তাদের মধ্য দিয়েই দিব্য সপ্রতিভ ও নির্ভীকভাবে অবাধে সে লোক বাংলো থেকে সে সময় বেরিয়ে যায়।

সংক্ষেপে লোকটির আকৃতিগত পরিচয় দিয়ে জাহ্নবী জিপের জমাদারকে তার অনুসরণে পাঠালেন। আগন্তুকের পক্ষে যে সকল স্থানে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব—তারও আভাস দেওয়া হলো। তারপর ফোনে, তাঁর এলাকাধীন থানাগুলিতেও যথাযথ নির্দেশ দিলেন। ফলে, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালেই সমগ্র সাব ডিভিসান জুড়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো—পলাতক যুবকটিকে ধরবার জন্য মধ্যাহ্নের থানা ফেলে থানাদারগণ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পুলিস-সুপারের বাংলোয় যখন ধড়পাকড়ের এই সব আয়োজন চলছিল, সেই সময় দেওঘরের পূর্ব দিকবর্তী গভীর-নীল-মেঘ-মালার মত আকাশচুম্বি ত্রিকূট পর্বতমালা লক্ষ্য করে সাধারণ পথচারীর মত নিরুদ্বেগ গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রতাপ। দেওঘর থেকে ত্রিকূট পর্বতের দূরত্ব

প্রায় দশ মাইল ; দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের উপর দিয়ে একটি রাস্তা এঁকে বেঁকে পর্বতের পাদদেশে গিয়ে মিশিছে। জনবিরল পথ, অসময়ে লোক-জনের গতিবিধি খুবই কম ; কচিৎ দুই একখানি এক্কা ধুলিজালে পথ আচ্ছন্ন করে সহরের দিকে আসে ; কোন উৎসব বা পর্বাদি ব্যতীত এমন অসময়ে সহর থেকে এপথে লোকজন বা এক্কার গতিবিধি ত্রিকূটের দিকে বড় একটা দেখা যায় না।

গ্রীষ্মের প্রখর রোদে গাছের একটা ডাল মাথায় করে এই পথে প্রতাপ চলেছে একা—মধ্যে মধ্যে পিছনের দিকে দেওঘরের প্রশস্ত পথটির উপর দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হচ্ছে। প্রতাপ এমন ভাবে পথের ধারে অশ্বথ, আম, মহুয়া, পাকুড়, পলাশ প্রভৃতি গাছগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে, যাতে সহরের পথ থেকে কেউ এদিকে তাকালে সহসা তার দৃষ্টি-পথে না পড়তে হয়। যেখানে গাছপালা নেই, পথের দুধারে খালি প্রান্তর, সেখানে অনুসরণকারীর দৃষ্টি অতিক্রম করবার জন্য সে পত্রপল্লব-যুক্ত গাছের প্রকাণ্ড ডালটি ভেঙ্গে নিয়েছে এবং রোদের তাপ ও লোকের দৃষ্টি থেকে এরই সাহায্যে আত্মরক্ষা করে চলেছে।

সহসা সামনের দিকে একটা কর্কশ শব্দের সঙ্গে ধূলিরাশি ধূম্রের মত স্ফীত হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে প্রতাপ বুঝল যে, মোটর সাইকেল চালিয়ে কোন ব্যক্তি এই পথে আসছে।

তার অনুমান ঠিকই হলো ; মিনিট কয়েকের মধ্যেই আরোহী নিকটে এসে পড়ল। জনবিরল সংকীর্ণ পথে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ পরিপূর্ণ বেগে সাধারণত কেউ মোটর সাইকেল চালায় না। আরোহীর পরণে খাকির হাফপ্যাণ্ট, গায়ে টাইট কোট ও মাথায় টুপি দেখেই প্রতাপ বুঝতে পারল যে, সে পুলিসের লোক। এতক্ষণ গাছের পত্র-

পল্লব-বহুল শাখাটি সামনে খাড়া করে প্রতাপ তার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল; আরোহী নিকটে আসতেই সেই বৃহৎ শাখাটি সে পথের উপর এমন কৌশলে নিক্ষেপ করল যে, তার পাশ কাটিয়ে সাইকেল চালাবার কোনও উপায় রইল না।

সহসা সম্মুখে এভাবে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় আরোহী চমকিত হয়ে তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে গাড়ী থামিয়ে ফেলল—সাইকেল তখন সেই বৃহৎ শাখাটির একেবারে সামনে এসে পড়েছে।

সলম্ফে গাড়ী থেকে নেমে লোকটি প্রতাপের দিকে এগিয়ে এল। তার দৈহিক আকৃতি অনেকটা গুর্খাদের মত, খর্ব হলেও সর্বাঙ্গের বাঁধুনি বেশ বলিষ্ঠ। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়—কতকটা ঘাড়ে-গর্দানে, অল্প গোঁফ, পাতলা দাঁড়ি, চুলগুলো পাটকিলে রঙের; ঠোঁঠ দুটো পুরু, গায়ের রং কুচকুচে কালো, চোখ দুটো মাঝারি রকমের, কিন্তু চোখের তারা দুটো কটা। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে, লোকটার মেজাজ খুব কড়া।

প্রতাপের ব্যবহারে তার মেজাজ প্রথমে যতটা চড়ে উঠেছিল, চোখের সামনে তার অসাধারণ চেহারার চটক দেখে সে মেজাজ সহসা থমথমে হয়ে গেল। এক নজরে প্রতাপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: আপনি আমাকে রুখলেন কেন?

প্রতাপ বলল: পথের সন্ধানের জন্য—এখানে ত জনমানব দেখছিনে; তাই এইভাবে আপনাকে রুখতে বাধ্য হয়েছি, মাপ করবেন।

পথের উপর নিক্ষিপ্ত বৃহৎ বৃক্ষ শাখাটিকে লক্ষ্য করে লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল: ওটা ত দেখছি আধখানা গাছ, কোথায় পেলেন?

মৃদু হেসে প্রতাপ উত্তর করল: এ পথে ত গাছের অভাব নেই—

একটা গাছ থেকেই ভেঙে এনেছি। রোদে ছাতার মত ওটাকে ব্যবহার করে আসছিলাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল : কোথায় আপনি যাবেন?

প্রতাপ বলল : ত্রিকূটের পাহাড়ে।

ত্রিকূটের নামেই আগন্তুকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুনরায় সে প্রতাপের আপাদমস্তক দেখতে লাগল।

প্রতাপ বলল : ত্রিকূটে যাবার সোজা রাস্তাটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন? এই জন্যেই আপনাকে রুখেছিলাম।

আগন্তুকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতাপের দেহের দিকেই ছিল।

সহসা সে-দৃষ্টি তার মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করে কণ্ঠস্বর একেবারে পরিবর্তিত করে সে বলে উঠল : সোজা পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ভাল মানুষের মত দেওঘরে পুলিস-থানায় ফিরে চল।

ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু রেখা ফুটিয়ে প্রতাপ মৃদুস্বরে বলল : ঠাট্টা করছেন?

তীক্ষ্ণস্বরে আগন্তুক বলে উঠল : না—হুকুম করছি। আমার ইউনিফরম দেখেও কি তুমি বুঝছ না—আমি পুলিসের লোক। আমি ইনফরমারদের চীফ, সাব-ইনেসপেক্টরের পাওয়ার নিয়ে আমি কাজ করি; গিরেফতার করবার এক্তিয়ার আমার আছে।

মুখখানা বিমর্ষ করে জড়িতস্বরে প্রতাপ বলল : কিন্তু স্যার, আমার কসুরের কথাটা ত বললেন না—যার জন্যে আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হুকুম করছেন?

আগন্তুক বুঝল, পুলিসের নামেই ছোকরা ভড়কে গেছে। কাজেই মুখখানা আরো গম্ভীর করেই সে বলল : ত্রিকূটের পাহাড়ে হালে কতক-গুলো পরদেশী লোক জমা হয়েছে; তারা যে কংগ্রেসওয়ালা তাতে ভুল

নেই। সেই খবর নিয়েই আমি পুলিস-সুপারের বাংলোয় যাচ্ছিলাম। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও ঐ দলের। বল, আমার কথা ঠিক কি না?

প্রতাপ বলল: তাই যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাতে দোষের কি হয়েছে স্যার? এখানে বাইরের লোক এলেই ত্রিকূট পাহাড় দেখতে যায়। যাঁরা সেখানে গেছেন—কংগ্রেসওয়ালা শুনেই এভাবে ঘাবড়াবার কি হয়েছে—যার জন্যে পুলিস-সুপারকে খবর দিতে ছুটেছেন! তারপর, আমি ত্রিকূট পাহাড়ে চলেছি জেনে আমাকেও গ্রেপ্তার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন! এখন বলুন ত, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

চোখ দুটি কপালের দিকে তুলে এবং কণ্ঠস্বর প্রখর করে পুলিসের ইনফরমারটি বলে উঠল: আলবৎ—কংগ্রেসওয়ালারা ডাকু আছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের হাতের একটি থাপ্পর প্রচণ্ড বেগে বক্তার দক্ষিণ গালটির উপর পড়ল; এবং অতর্কিত এই আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে সেই সঙ্গে সেও কঙ্করময় রাস্তার উপর ঘুরে পড়ছিল, কিন্তু আততায়ীই তার হাতখানা খপ করে ধরে খাড়া করে দিল। গণ্ডদেশের জ্বালার সঙ্গে তার স্নায়ুপুঞ্জেও তখন বোধ হয় বিষম একটা বেদনার সঞ্চার করছিল; তাই ঘোলাটে দৃষ্টিতে শুধু সে এই অদ্ভুত আততায়ীর দিকে চেয়েই রইল।

প্রতাপ বলল: কংগ্রেসকে অযথা আক্রমণ করলে আমরাও এই ভাবে পাল্টা আক্রমণ করি। আমরা বলি—এটা হচ্ছে অপরাধের শাস্তি। এখন যদি ইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ কর; আমি প্রস্তুত। কাছে রিভলবার থাকে ত বার কর; না থাকে—ঘুসি ত আছে।

লোকটি কিন্তু কোন উত্তর করল না। সেই ভাব-দৃষ্টি ফিরিয়ে অদূরবর্তী সাইকেলটির উপর নিক্ষেপ করে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

কিন্তু তার উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করেই প্রতাপ সবেগে তাকে অতিক্রম করে সাইকেলের হাতলটি ধরে শ্লেষের সুরে বলল: আমি যাচ্ছি ত্রিকূট, অনেকখানি রাস্তা, আপনার গন্তব্য স্থান ত পুলিস-সুপারের বাংলো—সে ত মাইল দুয়েকের মধ্যেই; কাজেই সাইকেলটি এখন আমারই প্রয়োজন।

কথা বলতে বলতেই ষ্টার্ট দিয়ে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে স্তম্ভিত পুলিস ইনফরমারের মুখের পানে চেয়ে হাতখানি তুলে প্রতাপ বলল: উপস্থিত গাছের এই শাখাটি আপনাকে দিয়ে গেলাম—সাইকেলটিও আমি জব্দ করব না, ফেরত পাবেন। বন্দেমাতরম্!

প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে মোটর সাইকেল স্তব্ধ পথ কাঁপিয়ে ত্রিকূটের পথে ছুটল।

স্তব্ধ অভিভূত পুলিস ইনফরমার মহাবীরপ্রসাদ তার খাঁটো হাতখানা বায়ুস্তরে বার দুই সবেগে নিক্ষেপ করে ব্যর্থ তর্জনের সুরে বলল: ডাকু, ফেরেববাজ উল্লু কাঁহেকা!

২৪

আহারান্তে জাহ্নবী ড্রয়িং রুমে এসে সবেমাত্র বসেছেন, এমন সময় পুলিস ইনফরমার হাঁফাতে হাঁফাতে তাঁর সামনে এসে কুর্ণিশ করে কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল: হুজুর, ভারি খারাপ খবর—কংগ্রেসী ডাকুরা ত্রিকূট পাহাড়ে জমায়েত হয়েছে!

জাহ্নবীর মেজাজ তখন ভাল ছিল না। তাঁর জীবনে এমন দুর্যোগ

আর কখনো ঘটেনি—পরাজয়ের গ্লানি এর পূর্বে এমন কদর্যভাবে এসে কর্মজীবনকে মসিলিপ্ত করেনি। জাহ্নবীর চোখের উপর ক্রমাগতই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, প্রতাপের সেই দৃপ্ত মুখ, সে মুখের সেই তিক্ত বাণী—I will keep this in memory of your kind hospitality! সেই দুঃসাহসী নির্ভীক ছেলেটীর তৎকালীন অপস্রিয়মান মুর্তিটি ভয়াবহ একটা অজগরের মত এখনো পর্যন্ত বুঝি তাঁর চক্ষুকে চমৎকৃত করছিল! নিজের উপরেই বিরক্ত হচ্ছিলেন তিনি—সামনে অজগর দেখলে পশুপাখীরা যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, আশ্চর্য্য—তাঁর অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছিল তখন। এ লজ্জা তিনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? আর, কি ভুলই করেছিলেন—ইউনিফরমটা এই ঘরেই খুলে রেখে অন্দর-মহলে তাঁর খাস কামরায় টেলিফোন করতে গিয়ে! এখন যে সে কথা ভাবতেও লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে!

ঠিক এই সময় ইনফরমার মহাবীর প্রসাদের মুখে খবরটা শুনেই তিনি স্তব্ধ হলেন। কি আশ্চর্য, আজ কি ভুলের গোলকধাঁধাঁয় পড়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? জীপের জমাদারকে সর্বাগ্রে সহরতলীর কুণ্ডার পথে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছেন, অথচ ত্রিকূটের কথা তাঁর মনে পড়েনি! কিন্তু এ খবর এনে মহাবীরপ্রসাদ এভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছে কেন—তার চোখ ফেটে যেন রক্ত পড়ছে!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার উপরেও তারা হামলা চালিয়েছে নাকি?

উত্তর করতে গিয়ে মহাবীরপ্রসাদ এবার সত্যিই কেঁদে ফেলল, আর্তস্বরে বলে উঠল: ডাকু আমার মোটর বাইক ছিনিয়ে নিয়েছে হুজুর!

কথাগুলো জাহ্নবীর বুকে প্রচণ্ড একটা আঘাতের মত এমনি রূঢ় হয়ে বাজল যে, তিনি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলেন, একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। মহাবীরই পরক্ষণে 'আর্তস্বরকে' আরো গাঢ় করে ঘটনাটা বলতে লাগল এবং ইতিমধ্যে মনে মনে এ সম্বন্ধে যে গল্পটি তৈরী করে ফেলেছিল, সেইটিই ভনিতা করে শুনিয়ে দিল:

ডাকুর কাছে পিস্তল ছিল হুজুর, নৈলে আমি তাকে সেইখানেই পাকড়াও করতাম। একটা গুলিও ছুঁড়েছিল, আমি তখন কায়দা করে জমিনে বসে পড়ি—সেই ফাঁকেই ডাকু আমার গাড়ী নিয়ে পালায়। এই জন্যেই হুজুরকে বলেছিলাম—আমাদের হাতে পিস্তল দেবার জন্যে।

জাহ্নবীর মনে পড়ে—এই ইনফরমারটি অনেকবারই তাঁর কাছে রিভলবার চেয়েছিল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেননি। পুলিস কর্তৃপক্ষ সাধারণত ইনফরমারদের হাতে রিভলভার দেন না। তবে জাহ্নবী ইচ্ছা করলে, দিতে পারতেন। কিন্তু কাছে রিভলভার থাকলেই কি তার মর্যাদা সব সময় রক্ষা করা যায়। তাঁর মত জবরদস্ত লোকের পকেটের রিভলভার হস্তগত করে সে তাঁরই আজ্ঞাবহ এই ইনফরমারের মোটর-বাইক লুঠ করেছে!

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জাহ্নবী নিঃসন্দেহ হলেন যে, ইনফরমার মহাবীর প্রসাদের আততায়ীও সেই প্রতাপ ছাড়া আর কেউই নয়। তিনি যখন তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য অতিষ্ঠ—জনবিরল কুঁওার দিকেই তার পলায়ন সম্ভবপর স্থির করে জীপের জমাদারকে কুণ্ডা থেকে সরমা পর্যন্ত অঞ্চলে তার অনুসন্ধানের নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সে তখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ত্রিকুটের পাহাড়ে চলেছে সঙ্গীদের সন্ধানে!

মহাবীরপ্রসাদের কাছে তিনি যে সব খবর পেলেন, তাতে এমনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পাটনার সেই বিপ্লবী পলাতক দলটি ত্রিকূট পাহাড়ের কোন দুর্গম স্থানে সমবেত হয়েছে ; প্রতাপও সেখান থেকেই তাঁর বাংলোয় সন্ধান নিতে এসেছিল। মহাবীরপ্রসাদ নাকি আট দশটি ছেলেকে পাহাড়ের পথে টহল দিতে দেখেছে। ত্রিকূটনাথের মন্দিরের কাছে যাত্রীদের যে বিশ্রাম ঘর আছে, তার সামনে পাথরের চাতালের উপরেও কতিপয় ছেলেকে দেখেছে। প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একই রকমের, ছোট ছোট চুল, গোঁফ কামানো, চোখে চশমা, পরনে ধুতি-পিরাণ। তাদের হাসিখুসি ভাব আর চালচলন দেখেই মহাবীর-প্রসাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, এরা কংগ্রেসওয়ালা ডাকু না হয়ে যায় না। খবর নিয়ে দেওঘরে আসবার পথেই তাকে আর এক ডাকুর সামনে পড়তে হয়।

সরকারী মোটর-বাইক এভাবে হারানোর জন্যে মহাবীরপ্রসাদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকত না ; কিন্তু এদিন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করে জাহ্নবী তাকে একটুও কড়া কথা বললেন না, বরং সংবাদটা সংগ্রহ করে আনবার জন্য তারিফই করলেন, পদোন্নতির ভরসাও দিলেন।

এর পর মহাবীরপ্রসাদকে নিয়ে তিনি তাঁর অফিসে চললেন ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা রীতিমত ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে। তাঁর স্মৃতিপথে তখন ভেসে উঠছিল—বুড়ি বালামের তীরে ও গৌহাটির পাহাড়ে বিপ্লবীদের তৎপরতা এবং সেই সূত্রে কলকাতার তৎকালীন পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা। জাহ্নবীর অন্তরে আশা উদ্দীপিত হচ্ছিল—তিনিও পুলিস পলটন নিয়ে ত্রিকূটের পাহাড়ে সমবেত এই নবাগত বিপ্লবীদলকে সায়েস্তা করে অনুরূপ বিখ্যাত হয়ে উঠবেন।

[illegible]-সুপারের অফিসে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এক পরামর্শ সভা

বসে গেল। সন্নিহিত থানাগুলি থেকে থানা-অফিসারগণকেও আহ্বান করে আনা হলো। রোহিনীর বাগান বাড়ীতে মোটর পাঠিয়ে জাহ্নবী তাঁর শ্বশুরস্থানীয় বিপিনবাবুকেও আনালেন—যেহেতু পুলিস-কমিশনার টেগার্টের সঙ্গে তিনি একত্র কাজ করছেন এবং এই জাতীয় ব্যাপারে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতাও আছে।

দরজা জানালা সব বন্ধ করে পুলিস-সুপারের খাস কামরায় পরামর্শ সভা বসেছে। বিপিন বসুই যেন সভা পরিচালনা করছেন—এমনি একটা সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে। আলোচনার পূর্বেই জাহ্নবী থানা অফিসারদের প্রত্যেকের নাম নিজে ডেকে ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখখানা দেখে তবে নামের তালিকায় লিপিবদ্ধ করছিলেন। রোহিণী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আহম্মদ আলির নাম ডাকতেই চেয়ার থেকে অপরিচিত যে বলিষ্ঠ যুবকটি উঠে মিলিটারী কায়দায় কপালের দিকে হাতখানা তুললো—তাকে দেখেই জাহ্নবীর আয়ত চক্ষুর ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল; কারণ, আহম্মদ আলী বর্ষীয়ান পুরুষ ও তাঁহার সুপরিচিত; এই যুবক এখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কি করে এলো?

কিন্তু যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করে দিল। সে অত্যন্ত বিনীতভাবে এগিয়ে এসে জাহ্নবীর হাতে পুলিস থানার সুপরিচিত বাদামী রঙের একখানা লম্বা লেফাফা দিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবার সুশ্রী মুখখানা আর একবার দেখে নিয়েই জাহ্নবী লেফাফা ছিঁড়ে ভিতরের চিঠিখানা পড়তে লাগলেন।

কয়েক ছত্রের ক্ষুদ্র চিঠি। আহম্মদ আলি সবিনয়ে লিখেছেন—দুপক্ষ ধরে জ্বরে ভুগছি। আমার ভাতিজা হালে বেনারস থেকে এখানে এসেছে। ওখানকার পুলিস-সুপার রায়বাহাদুর মুখার্জীর অধীনে কাজ করে—খুব চালাক চতুর আর সাহসী ছেলে। দারকার

কাজকর্মের তদারক আমার পক্ষ থেকে ছোকরাই করছে; এর নাম—আলিজান। হুজুরের বরাবর একেই পাঠাচ্ছি; বান্দার উপর যে হুকুম, আলিজানই বহে আনবে, তামিল করতে কসুর হবে না।

চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবীর চোখে প্রসন্নতার আভা পড়ল; হাসিমুখে বললেন: তুমি আহম্মদ আলির ভাতিজা—বেনারস পুলিসে কাজ কর! ভালই করেছেন তিনি তোমাকে পাঠিয়ে।

বলেই হাতখানা বাড়িয়ে আলিজানের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে যথাস্থানে বসবার ইঙ্গিত করলেন।

বিপিনবাবু এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে ছেলেটিকে দেখছিলেন। আলিজান তার নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন: আহম্মদ আলির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে; খুব হুঁসিয়ার লোক, তবে বেচারীর শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে বটে! এ ছোকরাকেও আমি রোহিণীতে দেখেছি মনে হচ্ছে, তবে আহম্মদ আলির ভাতিজা—তা জানতাম না।

আলিজান চেয়ার থেকে বিপিনবাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সবিনয়ে বলল: আমিও আপনাকে দেখেছি স্যার, কিন্তু তখন জানতাম না যে, কলকাতা পুলিসের আপনি মস্ত মাতব্বর লোক—এখানে এসেই সেটা জেনেছি।

এর পর আলোচনা সুরু হলো। জাহ্নবী সংক্ষেপে এই দলটির একটা বৃত্তান্ত দিলেন—এদের সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, তারই উপর নির্ভর করে। স্যার শংকরলালের কথাগুলোও শুনিয়ে দিলেন—এরা এ-অঞ্চলে হামলা করবার জন্যে তোড়জোড় করছে, যদি দরকার মনে করেন ত তিনি চাইলেই পাটনা থেকে স্পেশাল পুলিস ফোর্স'ও পাওয়া যেতে পারে। স্যার শংকরলালের এ প্রস্তাব সম্পর্কে জাহ্নবী যে কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন—তাঁর এলাকায় যোগ্য লোকদের নিয়েই প্রতিকারের সামর্থ তিনি রাখেন—তাও জানালেন। তারপর, প্রতাপ ছেলেটির তাঁর বাসায়

অপ্রত্যাশিত ভাবে আসা এবং সেই সূত্রে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাও তাঁকে বলতে হলো যতটা সম্ভব নিজের ইজ্জতটুকু সন্তর্পণে বাঁচিয়ে।

এর পরেই মহাবীরপ্রসাদকে আহ্বান করা হলো—সেও ত্রিকূট পাহাড়ে কংগ্রেসী ডাকুদের জমায়েত-বন্দ হওয়া থেকে আরম্ভ করে পথে তার লাঞ্ছনা পর্যন্ত সবই বলে গেল। পুলিস-সুপারের মত নিজের আহম্মুখীটুকু যতদূর সম্ভব সেও চেপে রেখেই বৃত্তান্তটা শুনিয়ে দিল।

বিপিন বসু মুরুব্বীর ভংগিতে উপদেশ দিলেন: স্যার টেগার্টের সময়ে আর এখনকার সময়ে অনেক তফাৎ; সারা দেশেই বারুদ ছড়ানো রয়েছে—এখন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে এমন কোনো রকম বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, যাতে সারা দেশের চোখ এদিকে পড়ে। তার চেয়ে, পাহাড়টার উপর নজর রাখবার জন্যে জনকতক গোয়েন্দাকে ওখানে মোতায়েম করা হোক, আর পুলিসও রীতিমত তৈরী থাকুক। ওরা চাইবে যে, পুলিস পাহাড় ঘিরে আক্রমণ চালাক—এর পিছনে ওদের অন্য উদ্দেশ্য থাকাও আশ্চর্য নয়; কিন্তু আমাদের ঐটে এড়িয়ে যেতে হবে। আমরা যেন' এ ব্যাপারটার উপরে কোনো গুরুত্বই দিইনি, এইটে জানাতে হবে। তারপর পাহাড় থেকে ওরা না নেমে পারবে না—নিচে নেমে সহরের দিকে এলে তখন ওদের বরং গ্রেপ্তার করা সহজ হবে।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু নিচে যদি দল বেঁধেই আসে—তাহলে ত পথেই একটা সংঘর্ষ বেধে যাবে, যে ভয় আপনি করছিলেন?

বিপিন বসু বললেন: নিচে নেমে কখনই ওরা সামনাসামনি লড়াই করতে চাইবে না, আর এক সঙ্গেই সকলে নামবেও না। এটা তুমি ঠিক জেনো জাহ্নবী—ওদের আসল উদ্দেশ্যই হোচ্ছে তোমার মেয়েকে

পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করা! আমার বিচার বুদ্ধি তো এই বলছে।

অগত্যা জাহ্নবী এই বিচক্ষণ ঝানু ব্যক্তির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

এর পর সিনিয়ার ইনফরমারদের আহ্বান করা হলো। পাহাড়-তলি থেকে কি ভাবে তারা সন্দেহভাজন লোকগুলির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে—সে সম্বন্ধে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের উদ্ভাবিত কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ করে তাদের উৎসাহ দিলেন। খুব কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও কৌশলী জঙ্গী কনেষ্টবলদের নিয়ে এমন একটা পলটন গড়বার ব্যবস্থা হলো—পালা করে তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে এবং ইঙ্গিত মাত্রই দু ডজন লোক সশস্ত্র বেরিয়ে পড়বে। এজন্যে কয়েকখানি জীপ ও মোটর বাইক প্রস্তুত রাখা হলো।

২৫

নির্দেশ মত প্রহরা চলল। ইনফরমারগণ পালা করে দূরে থেকে লক্ষ্য রাখে পাহাড়ের দিকে। কিন্তু কংগ্রেসী ডাকুদের কোন তৎপরতাই তাদের নজরে পড়ল না। তিন দিন এভাবে নিরুপদ্রবেই কেটে গেল, ক্রমে ইনফরমারদের উৎসাহও ঢিমে হয়ে এলো।

চতুর্থ দিনের শেষ রাত্রে অদূরবর্তী ত্রিকূটনাথের মন্দিরে মঙ্গলারতি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। এক সঙ্গে শত বজ্রপাতের এক শ্রবণভৈরব শব্দে সমগ্র পর্বত অঞ্চল কেঁপে উঠল—দেওঘর

সহর পর্যন্ত তার আবর্তে ভূকম্পের মত প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি এসে বাসীন্দাদের ত্রস্ত করে তুলল।

দূরাগত শব্দের সঙ্গে ঝাঁকুনি অনুভব করে জাহ্নবী সেই যে শয্যাত্যাগ করেন, তার পর আর চোখ বুজাতে পারেন নি। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কিছু না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ত আর নিশ্চিন্ত হতে পারেন না! অসময়েই তৈরী হয়ে ড্রয়িং রুমে বসেছেন, এমন সময় এক মোটর বাইক এসে তাঁর বাংলোর গেটে থামল। জাহ্নবী তাড়াতাড়ি উঠে বারাণ্ডায় এসেই দেখলেন—ত্রিকূট থানার জমাদার লছমন মিশ্র ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করছে।

জমাদার জানালো যে, শেষ রাতে ত্রিকূট পাহাড়ের একটা চুড়ো হঠাৎ ধ্বসে পড়েছে। সে এক ভীষণ ব্যাপার। দারোগা জায়গাটা পুলিসের লোক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন; তা ছাড়া ধ্বংসস্তূপ সরাবার জন্যে অনেক লোকজনও জমায়েত করেছেন। এখন হুজুর যে রকম হুকুম করবেন তাই হবে।

জাহ্নবী এমনি কোন খবরের প্রতীক্ষাই করছিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি মোটরে বেরিয়ে পড়লেন—পুলিস ষ্টেশন থেকে দু খানা জীপে করে এক ডজন জঙ্গী পুলিসও যাতে তাঁর পিছু পিছু আসে—সে ব্যবস্থাও করলেন।

অকুস্থানে এসে ব্যাপারটা দেখে জাহ্নবী শিউরে উঠলেন। পাহাড়ের এক দিকে যে অতলস্পর্শী খাদ, বিধ্বস্ত পাহাড়ের বিক্ষিপ্ত পাথর ও বালিতে সেটি প্রায় ভরে গেছে। খাদের উভয় পার্শ্বেও ধ্বংসস্তূপ উঁচু হয়ে উঠেছে। সেই স্তূপ সরিয়ে নিচের কিছু উদ্ধার করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের একাংশে কালো রঙের একটা বস্তু হঠাৎ জাহ্নবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করল—কতকগুলো পাথরের

ফাঁক থেকে সে বস্তুটি দেখা যাচ্ছিল। জাহ্নবীর ইঙ্গিতে জন কয়েক লোক এসে পাথর সরিয়ে সেই বিপর্যস্ত বস্তুটী উদ্ধার করে আনতেই বুঝতে পারা গেল—সেটি কালো চামড়ার একটি সুট-কেশ—পাথরের চাপে একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে।

জাহ্নবীর আদেশে তার ভিতরের জিনিষপত্রগুলো টেনে বার করা হলো। প্রথমেই বেরুল—কালো চামড়ার বাঁধানো একখানি কেতাব, উপরে ইংরাজীতে লেখা রয়েছে—মার্কস-এর কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো। জাহ্নবীর দুই চক্ষু বড় হয়ে উঠল উৎসাহে—তা হলে ত তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। বইখানা খুলতেই টাইটেল পেজে হাতে লেখা নামটি তাঁকে এবার উত্তেজিত করে তুলল। ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি পড়লেন—প্রতাপ দত্ত। বাঁকিপুর, পাটনা।

ইতিমধ্যে সুটকেশের তালা ভাঙ্গা হয়েছিল। তার ভিতর থেকে বেরুল একটা টর্চ্চ, একখানা তোয়ালে—তার কোণে লাল রঙের সুতায় ইংরাজী 'P' অক্ষরটি ক্রুশ দিয়ে তোলা। পুরানো খবরের কাগজে জড়ানো চোঙ্গার মত একটা পুলিন্দা, সাদা কাগজের একটা প্যাড, এক প্যাকেট খাম এবং খামে ভরা একখানা চিঠি।

প্রত্যেক জিনিষটি হাতে নিয়ে দেখতে থাকেন জাহ্নবী—তাঁর চোখের দৃষ্টিও ক্রমশঃ উজ্জলতর হয়ে ওঠে। লম্বা ধরণের পুলিন্দার মোড়কটি খুলতেই যে জিনিষটি বেরিয়ে এল—তাতে জাহ্নবীর নেত্র মণি-দুটির অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে সারা মুখখানাও ভরে গেল। সেদিনের সেই লুণ্ঠিত রিভলভারটিই কাগজের মোড়কের মধ্যে পুলিন্দায় পরিণত হয়েছিল। পুলিসের হাতের প্রহরণ যে কোন কারণেই হোক ডাকুর হস্তগত হোলে পুলিসের অপবাদের আর অন্ত থাকে না। সেই লুণ্ঠিত প্রহরণটি এভাবে হাতে ফিরে আসায় জাহ্নবীর মনে হলো যেন

অমূল্য এক হারাধন ফিরে পেলেন। এর পরের পর্ব—খামে ভরা পত্র। শিরোনামা পড়েই জাহ্নবীর নেত্রমণি দুটি আবার জলে উঠল যেন। খামের ঠিকানায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে কুমারী দুর্গা মিত্র পুলিস-সুপারের বাংলো, দেওঘর—ভ্রূ'দুটি কুঞ্চিত করে খামখানা ছিঁড়ে ভিতরের পত্রখানা টেনে বার করে পড়তে লাগলেন তিনি :

স্নেহের দুর্গা—

তোমার কাকা ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন—আমাকে জেলে না পুরে আর ছাড়বেন না। এর জন্যে ত্রিকূটের এই পাহাড়টাকে পর্যন্ত বেড়াজালে ঘিরে ফেলেচেন। কিন্তু আমার পক্ষে এখন নিজের চেয়ে তোমার ভাবনাটাই বড় হোয়ে উঠেছে। হৃদয়হীন অভিভাবকের নিষ্ঠুর আচরণ তোমার তরুণ মনটিকে কিভাবে ব্যথায় ভরিয়ে তুলেছে সে ত জানতে আমার বাকি নেই। তোমার বাবা কি তোমার সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা তোমার কাকার কাছে বলবার সুযোগ পান নি? কিম্বা তোমার ধড়িবাজ কাকাটি তাঁর নির্দেশ পেয়েও নিজের ইচ্ছায় তালেই তাকে অস্বীকার করছেন! যদি আমার প্রথম অনুমান সত্য হয়, তাহলে অভিভাবকরূপে তোমার কাকা তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করবেন, নির্বিচারে তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে—আমিও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব না। এক্ষেত্রে তোমার বাবার উপদেশ আমাদের উভয়কেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে—'শিক্ষা কখনো গুরু বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেয় না—সত্যকার শিক্ষার আলো শিক্ষিতকে দেয় সত্যের সন্ধান, স্বেচ্ছাচার তার চিত্তকে অভিভূত করতে পারে না।' আমরা যখন শিক্ষার অভিমান করি, গুরুর নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করব—গুরুজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুলব না। আর—যদি আমার দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয়, তাহলে

আমাদের সত্যাশ্রয়ী গুরুর অন্তরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—তোমার কাকা শত চেষ্টা করলেও তাঁর ইচ্ছা কখনই সিদ্ধ করতে পারবেন না; কারণ তিনিই এক্ষেত্রে সত্য ভঙ্গ করছেন। সত্যভ্রষ্টকে সত্যের সন্ধান দিতে—সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে তখন যদি আমরা শঠতাকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করি, তাতে কোন অপরাধই আমাদের হবে না। এক্ষেত্রে সাধারণ অহিংসা নীতি মেনে নিয়ে কখনই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করব না। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পীঠভূমি ভারতের ঋষিরা অহিংসার যে ব্যাখ্যা করেছেন, গুরুদেবের চরণতলে বসে আমরা অহিংসার যে মন্ত্র শুনেছি,—এ-অবস্থায় আমরা তারই অনুসরণ করব। জীবনের উচ্চ আদর্শ শান্তি; সেই শান্তিই আমাদের কাম্য। কিন্তু শান্তিরক্ষার এই অর্থ নয় যে, ক্ষমতাদর্পে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে কোন স্বেচ্ছাচারী অধর্মাচারী হোলে তার অনাচারের তলায় আত্মসমর্পণ করে জানাতে হবে—'দেখ, আমাদের মনে মোটেই হিংসা নেই, আমরা মার খাচ্ছি, কিন্তু তার প্রতিরোধের জন্যে আঙুলটিও তুলছিনে!' একে অহিংসা বলে না—এর নাম আত্মপ্রবঞ্চনা, দুর্বলতা। এ নীতি বিড়াল তপস্বীর মর্মকথাই মনে করিয়ে দেয়।—'মেরেছ কলসীর কাণা, তা' বলে কি প্রেম দিব না!'—অহিংসার এই খাঁটি মন্ত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষের মুখ থেকেই বেরুতে পারে। তাঁর অহিংসা-মন্ত্রের জোরে হিংস্র হিংসা ভুলে তাঁরই চরণতলে আত্মসমর্পণ করত। তাঁর অহিংসা মানেই হিংসাকে বারণ করা—জয় করা, পাপীকে নিষ্পাপ করে মুক্তি দেওয়া; তাঁর কাছে ছিল সবাই সমান। মহাপ্রভুর আসল অহিংসার নকল করে আজ দেশবাসীকে নাকাল করাই হচ্ছে। তাই আমাদের গুরুদেব এর প্রতিবাদ করে এসেছেন বরাবর; তিনি বলতেন—কোন রকম দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়;

সংগ্রাম ও শান্তি উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে, আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামর্থ সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক। দল বল কৌশল—কোনটিই উপেক্ষার বস্তু নয়, প্রত্যেকটির সার্থকতা প্রচুর। এইগুলি ভাল করে বিচারের পর আমাদের কর্তব্য স্থির করতে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে এই লম্বা চিঠিখানা তোমার জন্যে লিখেছি। ডাকে না পাঠিয়ে এমন কোন সুচিন্তিত উপায়ে পাঠাতে চাই—যাতে তোমার কাকার দৃষ্টি অতিক্রম করে তোমার হাতে পড়ে। যখন এ চিঠি তুমি পাবে—আমার কাজ তখন সুরু হয়ে গেছে। আজ এই পর্যন্ত।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—প্রতাপ

ইনেসপেক্টর, থানাদার, জমাদার ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দার দল জাহ্নবীকে পরিবেষ্টন করে ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত বস্তুগুলিকে নিয়ে গবেষণা সুরু দিয়েছে তখন।

সকলেরই স্থির বিশ্বাস যে, যাদের পিছনে কদিন ধরে পুলিস ফিরছিল, শ্যেনের মত তাকিয়ে ছিল যাদের উদ্দেশে—তারা সকলেই খাদের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে পরিচিত বস্তুগুলি পেয়েও জাহ্নবী আশ্বস্ত হতে পারেননি, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের দেহগুলি খুঁজে বার করবার জন্য তিনি কতকগুলি মজুর লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সে স্থানটি এমনি পিচ্ছিল আর সংকীর্ণ যে, পাশাপাশি দুটিলোকের সেখানে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করবার উপায় নেই। অনেক চেষ্টার পর ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে চূর্ণবিচূর্ণ কিছু কিছু দেহাবশেষ তারা উদ্ধার করতে সমর্থ হলো বটে, কিন্তু সেগুলি এমনি বিবর্ণ, বিকৃত ও পিষ্ট

হয়েছিল যে, দেখে শুধু শিউরে উঠতে হয়—সেই সব ছিন্নবিছিন্ন বিবর্ণ দেহাংশ থেকে দেহধারীর মূর্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। মাড়াই-কলে পেষা আখের খণ্ডের মত অবস্থাপন্ন একখানা ছিন্ন হস্ত বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আশ্চর্য্য, সেই পিষ্ট হাতখানির প্রকোষ্ঠে বাঁধা 'রিষ্টওয়াচ'টি সামান্য একটু ঘা খেয়ে এমনিভাবে হাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে, হাড় থেঁতো হয়ে গেলেও সেটি ভাঙেনি। ছুরির সাহায্যে ঘড়িটা কোন রকমে হাড় কেটে বার করে নেওয়া হলো; যখন দুর্ঘটনা ঘটে—ঠিক সেই সময়টিতে কাঁটা যে বন্ধ হয়ে যায়—চারটের ঘরে কাঁটা দেখেই সেটা উপলব্ধি হলো। ঘড়িটা প্রাপ্ত বস্তুগুলির সঙ্গে রাখা হলো। তারপর বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্র করে পরীক্ষার পর এই সাব্যস্তই সকলে করলেন যে, দেহাংশগুলি মিলিয়ে একটি লোকের দেহ বলেই মনে হচ্ছে। দুখানা হাত আর দুটো পা ছাড়া আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে তা থেকে কিছুই অনুমান করা যায় না।

ইনেসপেক্টর, থানাদার, ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দার দল পাহাড়ের একটা সমতল ও নিরাপদ স্থলে জাহ্নবীকে পরিবেষ্টন করে এই সব গবেষণা করছিলেন।

সকলেই শেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করলেন যে, একটি লোক যখন সুটকেশটা নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের চূড়োটা ধ্বসে পড়ে। লোকটা খাদের ভিতরে না' পড়ে বাইরেই ছিটকে এসে পাথরের চাপে পিষে যায়; সুটকেশটাও ঠিকরে অন্য দিকে পড়ে। বাকি যে সব লোক ছিল, তারা খাদের ভিতরেই চাপা পড়েছে। কেউ যে বাইরে আসতে পারেনি, তাতে কোন ভুল নেই। তার কারণ, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে টহলদাররা সবাই এসে পড়েছিল, কাউকে তারা পালাতে দেখেনি।

এরপর চাপাপড়া মানুষগুলোকে খাদের ভিতর থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় যে সব মজুরকে লাগানো হয়েছিল, তারা আরও খানিকক্ষণ কাজ করে শ্রান্ত হয়ে এক বাক্যে অক্ষমতা জানালো। বাস্তবিকই, সেই সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল স্থানে দাঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ অতলস্পর্শ খাদের গহ্বর শূন্য করা কিছুতেই সম্ভবপর নয় এবং একাজ দশ বিশ জন লোকের দ্বারা সদ্য সদ্য উদ্ধারের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। গতিক দেখে, জাহ্নবী নিজেই তাদের নিরস্ত করতে বাধ্য হলেন।

ইতিমধ্যে মোটর নিয়ে এক আরদালি রোহিণীতে গিয়েছিল বিপিনবাবুকে অকুস্থলে আনবার জন্য। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই তিনি এসে পড়লেন। রোহিণী থেকে তিনিও ভীষণ আওয়াজ শুনে উদ্বিগ্ন-ভাবেই রাতটুকু কাটিয়েছিলেন। দুর্গম ঘটনাস্থানটি তিনি এই বয়সেও যুবকের উদ্যমে পরিদর্শন করলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে নোট বুকে টুকে নিলেন, টহলদারদের মুখ থেকে সব শুনলেন। আওয়াজের সময়টা তিনি নিজেই, ঘড়ি দেখে লিখে রেখেছিলেন, ভাঙা হাতের কব্জির হাড়ের সঙ্গে জড়ানো হাত-ঘড়ির সময়টাও দেখলেন—এক সেকেণ্ডও তফাত নেই!

জাহ্নবীকেও তিনি আড়ালে ডেকে সেদিনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। সেই সঙ্গে দুর্গার কথাও বাদ গেল না। দুর্গার নামে লেখা চিঠি খানা পড়তে পড়তে তার সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি জেনে নিলেন। এর পর বিপিনবাবু বললেন: এ ব্যাপারটা কিন্তু চেপে যেতে হবে জাহ্নবী। অফিসিয়ালি কিভাবে রিপোর্ট করতে হবে, সে কথা আলাদা; কিন্তু বাইরের কেউ কিছু যেন জানতে না পারে। আর একটা কথা, বাড়ীতেও আসল ব্যাপারটা উপস্থিত চেপে রাখবে—পাহাড় ধ্বসে পড়েছে, এ ছাড়া কিছু বলবে না।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে জাহ্নবী বললেন: ভাবছি কেবল, ছোঁড়াটার অবস্থা শেষে দাঁড়ালো—From the frying pan to the fire!

মুখখানা দৃঢ় করে বিপিনবাবু বললেন: এমননিই অনেক হ'তে দেখেছি; চলতি কথাও আছে—ডানপিটের মরণ গাছের ডালে!

সহরবাসী সেদিন সকলেই শুনল যে, ত্রিকূট পাহাড়ের একটা মস্ত চুড়ো ধ্বসে পড়েছে, আর তার চাপে একটা বিরাট খাদ ভরে গেছে। খবরের কাগজগুলিতেও ঠিক এই খবরটি বড় বড় অক্ষরে ছেপে বেরুল।

এরপর সাত দিন কেটে গেছে। সেদিন অপরাহ্নে চায়ের টেবিলে বসে জাহ্নবী হঠাৎ পকেট থেকে একটা হাত-ঘড়ি ও একখানা রুমাল বার করে টেবিলের উপর রাখলেন।

সুহাসিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘড়িটার পানে চেয়েই বলে উঠলেন: ওমা, ঘড়িটা অমন করে চেপ্টে গেল কি করে?

জাহ্নবী বললেন: হঠাৎ এটা এইভাবেই পাওয়া গেছে। এখানে আনা হয়েছে সোনাক্ত করতে। দুর্গা, দেখ ত—এটা চিনতে পারছ কিনা?

বলেই ঘড়িটা তিনি ঠেলে দিলেন একটু তফাতে টেবিলটার কোনের দিকে—যেখানে বসে দুর্গা নিবিষ্টমনে চায়ের পিয়ালায় তৈরী চা ঢালছিল।

দুর্গা ঘড়িটার পানে একটিবার চেয়েই বলল: ওটা ত প্রতাপদার ঘড়ি বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখানে এভাবে কেন এল কাকাবাবু?

জাহ্নবী লক্ষ্য করলেন, দুর্গার মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়েছে। মুখখানা তাঁর প্রসন্নই হলো কথাটা শুনে; পরক্ষণে পকেট থেকে রুমালখানা বার করে তার একটা কোণ—যেখানে সূঁচ দিয়ে লাল রেশমে ইংরাজী P অক্ষরটি তোলা হয়েছে—সেটি প্রসারিত করে দেখিয়ে

বললেন : তা হ'লে এটাও নিশ্চয়ই তোমার হাতে তোলা, আর এই রুমালখানিও সেই হতভাগার ?

দুর্গার মুখখানা তখন একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে! শুষ্কস্বরে সে উত্তর করল : হ্যাঁ।

কিন্তু এরপর আর কোন প্রশ্ন সে করল না। তার কারণ, জাহ্নবী তার আগের প্রশ্নের উত্তর এখনো দেননি। আর একবার সে জাহ্নবীর মুখের দিকে শুধু চাইল—সেই দৃষ্টিই যেন পুনরায় প্রশ্নটা করল— ব্যাপারটা কি ? পরক্ষণেই সে কাকাবাবুর দিকে চায়ের বাটি এগিয়ে দিল। জাহ্নবী নিরুত্তরে চায়ের পিয়ালাটি মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

সুহাসিনী বললেন : কি ব্যাপার শুনি ?

গম্ভীর মুখে জাহ্নবী উত্তর করলেন : দিন সাতেক আগে ত্রিকূট পাহাড়ের একটা চুড়ো ভেঙে পড়েছিল শোননি—এ দুটো জিনিস সেখান থেকেই পাওয়া গিছে কিনা, তাই দুর্গাকে দেখাচ্ছিলাম।

সকলকে চা পরিবেষণ করে দুর্গা তখন নিজের পিয়ালিটি সামনে টেনে নিয়ে মুখের কাছে তুলেছে; জাহ্নবীর কথাটা শুনেই তার হাত থেকে চা-শুদ্ধ পাত্রটি নিচে পড়ে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না।

জাহ্নবী তার মুখের দিকে চেয়ে রুক্ষস্বরে বললেন : এতটা বিচলিত না হলেও তুমি পারতে! ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে এত সহজেই তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

সুহাসিনীর মুখখানাও তখন ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, দুই চোখে সংশয় ভরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তাহলে কি তুমি বলতে চাও— রুমাল আর ঘড়ি সেখানে পাওয়া গেছে বলে……

জাহ্নবীই তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন : রুমাল আর ঘড়ির সঙ্গে কতকগুলো হাড় মাংসও পাওয়া গিয়েছিল কিনা, তবে তা থেকে মানুষটাকে চেনবার কোন উপায় ছিল না। ঘড়িটা অবিশ্যি হাতের হাড়ের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। ঘড়ি থেকে মানুষটাকে চেনা যাবে ভেবেই দুর্গাকে দেখাতে এনেছিলাম। তাছাড়া দুর্গার নামে একখানা চিঠিও পাওয়া গেছে ঐ সঙ্গে—সেই চিঠিই হলো গোড়া।

চোখদুটো কপালের দিকে তুলে সুহাসিনী বললেন : চিঠি!

পকেট থেকে সেই চিঠি বার করে জাহ্নবী বললেন : এই চিঠিখানি ঐ পাহাড়ে বসেই সে দুর্গাকে লিখেছিল ; কিন্তু তদন্ত ব্যাপারে এখানা পুলিসের হাতে পড়ায় আর মালিকের হাতে আসেনি। তোমাদের সামনেই চিঠিখানি পড়ছি—এ থেকেই সব বুঝতে পারবে, আমাকে আর খুলে বলতে হবে না।

লিফাফার ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করে জাহ্নবী পড়তে লাগলেন। পড়ার পর পুনরায় খামের মধ্যে ভরে পকেটে রাখলেন।

দুর্গা সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একইভাবে বসে—চোখে মুখে কোন চাঞ্চল্য নেই, একটি স্বরও ফুটে বেরুল না—এক ফোঁটা অশ্রুও গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল না ; যেন নিষ্প্রাণ মর্ম্মর প্রতিমা!

জাহ্নবী বললেন : চিঠিখানা লিখেই বোধ হয় গুহা থেকে বেরুচ্ছিলেন বীরপুরুষ—রাতারাতি বিলি করবার মতলবে। ঠিক সেই সময়েই পাহাড়ের চুড়ো ধ্বসে পড়ে ; কাঁটায় কাঁটায় রাত চারটের সময় এই কাণ্ড ঘটে,—আর ঐ ঘড়ির কাঁটাও চারটের ঘরে গিয়েই বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই সন্দেহ করবার আর কিছু নেই। তাই দেহের চুর্ণ অংশগুলো অকারণ সোনাক্ত করবার প্রয়োজন মনে করিনি—পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। . . .

স্থির ধীর মর্মর মূর্তিটি এবার নড়ে উঠল—চেয়ার থেকে উঠে দুহাতে মুখখানা চেপে টলতে টলতে দুর্গা ভিতরে চলে গেল।

বিকৃত মুখে শ্লেষের সুরে জাহ্নবী বললেন: এই সোনার প্রতিমাকে দাদা কিনা ঐ ডানপিটে ছুঁচোটার হাতে তুলে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন! ভাগ্যই রক্ষা করেছে।

সুহাসিনী বললেন: হোক ডানপিটে, কিন্তু ছেলের মত ছেলে ছিল—তোমার মত জবরদস্ত পুলিস সাহেবকেও বেকুব বানিয়ে ছেড়েছিল ত! তা, কেউ কোথাও তার আছে কিনা, তার খোঁজ খবর করেছিলে?

জাহ্নবী বললেন: ইচ্ছা ত ছিল জানবার, কিন্তু যে জানাবে, সে ত ফুলকোমুণী হয়ে উঠে গেলো!

পরদা ঠেলে মিশিরজী ঘরে ঢুকে মিলিটারী কেতায় সেলাম করে একখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখল।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই মিশিরজী বলল: দুমকাকা জমিন্দার অদ্বৈত বাবুসে খত আয়া; এক সাঁওতাল লেড়কা নে লায়া—হুজুরকা হুকুম হো তো অন্দর লাঁয়ে।

জাহ্নবী বললেন: আচ্ছা, আব তুম বাহার যাও, জরুরৎ পড়নেসে ফের বুলায়েঙ্গে।

সেলাম করে মিশির চলে গেল।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন: জমিদার অদ্বৈতবাবু—সে আবার কে? নাম ত শুনিনি।

জাহ্নবী বললেন: শুনবে কোথা থেকে, শোনাবার ফুরসদই পাইনি যে! সেই কথাই চৌধুরী মশাই লিখেছেন, শোনো—

বলেই চিঠিখানা তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন:

প্রিয় জাহ্নবী বাবু,

দেওঘরে গিয়ে পুলিস সুপারের কাজের ভীড়ে এ বেচারীকে বোধ হয় ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে ভুলিনি, আপনার কথা প্রায়ই ভাবি, সেই সঙ্গে সব খবরও আপনার রাখি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আপনাদের মত সন্ধানী দৃষ্টি যদিও আমাদের নেই, কিন্তু মানুষ চেনবার ও মানুষকে তৈরী করবার মত কিছু কিছু ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। সম্প্রতি আমার হাতে একটি চমৎকার ছেলে এসেছে। আমি তাকে যাচাই করে দেখলুম যে, আপনার মত রত্নাকরের কাছেই এই রত্নের কদর হবে। নাম এর—বিচ্চু। দেখলে মনে হবে, বারো বছরের বালক, কিন্তু এখন এর বয়স চলেছে আঠারো। আপনার কাছে পাঠাচ্ছি এই ভেবে যে;—একে দিয়ে অনেক কিছুই আপনি করিয়ে নিতে পারবেন। তবে ছেলেটা বোবা—কথা বলতে পারে না, কিন্তু সব কথা বোঝে, আর ইশারায় নিজের কথা বোঝাতেও পারে। ভাল করে তালিম পেলে, এ ছোকরা অনেক পাকা গোয়েন্দার ওপরে যাবে দেখবেন। কেমন লাগল একে, জানালে সুখী হব। নমস্কার।

আপনার হিতৈষী

শ্রীঅদ্বৈত চৌধুরী

সুহাসিনী মৃদু হেসে বললেন: ঠিক লোকই এবার মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাকে ভগবান! খবর ফাঁস হবার আর ভয় থাকবে না, গোয়েন্দাগিরি চলবে ভাল। শেষে না বাড়ীখানা পাগলা গারদ হয়ে ওঠে!

জাহ্নবী গম্ভীর মুখে বললেন: যে লোক পাঠিয়েছেন, তাঁর হিসেবে ভুল হতে পারে না—ছোকরার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন পদার্থ আছে, নৈলে অদ্বৈত চৌধুরী তাকে আমার কাছে কখনই পাঠাতেন না।

সুহাসিনী বললেন: কোথায় তোমার বিচ্চু, আনাও না—চেহারা-খানা দেখি।

জাহ্নবী মিশিরকে ঘর থেকেই হুকুম করলেন: মিশির, লেড়কা কো হিঁয়া ভেজ দো। পরক্ষণেই মিশিরজী কালো কষ্টি-পাথরে গড়া নিটোল একটি মূর্তির মত অপরূপ এক বেঁটেখেঁটে ছোকরাকে নিয়ে পরদার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল এবং মিশিরজীর চেয়েও ক্ষিপ্র ও সুষ্ঠু কেতায় খর্বদেহ বাঁটুল ছেলেটি কেদারায় আসীন হুজুর ও হুজুরাইনকে সেলাম করল।

মানুষের গায়ের রঙ নিকষ কালোর কত ডিগ্রী উঁচুতে উঠতে পারে, এই ছেলেটির চামড়া যেন তার একটা রেকর্ড রাখার মত নমুনা দেখিয়ে দিয়েছে। পুলিস সুপার জাহ্নবী ত সমগ্র সাঁওতাল পরগণা তছনছ করে বেড়িয়েছেন, কিন্তু মানুষের গায়ের বর্ণ যে এমন চিকন কালো এবং এতখানি বিচিত্র হতে পারে, এর আগে তিনিও বুঝি সেটা অনুভব করতে পারেননি; তাই সস্ত্রীক নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ছেলেটির পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন শুধু। গায়ের রঙের সঙ্গে ছেলেটির মাথার কালো কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলিরও কোন পার্থক্য নেই—গায়ের রঙ ও মাথার চুলের চেহারা যেন একই জাতের, দিব্যি মিশে গেছে। তবে তার পুরু পুরু দুটি ঠোঁট কিন্তু এদের সঙ্গে মিতালি করেনি—কে যেন তুলি চালিয়ে ঠোঁটের মুখে মেজেণ্ডার লাল রঙ এক পোঁচ ছাপ ধরিয়ে দিয়েছে। দেহের তুলনায় মুখখানা বেশী ভারি, মুখের ভিতরটাও অপেক্ষাকৃত বড় ও বিস্তৃত; এত বড় যে—বদনখানি ব্যাদন করে হাসলেই ভিতরের দাঁতের পাটি দুটো সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। চিবুকটিও বেশ পুরন্ত, ভুরু দুটি কিন্তু কেশ বিরল—দুটি অস্থিখণ্ড ভ্রূর উপরস্থ কালো চামড়া উঁচু করে তুলে ধরেছে। নাকটিও দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক মোটা;

চোখ দুটি ছোট ছোট হলেও অদ্ভুত রকম তীক্ষ্ণ; দেহখানি লম্বায় খাটো—বহর কিন্তু দীর্ঘতার তুলনায় বেশী চওড়া। চৌধুরী মশায়ের চিঠির বর্ণনার সঙ্গে বয়সটি মিলে গেছে—মনে হয় এখনো বারো পার হয়নি। পরনে তার খাঁকি রঙের হাফ প্যান্ট, গায়ে নীল রঙের একটি পুরো হাতা সোয়েটার, পায়ে রঙ-বেরঙের বনাতে বাঁধা পটি; জুতা ব্যবহারেও নিশ্চয়ই অভ্যস্ত, কিন্তু সাহেবের ঘরে আসবার আগেই বাইরে ছেড়ে এসেছে। মাথায় খাঁকি রঙের একটা মিলিটারী প্যাটার্ণের টুপি বাঁকা করে পরেছে। ছেলেটার মুখমণ্ডলে একটা চঞ্চল প্রতিভা যেন ফুটি-ফুটি করছে।

জাহ্নবী খুশী হলেন ছেলেটিকে দেখে, কিন্তু সুহাসিনীর মুখে বিরক্তির ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। চাকর বাকর বেশী রকম চালাক চতুর বা ফাজিল হয়, তিনি সেটা পছন্দ করেন না। ছেলেটিকে দেখেই তাঁর মনে হলো, মুখখানা তার যেন দুষ্টুমী মাখানো—চোখ দুটি যেন খটাসের চোখের মতন চকমক করে জ্বলছে। এরকম ছেলেকে সংসারের ভিতরে রাখা ঠিক নয়। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না—মনের কথা ভাঙলেনও না স্বামীর কাছে।

জাহ্নবী ছেলেটিকে হিন্দী ও বাংলায় নানারকম প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি মোটেই দমল না, বা তাঁর মতন রাশভারি পুলিস অফিসারের সামনে কিছুমাত্র শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হলো না—দিব্যি ঈশারায় হাত মুখ ও চোখের তারা দুটো ঘুরিয়ে প্রত্যেক প্রশ্নটির ঠিকঠিক জবাব দিল। এ অবস্থায় স্বামি-স্ত্রী উভয়েই চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না। আর মিশিরজী দরজার উপর টাঙানো পরদাটির পীঠে পীঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে উঠল: ক্যা তাজ্জব হ্যায়!

সত্যই বেচারা বিশ বছর ধরে পুলিসে নকরী করছে কিন্তু সেও এমন

করে এলেম দেখাবার হিম্মত রাখে না—তবুও এ ছেলিয়া ত কথা বলতে পারে না !

যাই হোক, জাহ্নবী খুশী হয়ে বিচ্ছুকে তাঁর বেয়ারার পদে বাহাল করলেন। স্থির হলো, বিচ্ছু সাহেবের বাঙলোতেই থাকবে। আর খোরপোশ ছাড়া পনেরো টাকা করে মাইনে পাবে ; ভাল কাজ করতে পারলে, বছরে বছরে মাইনে বাড়বে।

বিচ্ছু আহ্লাদে আটখানা হয়ে মুখের উপর নিচের দুপাটির বত্রিশ-খানি দাঁত পুরোপুরি বিকাশ করে তার সম্মতি জানালো।

২৫

বিহার প্রদেশের নামজাদা জমিদারদের মধ্যে অদ্বৈত চৌধুরী অন্যতম। চৌধুরীবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল প্রতিপত্তির খ্যাতি প্রদেশবাসী কারও অবিদিত নয়। লোকে বলে, লাঠিবাজীতে তিনি যেমন বেপরোয়া, মামলাবাজীতেও তেমনি তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা। সাঁওতাল-পরগণায় যে সময় ডাকাতির হিড়িক পড়ে, এবং জেলার পুলিসসাহেব মিঃ হুইলার জাহ্নবী মিত্রের উপর দস্যুদলনের ভার অর্পণ করতে বাধ্য হন, সেই সময়েই অদ্বৈত চৌধুরীর সঙ্গে জাহ্নবী মিত্রের রীতিমত একটা সংযোগ ঘটেছিল। এর পিছনে একটা রহস্যময় কাহিনীও আছে—এঁরা দুজন ছাড়া আর সকলেই সে সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

জাহ্নবীর ভাগ্যাকাশে তখনো অরুণোদয় হয়নি—দু'মাস আগে

একটা থানার ভার পেয়েছেন মাত্র। তবে তাঁর চেহারা, বাকপটুতা আর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্ম তখনই হুইলার সাহেবের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। রামভরসা চৌবে নামে এক বিহারী তখন সিনিয়ার ইন্‌সপেক্টরের পদে বাহাল ছিলেন। যেমন তিনি আত্মম্ভরী, তেমনি বাঙ্গালীকে তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। শোনা যায়, তাঁর পিতা মহাবীর চৌবে পাটনার এক নামী বাঙ্গালী উকীলের অধীনে মুহুরীগিরী ক'রে নিজে যেমন প্রতিষ্ঠা পান, পুত্র রামভরসাকেও তেমনি বাঙ্গালী প্রভুর সাহায্যে ও সুপারিশে পুলিস-বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ সুবিধা করে দেন। মহাবীরের মনে কি ছিল, সেটা বাইরের কেউ জানতে পারেনি বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কোনদিন খাপ্পা হ'তে দেখেনি, বা বিহারীদের শ্রীবৃদ্ধি ও কৃষ্টিগত উন্নতিলাভে সহায়ক স্বরূপ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় কথা বলতেও কেউ কোন দিন শোনে নি। কিন্তু রামভরসা দারোগার পদ পেয়ে পাটনা থেকে দুমকায় বদলী হয়ে এসেই মুখোসখানা খুলে ফেলে দিয়ে যে মুখখানা দেখালে, তা থেকে কারণে অকারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের-বিষ নিঃসৃত হোতে থাকে। চৌবেজীর মতে বাঙ্গালীরা একেবারে অকর্মা, কেবল বড় বড় কথা বলতে আর দল পাকাতেই ওস্তাদ, ওদের গায়ের বাতাস লেগে বিহারীদের দেহে মনে ঘুণ ধরতে সুরু করেছে, বিহারীদের জন্তেই বাঙ্গলার পুলিস বিভাগ চলছে; অথচ এমনি তাজ্জব যে, পুলিসের পাহারাওয়ালা হবারও যোগ্যতা যে জাতের নেই, সেই জাতের কত লোক পুলিস-বিভাগে উপরওয়ালা হয়ে জেঁকে বসে আছে! আইন করে এদের সরিয়ে দেওয়া সরকারের উচিত। পুলিস-বিভাগে কোন বাঙ্গালীকে দেখলেই চৌবেজীর মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে। সবার সামনেই মন্তব্য করেন, পুলিসের কাজে এ জাতটাই একেবারে অযোগ্য।

কথাগুলি অদ্বৈত চৌধুরীর কাণে যায়। এ ব্যাপারে যেমন বুনো ওল চৌবেজী, তেমনি বাঘা তেঁতুল অদ্বৈত চৌধুরী। এই চৌবে পরিবারের হাড় হর্দ্দ তিনি জানতেন; পক্ষান্তরে তাঁর স্বজাত্যপ্রীতিও কোন অংশেই চৌবেজীর চেয়ে কম নয়। তবে মুখের কথা দিয়ে কোনদিনই তিনি নিজের জাতকে বাড়াবার চেষ্টা করেননি, কিম্বা ভিন্ন জাতের মানুষগুলোকেও অমানুষ প্রতিপন্ন করতে কখনও কোমর বাঁধেন নি। অথচ, বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের তিনি যে কত বড় সহায়, খুব কম লোকেই সে পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন। চৌবেজীর বাঙ্গালী বিদ্বেষ চৌধুরী মহাশয়ের অবিদিত নয়; বাঙ্গালীর কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েও এই লোকটা যে-ভাবে অকারণ বাঙ্গালীদের কুৎসা অবাধে প্রচার করে চলেছে, কোনদিক দিয়েই সেটা সমর্থন-যোগ্য নয়। অথচ, অবিলম্বেই এর প্রতিকার প্রয়োজন। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

এমন সময় দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের প্রাদুর্ভাবে দুমকা সহর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। হুইলার সাহেব রামভরসা চৌবেজীকে তাড়া দিলেন—অবিলম্বে দস্যুদের গ্রেপ্তার করা চাই। কিন্তু বিস্তর হাঁক ডাক করে এবং পুলিস পণ্টন নিয়ে সহরময় টহল দিয়েও চৌবেজী ডাকাতির কোন কিনারাই করতে পারলেন না। দস্যু বিভীষিকা বরং বেড়েই চলল—চৌবেজীর অকর্ম্মণ্যতাই পদে পদে প্রতিপন্ন হতে থাকল। ফলে, হুইলার সাহেব একদিন পুলিস থানায় এসে সকলের সামনেই তাঁকে অপদার্থ বলে ধমক দিলেন। চৌবেজী সাহেবের বুট স্পর্শ করে জানালেন: কোন রকম গাফিলিতি আমি করিনি হুজুর, কিন্তু ডাকুরা এমনি শয়তান যে, কিছুতেই তাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন হুজুর যদি পাটনা থেকে একজন শক্ত গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টরকে দুমকায় আনান, তাঁর সাহায্য পেলে ডাকাতদের গিরেফ্‌তার করা আমার পক্ষে সহজ হবে।

এর আগেই কোন একটা তদন্তের ব্যাপারে জাহ্নবীর সঙ্গে হুইলার সাহেবের জানাশোনা হয়েছিল—জাহ্নবীকে সাহেব তখন সুনজরেই দেখেছিলেন। সাহেবই জাহ্নবীকে চুমকায় আনেন ও একটা থানার ভার দেন তাঁর উপরে। এ ব্যাপারে চৌবেজীর কি আস্ফালন! সাহেব কিনা নিজেই সুপারিশ করে একটা অকর্মা বাঙ্গালীকে এনে তারই হাতে দিলেন থানার চার্জ!

আবার অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, চৌবেজীর প্রার্থনা মত শক্ত ও পাকাপোক্ত যে ইন্সপেক্টরকে সাহেব ডাকাতী ব্যাপারে অতিরিক্ত স্পেশাল অফিসার রূপে বাহাল করলেন, তিনিও সেই বাঙ্গালী ইনেসপেক্টর জাহ্নবী মিত্র!

চৌবেজীর মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ল—ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে তিনি গুম্ হয়ে রইলেন; জাহ্নবীর সঙ্গে ভাল করে আলাপ পর্যন্ত করলেন না। জাহ্নবীও বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে বিস্ময় কেটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে অদ্বৈত চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তাঁর মুখে চৌবেজীর ইতিবৃত্ত সব শুনে। জাহ্নবী বুঝলেন—অদ্বৈত চৌধুরীর প্রচুর প্রতিপত্তি, দেশের অনেক খবর রাখেন, ডাকাতি ব্যাপারে অনেক সাহায্যই তাঁর কাছে পাওয়া যাবে। অদ্বৈত চৌধুরী বুঝলেন—জাহ্নবী মিত্রের জেদ আছে, ক্ষমতা আছে, লোকটা নির্ভীকও বটে; তবে স্বজাত্য-প্রীতি বা দেশাত্মবোধের কিছুই নেই লোকটির মধ্যে। তা হলেও এই মানুষটিকে দিয়েই চৌবেজীর দম্ভ ভেঙে দিয়ে তাকে জানাতে হবে—বাঙ্গালীর ক্ষমতা কতখানি। কথায় কথায় কথাটা তিনি খুলেই বললেন জাহ্নবীকে। বাঙ্গালীকে কেউ অকর্মা বললে তিনি সহ্য করতে পারেন না। এই রামভরসা চৌবে এখানে এসে অবধি বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করছে খালি মুখের কথায়; তিনি তাকে হাতে কলমে বাঙ্গালীর হিম্মত

দেখিয়ে দিয়ে জানাতে চাইলেন যে, তার কথা সব বাজে—বাঙ্গালীকে খাটো করতে সে যা বলেছে—একেবারে উল্টো হয়ে গেছে।

তুমকার জাহ্নবীর বসবাসের ব্যবস্থা অদ্বৈত চৌধুরীই করে দিলেন তাঁর নিজের একখানা বাড়ীতে। স্থানটি নিরিবিলি, অথচ সুরক্ষিত। অদ্বৈত চৌধুরীর তাঁদের লোকজনদের কুস্তি-কসরতের আখ্‌ড়াও এইখানে—পুলিস পাহারার উপরে আখড়ার পালোয়ানরাও বাড়িখানাকে সর্বক্ষণ যেন ঘিরে রাখে। চৌধুরীমশাই জাহ্নবীকে দৃঢ়তার সঙ্গে এমন আশ্বাসও দিলেন যে, দরকার পড়লে তাঁর লোকজনও জাহ্নবীকে ডাকাত-ধরার ব্যাপারে রীতিমত সাহায্য করবে, কিন্তু সে কথা বাইরের কেউ জানবে না। তাঁর একান্ত ইচ্ছা এই যে, কাজটা হাসিল করে জাহ্নবী রামভরসা চৌবের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেন, আর সরকারের কাছে তিনিও বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। বিহারে বাঙ্গালীর খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাই চৌধুরী মশায়ের কাম্য, তাতেই তাঁর আনন্দ। প্রথম প্রথম জাহ্নবী অদ্বৈত চৌধুরীর কথাগুলি শুনে মনে মনে কৌতুক বোধই করছিলেন। বে-সরকারী লোক পুলিসকে সাহায্য করে সাফল্যের পথ খুলে দেবে—এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা আর কি হতে পারে! কিন্তু কাজে নেমে অল্প দিনের মধ্যেই জাহ্নবী বুঝতে পারলেন, তাঁর কথাগুলির প্রতিটি সত্য। এই অদ্ভুত মানুষটির সাহায্যের উপরেই সর্বতোভাবে তাঁর সাফল্য নির্ভর করছে।

একদা একটা দস্যুদলের সন্ধান পেয়ে জাহ্নবী একদল পুলিস কনেষ্টবল নিয়ে পার্ব্বত্যঅঞ্চলে দস্যুদের আস্তানায় হানা দেন। কিন্তু সতর্ক দস্যুদল গুপ্তপথে এমন অশঙ্কিতভাবে জাহ্নবীকে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, সদলে মৃত্যু ভিন্ন তাঁর নিষ্কৃতির আর কোন উপায় ছিল না। সেই চরম সংকটে দৈব প্রেরিতের মতই অদ্বৈত চৌধুরীর পাইকরা এসে জাহ্নবীকে উদ্ধার করে—দস্যুদলও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু

এতবড় একটা শৌর্য্যাত্মক কাজ করেও অদ্বৈত চৌধুরী সাফল্যের কোন অংশই দাবী করেন নি। বরং, তিনিই এই ব্যাপারটির যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত করবার জন্য জাহ্নবীকে প্ররোচিত করেন, শেষ পর্যন্ত সেইটিই অসামান্য কৃতিত্বের বিবরণীরূপে জাহ্নবী মিত্রকে প্রশংসিত করে তোলে। সে বৃত্তান্তটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রকাশিত হয় যে, দুঃসাহসী পুলিস ইনেসপেক্টর জাহ্নবী মিত্র কতকগুলি কনেষ্টবল নিয়ে দুমকা পাহাড়ের এক দুর্গম স্থানে কুখ্যাত একটি দস্যুদলের ঘাঁটিতে হানা দেন। দস্যুগণ পরক্ষণেই গুপ্ত পথে তাদের ঘাঁটি থেকে নির্গত হয়ে জাহ্নবী মিত্রের সহিত তাঁর রক্ষীদিগকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, দস্যু-দের হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তাঁদের আর নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। কিন্তু সেই সময় তৃতীয় একটি সশস্ত্র দল চারদিক দিয়ে দস্যুদের পরিবেষ্টন করায় নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন জানা যায়, বিচক্ষণ মিত্র মহাশয় পূর্ব থেকেই এই দলটিকে গোপনে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে প্রস্তুত রেখেছিলেন। তাঁর এই কৌশলের জন্যই অগ্রপশ্চাতে অবরুদ্ধ হয়ে সমগ্র দস্যুদলটি ধরা পড়েছে!

হুইলার সাহেব খুসি হয়ে হাসিমুখে জাহ্নবী মিত্রকে বললেন: মিষ্টার মিত্র, ব্যাপার কি! তুমি যে দেখছি ডিটেকটিভ নভেলের একটা প্লট তৈরী করে ফেলেছ—চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে!

জাহ্নবীকে মনে মনে বানিয়ে একটা উত্তর দিতে হলো, তিনি বললেন: পাজীগুলো যে রকম চালাক তাতে আমাকেও তেমনি চালাকী করতে হয়েছিল স্যার!

সাদরে জাহ্নবীর পিঠ চাপড়ে সাহেব বললেন: মিষ্টার মিত্র, পুলিসের মুখ রেখে তুমি আমার মুখখানাও উজ্জ্বল করেছ। কেসটা শেষ হলেই তুমি এর উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

এই ঘটনা থেকেই জাহ্নবী বুঝতে পারেন, অদ্বৈত চৌধুরী কত বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, আর তাঁর মুখের কথাগুলিও কেমন অকাট্য। এই ঘটনা প্রসঙ্গে চৌধুরী মহাশয় জাহ্নবীকে ভরসা দিলেন—আপনার সৌভাগ্যেই ঐ রকম সংকট সময় ওভাবে সাহায্য পৌছেছিল মিত্র মশাই! তবে যদি কোর্টে মামলার সময় সাহায্যকারী ঐ তৃতীয় দলের লোক-গুলোকে সাক্ষী দেবার জন্য দরকার হয়, আমি তখন সৌভাগ্যদেবীর দরবারে দরখাস্ত করে, তাদের ভিতর থেকে বেছে বেছে জনে কয়েককে আনিয়ে দেব জানবেন। আপনি তাদের নামগুলো আপনার ডাইরীতে এই ভাবে টুকে রাখতে পারেন যে, ওদের আপনি ডাকাত ধরবার জন্যে বাহাল করে তফাতে রেখেছিলেন—থানার কনেষ্টবলদের সঙ্গে মিশতে দেন নি। এতে আপনার দক্ষতাই প্রকাশ পাবে—কর্তারাও কাজটার তারিফ করবেন।

চৌধুরী মহাশয়ের এ যুক্তি জাহ্নবী শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন, আর সে কথা শুনে তাঁর প্রতি কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধাও গভীর হয়ে উঠেছিল। এর পর, আরও যে দুটো দস্যুদল অদ্ভুত কৌশলে গ্রেপ্তার করে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রশংসার সঙ্গে জনসাধারণের কাছ থেকে 'জানমারা মিত্তির' আখ্যা পান—তার পিছনেও অদ্বৈত চৌধুরীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও তাঁর সিদ্ধহস্ত পাইকদের সাহচর্য পূর্ণভাবেই ছিল।

সত্যই, ঢুমকাবাসী এই মানুষটির চারিত্রিক বৈচিত্র্য বিস্ময়াবহ। মনে মনে তিনি যে জেদ ধরতেন, পরিপূর্ণভাবে তাকে সিদ্ধি না দিয়ে নিরস্ত হতে পারতেন না। সঙ্কল্পের কথাও তিনি সহজে ব্যক্ত করেন না, বা সে সম্বন্ধে বিতর্কে সহজে প্রবৃত্তও হন না। বিরুদ্ধ কথার উত্তর তিনি কাজে দেখিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। হুইলার সাহেব যখন জাহ্নবীকে ঢুমকায় এনে তাঁর উপরে ডাকাত ধরবার ভার দেন,

চৌবেজী তৎকার্যে অন্তরঙ্গ মহলে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মন্তব্য প্রকাশ করেন—সাহেবের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে এক বাঙ্গালীকে তুমকায় আনলেন ডাকাত গিরেফতার করবার জন্য—আমার মত হুঁসিয়ার লোকই যেখানে হালে পানি পাচ্ছে!

চৌবের মন্তব্য অদ্বৈত চৌধুরীর কাণে গিয়ে পৌঁছাতে বিলম্ব হয় নি; বাঙ্গালীর প্রতি এ অবজ্ঞায় তাঁর অন্তর জ্বলে ওঠে; নবাগত জাহ্নবী মিত্রের প্রতি এক অ-বাঙ্গালীর এই অকারণ বিদ্বেষকে তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি কটাক্ষ বলেই উপলব্ধি করেন, তার পর এর উত্তর দিবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন।

ডাকাতির হাঙ্গামা শেষ হবার পরেই বাঙ্গালী ইনেসপেক্টর জাহ্নবী মিত্র যেদিন কর্তৃপক্ষের কাছে উচ্চ প্রশংসা পেলেন এবং হুইলার সাহেবের সুপারিশে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে পাকা হয়ে বসলেন, সেদিন অদ্বৈত চৌধুরী রামভরসা চৌবেজীর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। ঠিক সেই সময় উপর থেকে চৌবের উপর নিম্নতন এক পুলিস ষ্টেশনে বদলী হবার হুকুম এসেছে—তাঁর মনের মধ্যে তখন তুঁষের আগুন জ্বলছে।

অদ্বৈত চৌধুরী এসেই খোস মেজাজে চৌবেজীর সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন: কেঁওজী, বাঙ্গালী ক্যায়সা চীজ্ হ্যায়?

চৌবেজী উত্তর করলেন: বাড়ী তাজ্জব বনানেবালি চীজ্ হ্যায়। ওহ লোগ সর্টকাট (short-cut) ঢুঁড় লেনে মেঁ বড়ে উস্তাদ হোতে হ্যঁয়।

অদ্বৈত চৌধুরী: ঠিক বাত হ্যায়। পর—ওহ লোগ সর্ট কাট লেকর আগে বঢ়তে হ্যঁয়, অওর আপলোক নিচে উতরতে হ্যঁায়। ইসি তরহ-সে জাহ্নবী মিত্তির সাব ইন্‌সপেক্টরীসে পুলিস-সুপারকে পোষ্ট পর পঁহচ গয়ে, অওর আপ অপ্‌নি দশ শালকি পুরাণি তক্ত-কো ছোড় কর্ সাব-ইনেস-পেক্টরী কি তক্ত পর লওটগয়ে।

চৌবেজী : অরে আপ জানবাজ মিত্তিরকী বাত কর রহে হঁয়! মুঝে অরু খুব মিলি হুয় সাহব! হমরা কাম হুয় চেলাকা, উসকো ছোড় কর গুরু বননেকো গয়াথা, উস বজহ-সে য়হ হালত!

এর পর প্রসন্ন মনেই চৌধুরী মহাশয় বাড়ীতে ফিরে এসে চৌবেজীর সঙ্গে কথোপকথনের খবরটা জাহ্নবীকেও দিয়েছিলেন। জাহ্নবী হাসিমুখে বলেছিলেন সেদিন : তুমকার ব্যাপারে আপনিই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীমশাই, আমি শুধু আপনার বলেই অর্জুনের মত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনার কথা কোনদিনই আমি ভুলব না।

অদ্বৈত চৌধুরী খুব সংক্ষেপেই কথাটার উত্তর দিয়েছিলেন : আমাকে ভুলুন ক্ষতি নেই মিত্তির মশাই, কিন্তু পদগৌরবের মোহে আপনার জাতকে যেন ভুলে যাবেন না—তার মর্যাদাকে কোন দিন খাটো করবেন না, এই আমার অনুরোধ।

সেই অদ্বৈত চৌধুরী এতদিন পরে হঠাৎ জাহ্নবী মিত্রকে স্মরণ করেছেন, আর নিজের এক ছোকরা সাকরেদকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন সঙ্গে একখানা চিঠি দিয়ে। জাহ্নবী তাঁর চিঠির মান অবিশ্যি রেখেছেন, অর্থাৎ তাঁর প্রেরিত বিচ্ছু ছেলেটিকে নির্বিচারেই চাকরী দিয়ে সংসারভুক্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু এর পিছনে কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে কিনা—সে কথা ভুলেও ভাবেননি।

সহধর্মিণীর অজ্ঞাতে জাহ্নবী বিচ্ছুর কাজের রুটিন ঠিক করে দিলেন। কাছে ডেকে তাকে ইসারায় বললেন : বাড়ীর অন্দরমহলের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে বুঝলি ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বিচ্ছু জানালো যে, সাহেবের কথা সে ঠিক বুঝেছে।

খুসি হয়ে জাহ্নবী বললেন : দুর্গা বলে আমার যে তাইঝি আছে,

তার উপরেও নজর রাখবি। দুর্গার প্রতি জাহ্নবী এখনও প্রসন্ন হতে পারেননি। প্রতাপের অপমৃত্যুর খবরটা পেয়েই সকালের দিকে সে ত এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে—চায়ের পেয়ালা ফেলে দিয়ে, মুখখানা অশ্রুমুখী করে উঠে গিয়ে একটা নাটুকেপনা কাণ্ড করে নির্লজ্জের মত। এর পর সে কি করে, তার মনোভাবটা কি রকম, সেটাও ত জানা দরকার। বিচ্চুকে সেই নির্দেশই দিলেন তিনি ইশারা করে।

মাথা নেড়ে বিচ্চুও জানাল যে, ঠিক সে বুঝেছে—সাহেবকে ঠিক সময়েই সব জানাবে।

জাহ্নবী বুঝলেন, ছেলেটি তাঁর কাজে লাগবে বটে।

দ্বিপ্রহরের পর পুলিস সুপারের বাংলোখানি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সুহাসিনী ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েন; বাংলোয় থাকলে জাহ্নবী প্রথমে খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়তে থাকেন বটে, কিন্তু খানিক পরে চোখ দুটি তাঁর নিদ্রার আবেশে বুজে আসে, আর কাগজখানা হাত থেকে সরে পড়ে যায়। তার পরেই তাঁর নাক ডাকতে থাকে।

বাংলোর ভিতরের দিকে একপ্রান্তে তার জন্যে নির্দিষ্ট ছোট ঘরখানির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দুর্গাই কেবল একাটি এসময় সরস্বতীর চর্চা করে। দিবা নিদ্রা পাটনার সংঘে নিষিদ্ধ থাকায়, এখানেও দুর্গা সে নিয়ম ভঙ্গ করেনি। একটি দিনের জন্যেও কেউ এ সময় তাকে শয্যায় আশ্রয় নিতে দেখেনি।

এদিনও ছোট টেবিলটার সামনে কেদারায় বসে দুর্গা একখানি ছবির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ঘরখানি ছোট, একদিকে লোহার একখানা খাট; অন্যদিকে একটি ছোট টেবিল, তার সামনে একটা চেয়ার। টেবিলের পাশে টুলের উপর একটা সুটকেশ। দেওয়ালের

দিকে একটা আলমারি, তার তাকগুলিতে বই এবং দুর্গার ব্যবহারের জিনিষপত্র।

নিবিষ্ট মনে যে ছবিখানি দুর্গা দেখছিল, সেখানি প্রতাপের। যদিও প্রতাপ সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ছিল বরাবর, কিন্তু সকালে আজ জাহ্নবী চায়ের টেবিলে তার সম্বন্ধে যে কাহিনী বলে ও চিঠিখানা পড়ে শোনায়, তাতে তার মত বলিষ্ঠ প্রকৃতির মেয়েকেও যেন ভেঙ্গে পড়তে হোয়েছে। তাই সে প্রতাপের ছবিখানা সুটকেশ থেকে চুপি চুপি বার করে বদ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। আর মনে মনে অনেক কিছু ভাবছিল। সেদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে এ বাড়ীতে এসে কত কথাই বলেছিল সে— যে সংঘকে জাহ্নবী সরকারী তকমার জোরে হেনস্থা করেছেন, সংঘের ছেলেগুলোকে অমানুষ ভেবে শাসাচ্ছেন, তার একটা প্রতিকার না করে ত আর নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না, এখন তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আর উপায় নেই; সেইজন্যই তারা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কর্ম-শক্তির উপর দুর্গার আস্থাও অসীম। দুর্গাও মনে মনে চাইছিল, কাকা হোলে কি হবে, লোকটা যে রকম উদ্ধত আর আত্মম্ভরী, তাতে তাঁকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে তাঁর ভুলটা ভেঙে দেওয়াই উচিত। কিঞ্চিৎ শিক্ষাও সেদিন যাবার সময় হাতে হাতেই দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতাপ—জাহ্নবীর পকেট থেকে রিভলবারটা হাতিয়ে নিয়ে তাঁর চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে—সেইটিই কি ছেলেটার একটা দুঃসাহসিক পরিচিতি এবং পুলিস-সুপার জাহ্নবীর পরম শিক্ষনীয় বিষয় নয়? সে ঘটনার খানিক পরে ত্রিকূটের পথে পুলিসের এক ইন্‌ফরমারের মোটর বাইক লুট করার ব্যাপারটিও কি কম বিস্ময়াবহ! সেও যে প্রতাপের মত বেপরোয়া ছেলের কাণ্ড, সে সম্বন্ধেও দুর্গা নিঃসন্দেহ ছিল, আর মনে মনে খুবই কৌতুকবোধও করেছিল। এর পর এই ধরণের আরও কতকগুলো

রোমাঞ্চ কাণ্ড বাধিয়ে ওরা সারা দেওঘর কাঁপিয়ে তুলেছে, এমনি খবর শোনবার জন্য দুর্গা যখন উদ্‌গ্রীব হোয়ে প্রতীক্ষা করছিল, সেই সময় জাহ্নবী ত্রিকূটের খবর বলে, তার ধারণাটাকে শুধু পালটে দিলেন না—সমস্ত দেহ ও মনকে একেবারে আড়ষ্ট করে দিলেন। প্রতাপের হাতের ঘড়ি, তার নিজের হাতে লেখা চিঠি, সবগুলিই যে তার পরিচিত্—কোনটিত মিছে নয়! আবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিকও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ত্রিকূটের চূড়ো ধ্বসে পড়া নিয়ে! জাহ্নবী যদিও ব্যাপারটাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলেই স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন, কিন্তু খবরটা হঠাৎ শুনে প্রথমে চম্‌কে উঠলেও পরক্ষণেই দুর্গার মনে সন্দেহ জাগে, সে ভাবতে থাকে—ঘড়ি ও চিঠি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়ার পিছনে কোন কৌশলময় পরিকল্পনা ছিল না ত? ভাবতে ভাবতে দুর্গার দুটো চোখ বড় হোয়ে ওঠে—সেদিনের মধ্যাহ্নে প্রতাপের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তার যে সব কথা হয়েছিল, একটি একটি করে মনে সুস্পষ্ট রেখাপাত করতে থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা হাসির শব্দ ওঠে পিছন থেকে—হিঃ হিঃ হিঃ!

বিদ্যুদ্বেগে ফিরে চাইতেই দুর্গা দেখল যে, আজই সকালের দিকে বিচ্ছু নামে যে সাঁওতাল ছেলেটা দুমকা থেকে এসে এ বাড়ীতে বাহাল হয়েচে, সেই ছেলেটাই তার নিকষ কালো মুখখানার ভিতর থেকে সাদা সাদা দাঁতগুলি বার করে অমন করে হাসছে।

দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ দুর্গার মুখখানা বিরক্তিতে শক্ত হয়ে উঠল; দুই চোখের দৃষ্টিও প্রখর করে সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে ছেলেটির পানে তাকাল।

আশ্চর্য! ছেলেটি তাতে একটুও দমল না এবং দুর্গাকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে হাসিমুখে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল: আমি জানি, কার ঐ তসবীর; হিঃ, হিঃ, হিঃ!

দুর্গাও শুনেছিল বিচ্ছু ছেলেটি বোবা, ইশারায় প্রশ্ন বুঝে ইশারায় জবাব করে। এখন সেই বোবা ছেলেটা তার ঘরে এসে তারই সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে দিব্যি কথা বলে চলেছে, আর এমন কথা বলেছে— শুনলে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়!

মুখখানা আরক্ত করে চোখ দুটো পাকিয়ে দুর্গা কি বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার আগেই ছেলেটা দুর্গার মুখ বন্ধ করে দিল বাঁ হাতের একটা আঙুল নিজের বন্ধ ঠোঁট দুটির উপর রেখে নীরব থাকবার ভংগিমায় ইঙ্গিতটি করে। এরূপ ইঙ্গিতের যে কোন গূঢ় অর্থ আছে, দুর্গার মত শিক্ষিতা ও চতুরা মেয়ের পক্ষে সহজেই সেটা উপলব্ধি করতে বাধল না। পরক্ষণেই বিচ্ছু তার মোটা গেঞ্জির ভিতর থেকে একখানা চিঠি বার করে দুর্গার বিস্ফারিত চোখের উপর তুলে ধরল। পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা দুর্গার নামটি খামের উপর দেখেই দুর্গার দৃষ্টি আবার উজ্জ্বল হোয়ে উঠল এবং ঠোঁট দুটি খোলবার আগেই চিঠিখানা তার হাতে এসে পড়ল। খাম খুলে চিঠির ছত্র কটির উপর এক নিঃশ্বাসে তার ক্ষুধিত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরক্ষণে মুখ তুলতেই সে দেখল—চিঠির বাহক আর সেখানে নেই!

সন্ধ্যার একটু আগে জাহ্নবী তাঁর খাস কামরা থেকে উঠি উঠি করছেন, এমন সময় আস্তে আস্তে বিচ্ছু সে-ঘরে ঢুকে লম্বা একটা সেলাম করে দাঁড়াল। জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: কি খবর?

ইঙ্গিতে বিচ্ছু যে অর্থপূর্ণ ভংগি করল, জাহ্নবী তা বুঝতে পেরে বললেন: বড় দিদিমণি কাঁদছিল?

সমর্থন করে বিচ্ছু আর একটা ইঙ্গিত করল—চোখ মুখ ঘুরিয়ে।

বিচ্ছুর সে ইশারাও জাহ্নবী বুঝতে পেরে সেটা যাচিয়ে নিতে বললেন: তুই ঘরে যেতেই চমকে উঠল দিদিমণি—এই ত'?

ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে বিচ্চু আর এক প্রস্থ ইঙ্গিত করল। জাহ্নবী সে ইঙ্গিতের এই অর্থ উপলব্ধি করলেন যে, সে দুর্গার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, টেবিলটি গুছিয়ে, বইয়ের আলমারিটি ঝেড়ে ঝুড়ে তাকে খুসি করেছে—দিদিমণির সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। জাহ্নবী খুসি খুসি হোয়ে বললেন: বেশ, বেশ, তুই খুব বাহাদুর ছেলে! তোর উন্নতি হবে। তুই ওর ওপর নজর রাখবি, আর সব খবর ওর আমাকে দিবি। বিচ্চু হাসিমুখে সাহেবকে আর একটা লম্বা সেলাম করল।

পরদিন জাহ্নবী অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে দুমকায় অদ্বৈত চৌধুরীকে এক পত্র লিখলেন। পত্রখানির প্রথম দিকে বিচ্চুর সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসা ছিল। এ রকম তুখোড় ছেলেকে পাঠিয়ে তিনি যে তাঁর কাজের অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন তাও জানালেন। তারপর শেষের দিকে বিশেষ অনুরোধ করলেন যে, চৌধুরী মশাই যদি সপরিবার বৈদ্যনাথধাম দর্শনকে উপলক্ষ করে কিছু দিন এখানে কাটিয়ে যান, তাহলে তিনি এবং তাঁর স্ত্রীকে আপ্যায়িত করা হবে।

তিনদিন পরেই উত্তর এলো। অদ্বৈত চৌধুরী লিখেছেন—আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ; আহ্বান শুনেই যাবার ইচ্ছা হচ্ছে; কিন্তু ঘটনাচক্রে একটা ব্যাপারে এমনি জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে, এখন আর কোনদিকে পা বাড়াবার যো নেই। এটা নিষ্পত্তি হোলেই আপনার নিমন্ত্রণ রাখতে বেরিয়ে পড়া যাবে।

রোহিণী থানার দারোগা আহম্মদ আলি এখনো অসুস্থ—থানায় আসতে পারেন না। ভাতিজা আলিজানই তাঁর চেয়ারে বসে মুন্সী মাধোলালের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ কর্ম চালাচ্ছে। জরুরী বা জটিল ব্যাপার কিছু ঘটলে বিপিনবাবুর কাছে যুক্তি নেয়। সেদিনের বৈঠকে বিপিন বসুর সঙ্গে আলিজানের পরিচয়টা নিবিড় হয়ে উঠায়, সেই থেকে প্রায়ই তাকে বিপিন বোসের বাসায় দেখা যায়। গল্প-সল্প করে—কলকাতা পুলিসের স্বনামখ্যাত কমিশনার স্যার টেগার্ট সাহেবের সন্ত্রাস-বাদীদের উপর হামলার বিস্ময়কর কাহিনীসব অবাক হোয়ে গিলতে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যার পর গল্পের ফাঁকে আলিজান হঠাৎ বলে উঠল : বড়ই মুস্কিলে পড়েছি স্যার, কার্ত্তিজ আমাদের একদম ফুরিয়ে গেছে—আপনার কার্ত্তিজ থেকে যদি গোটা পাঁচেক দেন আজকের রাতটার মত, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাল সকালেই আমাদের নয়া কার্ত্তিজ এসে পড়বে।

বিপিনবাবু বললেন : আমার কার্ত্তিজ তোমাদের রিভলবারে লাগবে কি? এনেছ সেটা সঙ্গে করে?

ভিতরের পকেট থেকে রিভলবারটি বার করে আলিজান টেবিলের উপর রাখল। বিপিনবাবু বললেন: আচ্ছা বোস একটু—আমার অ্যামুনিসন বাক্সটা আনছি।

বাইরের দরজায় তাঁর বিশ্বস্ত গুর্খা রক্ষী মোতায়েন ছিল, বিপিনবাবু তাকে হুকুম না করে নিজেই উঠে গেলেন ভিতরে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে এমনি তিনি সতর্ক যে, অন্যের উপর এসব ভার চাপাতে চাইতেন না।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি একটি পুলিন্দাকৃতি চামড়ার ব্যাগ হাতে করে ফিরে এলেন। তার ভিতরে ছিল রিভলবার ও প্রচুর পরিমাণে কার্তিজ। কিন্তু আলিজানের রিভলবারে বিপিনবাবুর কার্তিজ খাপ খেলো না। দুজনেই চেষ্টা করে দেখলেন, আলিজানের রিভলবারের মুখ এত ছোট যে, এ কার্তিজ তার মধ্য দিয়ে অবাধে নির্গত হতে পারে না।

বিপিনবাবু বাক্সটি বন্ধ করতে করতে বললেন: আমি ত আগেই এই সন্দেহ করেছিলাম।

কেমন আছেন—স্যার?

নূতন স্বরে প্রশ্ন শুনেই বিপিনবাবু মুখখানা তুলতেই দেখলেন—চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক প্রিয়দর্শন যুবা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর দিকে সস্মিত মুখে চেয়ে আছে। তার হাতে খাবারের একটা চ্যাংড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা, সেই সঙ্গে শাল পাতায় বাঁধা আর একটা বড় রকমের মোড়ক।

চোখাচোখি হতেই আগন্তুক হাতের জিনিষ দুটি কাছের একখানি খালি চেয়ারের উপর রেখে হেঁট হয়ে বিপিনবাবুর পদধূলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে বলল: চিনতে পারছেন না বোধ হয়—আপনার ছেলে সুদর্শনবাবুর ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি আমি, আমার নাম ভূপতি। এক মাসের ছুটি নিয়ে দেওঘরে এসেছি চেঞ্জে। আজই এসে পৌঁছেছি।

স্মিতমুখে বিপিনবাবু বললেন: বটে! ঐ লাইনেই তা হলে ঢুকেছ? বেশ, বেশ! তা এখানে উঠেছ কোথায়?

ভূপতি উত্তর করল: আজ্ঞে, দেওঘর টাউনেই—ষ্টেসনের কাছে। আসবার সময় সুদর্শনবাবু আপনার ঠিকানা দিয়েছিলেন কিনা—তাই প্রথমেই চরণ দর্শনে এসেছি। ফৌজদারী বালাখানার তামাক আপনি ভালবাসেন শুনে খানিকটা এনেছি; আর বর্দ্ধমানের কিছু মিষ্টি আছে। আমাদের বাড়ীর মেয়েরাও সঙ্গে এসেছেন স্যার!

স্যার এবার যুগপৎ আনন্দিত ও সচকিত হয়ে বলে উঠলেন: তাই নাকি! তাঁদের এনেছ সঙ্গে করে? বেশ করেছ, কিন্তু তাঁরা—

প্রশ্নটা শেষ করবার আগেই ভূপতি উত্তর করল: আজ্ঞে, তাঁরা ভিতরে গেছেন—পরিচয় করে নিতে অসুবিধা হবে না। এখন এগুলো ভিতরে পাঠিয়ে দিন দয়া করে।

মুখখানায় নিস্পৃহার একটা কৃত্রিম ভঙ্গি করে বিপিনবাবু বললেন: খরচপত্র করে ওসব আবার আনতে গেলে কেন! এ কিন্তু ভারি অন্যায়! এ লালসিং—

দেউড়ী থেকেই সাড়া দিয়ে লালসিং দ্রুতপদে কক্ষে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়াল। বিপিনবাবু চেয়ারের উপর থেকে বস্তু দুটি ভিতরে নিয়ে গিয়ে মাজীকে দেবার নির্দেশের সঙ্গে একথাও জানাতে বিশেষ করে বলে দিলেন যে, এইমাত্র কলকাতা থেকে যাঁরা ভিতরে গেছেন, তাঁরাই এসব সওগাদ এনেছেন।

লালসিং অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য, কথা পড়লেই তার মর্ম বোঝে। মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে জিনিস দুটি নিয়ে সে ভিতরে চলে গেল।

বিপিনবাবু এর পর আগিন্তানের সঙ্গে ভূপতির আলাপ পরিচয় করে দিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ব্যাপারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন; ভূপতিও তার উত্তরে কিছু কিছু নূতন কথাও শুনিয়ে দিল। কলকাতার লীডারদের কথা, মিনিষ্টারীর অবস্থা, আই, সি, এস অফিসারদের চালবাজী—অনেক কথাই বলে গেল সে। শেষে নিজেদের ডিপার্টমেন্টের প্রসংগে এসে সুদর্শনের প্রশস্তি এত উচ্চ গ্রামে তুলল যে, সুদর্শন সেখানে উপস্থিত থাকলে লজ্জায় বুঝি মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

ঠিক এই অবস্থায় বাড়ীর ভিতর থেকে অবগুণ্ঠনবতী দুটি মূর্তি দরজার কাছে এসেই কপাটের কড়া নেড়ে ভূপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অমনি

সে তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠেই দরজার কাছে এগিয়ে গেল; পরক্ষণেই মুখ ও চোখে ভীতিপ্রদ ভঙ্গি করে ফিরে এসে বলল: আপনি এখুনি ভিতরে যান স্যার, মাথা ঘুরে মা পড়ে গেছেন—আমরা ডাক্তার ডাকছি।

বিপিনবাবুও বুঝি আকাশ থেকে মাটির উপরে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট স্বর শুধু নির্গত হলো—সে কি! সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমনি বিহ্বলভাবে সবেগে ভিতরে ছুটলেন যে, অত্যজ্য য়্যামুনিশন ব্যাগটি যে ছেড়ে যাচ্ছেন, সেদিকে খেয়ালই রহিল না।

ভূপতিও সেই সঙ্গে আলিজানকে অনুরোধ করলেন: আমি ত এখানে নতুন, কাউকে চিনি না; আপনি শীগ্‌গীর একজন ডাক্তার ডাকুন।

আলিজানও ঠিক এই কথাই ভাবছিল। তখনি সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল: কাছেই ভাল ডাক্তার আছেন, আমি এখনি তাঁকে আনছি।

আলিজানের পিছু পিছুই এসে ভূপতি দেউড়ী থেকে লালসিংকে ডেকে বলল: মাজী শিরমে চক্কর লগ্‌কর গির গয়ি হায়, তুম্ ইস্ চিঠ্‌ঠিকো লে কর তুরন্ত পুলিস সুপার জাহ্নবীবাবুকে পাস লে যাও।

হঠাৎ একটা বিপদ যে ভিতরে ঘটেছে, দেউড়ী থেকেই লালসিং সেটা উপলব্ধি করছিল। আর এবাড়ীতে সামান্য কিছু হোলেই বিপিনবাবুর চিঠি নিয়ে দেওঘরে পুলিস সুপারের বাংলোয় তাকে ছুটতে হয়—এমন কত দিনই হয়েছে। সুতরাং মালিকের আত্মীয়স্থানীয় এই রইস ব্যক্তির হুকুম মালিকের হুকুম মনে করেই তার হাত থেকে খামে ভরা চিঠিখানা নিয়ে সাইকেলে উঠে দেওঘরের পথে সে পাড়ি দিল।

পরক্ষণেই ভূপতি ফিরে এসে বিপিনবাবুর টেবিল থেকে তাঁর

য়্যামিউনিশন ব্যাগটি তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে দেউড়ী পার হয়ে রাস্তা ধরে ছুটলো—দেউড়ীর বাঁদিকে খানিকটা তফাতে একটা গাছের তলায় দণ্ডায়মান জিপ গাড়ীখানার উদ্দেশে। অবগুণ্ঠনবতী নারী মূর্ত্তি দুটি ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে জিপে উঠে বসে নিপুণ হস্তে তাদের বেশ পরিবর্তন করছিল। ভূপতি যখন বিদ্যুৎবেগে এসে তাদের মাঝখানে বসল—জীপ-খানা তখন ছুটতে সুরু করেছে—আর সেই অবগুণ্ঠনবতী দুটি নারী মূর্ত্তিরও রূপান্তর ঘটেছে। তাদের পরিধেয় সুশ্রী সাড়ী ও মাথার সুদীর্ঘ বেণীর কোন চিহ্নই নেই—স্বল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্যভাবেই তারা ভোল বদলে ফেলেছে। এখন তাদের পরণে খাঁকি প্যান্ট, গায়ে টাইট কোট, মাথায় মিলিটারী ক্যাপ। জীপে উঠেই ভূপতি নামধারী মানুষটিও এদের মত বেশ পরিবর্তনে মনোযোগ দিল। ঝড়ের বেগে জীপখানি তখন জেসিডির পথে ছুটে চলেছে।

বিপিনবাবু প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। এক দিকে পাশাপাশি তিনখানি কক্ষ ও তাদের সংলগ্ন প্রশস্ত দরদালান। তার কোলে পাথরের চাতাল। সামনে বিস্তীর্ণ উঠান—তার এক কোণে কুয়া, স্নানের ঘর প্রভৃতি। অন্যদিকে রান্না ঘর। শয়ন ঘরগুলির দিক থেকে অনেকটা তফাতে উঠানের অপর দিকে এই পাকশালা। চাতালটি ঘরের শয়নকক্ষগুলির পাশ দিয়ে একটি ঘুলঘুলি পথে মিশেছে—ভিতর বাহিরে যাতায়াতের এইটিই সংযোগ স্থল।

বিপিনবাবু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, মাঝের বসবার ঘর-খানিতে একটি সোফার উপর শুয়ে তাঁর স্ত্রী অনুপমা হাঁফাচ্ছেন, আর পাচিকা সোফার পাশে বসে তাকে বাতাস করছে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পাচিকা বলল: রান্নাঘরে আমি রাঁধছিলাম, মা সেখানে

বসেছিলেন। এমনি সময় দুটি মেয়ে এসে উঠান থেকে বললে, তারা কলকাতা থেকে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি উঠে তাদের এই ঘরে এনে বসালেন। তার একটু পরেই লাল সিং এসে ঐ দুটো জিনিস থুয়ে গেল। মা আমাকে বললেন, মাংসটা হয়ে গেলে নামিয়ে রেখে এসো। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা কই। আমি ফিরে গিয়ে মাংস নিয়ে বসি—আজকের পোড়া মাংস আর সিদ্ধ হতে চায় না, মাও ডাকেন না। কি মনে গেল—সুধুই, মাংস যখন নরম হচ্ছে না কি করি—সেদ্ধ হবার মশলা কি মা দেবেন? উঠতে যাচ্ছি, এমনি সময় সেই মেয়ে দুজনার এক জনা রসুইঘরের কাছে এসে বললো—ওগো বাছা, তোমার গিন্নীমার শরীরটা কেমন কচ্ছে, তুমি কাছে একটু বসবে এসো, আমরা বাবুকে খবর দিচ্ছি। আমি ত শুনেই মাংসের হাঁড়িটে উনান থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়েই ছুটে এসে দেখি, মা ভির্মি যাবার মতন হয়ে আছেন, বিল বিল করে ঘাম বেরুচ্ছে, মুখে রা নেই। যত সুধোই কি হয়েছে মা, কি যন্ত্রণা হচ্ছে বলো, উনি অনেক ডাকাডাকির পর এই মাত্তর চোখ মেলে চাইলেন। এখন আপনি সুধোও বাবু! আমার তো বুকে পীঠে খিল ধরে গেছে।

বিপিনবাবু স্ত্রীর শিয়রের কাছে এসে হেঁট হয়ে দুহাতে মুখখানা আস্তে আস্তে ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝলেন যে, তিনি হঠাৎ অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন, জ্ঞান সম্পূর্ণ আছে কিন্তু মুখ দিয়ে স্বর নির্গত হচ্ছে না। কয়েক চামচ জল তাঁর মুখের মধ্যে দিতেই তার ফল পাওয়া গেল; জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে তিনি ধীরে ধীরে যে কথাগুলি অনেকক্ষণ ধরে বললেন, তার মর্ম এই যে—এ ঘরে সেই মেয়ে দুটিকে বসিয়ে তিনি যেমন এই সোফাখানার উপরে বসেছেন, অমনি তারা দুজনে তাঁর দুপাশ থেকে দু-দুখানা ঝকচকে ছোরা উচিয়ে বলল যে, টু শব্দটি করলেই দু'দিক

দিয়ে এই দুটো পাঁজরায় ফুঁড়ে দেবে। তার পরেই বলল—টাকা আর গয়নার বাক্সের চাবি বার করে দিতে। তাতে অনুপমা দেবী বলেন যে, সামান্য গয়না তাঁর গায়েই আছে, আর টাকা পয়সা ত ঘরে থাকে না—ব্যাঙ্কে রাখা হয়। সে কথা শুনে তারা বললে—মিছে কথা, চাবি দাও শিগগীর, নৈলে মরলে। দুখানা ধারালো ছোরা তখন দুদিক দিয়ে পাঁজরা দুটোয় বেঁধে আর কি! ভয়ে তাঁর বাক্ রোধ হলো—ইশারায় আঁচলটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন এইটুকু মনে আছে। তার পরে কি হয়েছে কিছুই জানেন না।

স্ত্রীর মুখে কথাগুলি শুনেই বিপিনবাবুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—কিছুক্ষণ পূর্বে বাইরের ঘরে সমাগত ভূপতি নামক প্রিয়দর্শন যুবাটির কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি আইরণসেফের মত মজবুত ষ্টিল ট্রাঙ্কটির সন্ধানে ছুটলেন। পার্শ্ববর্তী শয়নকক্ষে শয্যায় শিয়রের দিকে একটি লোহার টিপয়ের উপর ট্রাঙ্কটি ধূম্রবর্ণ মোটা কাপড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে এমন ভাবে রক্ষিত যে, সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। শয়ন কক্ষে আলো জ্বলছিল। বিপিনবাবু সবিস্ময়ে দেখলেন, ধূম্র বর্ণের আবরণটির উপর লাল রঙের একখানা লেফাফা পিনবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, আর সর্বাগ্রে সেটি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে। লেফাফাখানা খুলতেই ভিতর থেকে রক্তবর্ণের একখানা কার্ড বেরিয়ে এলো—তার গায়ে গোটা গোটা সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে :

জাহ্নবী মিত্রের হুঁসিয়ারী ও সব্যসাচীর বাহাদুরী!
প্রথম স্মরণীয় নিদর্শন!! বন্দেমাতরম!—সব্যসাচী।

পড়ার পর বিপিনবাবু কার্ডখানি খামের মধ্যে ভরে পকেটে রাখলেন। তারপর ট্রাঙ্কের ঘেরাটোপটি তুলতেই দেখলেন, চাবির গুচ্ছটি যথাস্থানে ঝুলছে। ডালা তুলে এক নজরে ভিতরটি দেখেই বুঝলেন, গজদন্তে নির্মিত

স্ত্রীর সুদৃশ্য গহনার বাক্সটির সঙ্গে তাঁর নিজের এটাচি কেসটিও অদৃশ্য হয়েছে। বাক্সে যে গহনাগুলি ছিল, দুর্লভ ত বটেই, দামও সাত আট হাজারের কম নয়। আর আজই তিনি ব্যাঙ্ক থেকে খরচ পত্রের জন্য হাজার টাকা তুলে এনেছিলেন, প্রায় সমস্ত টাকাই এটাচি কেসে ছিল।

তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করে পাশের ঘরে আসতেই স্ত্রীর প্রশ্ন তাঁর কানে যেন ভাঙা কাঁসরের আওয়াজের মত বিশ্রী হয়ে বাজল: সব গেছে ত?

বিপিনবাবু আড়চোখে দেখলেন, অনুপমা উঠে বসেছেন—মুখ ও চোখের অবস্থা তখনো স্বাভাবিক হয়নি। কাছে এগিয়ে এসে বললেন: ডাক্তার ডাকবার দরকার হবে কি?

অনুপমা মুখখানা বিকৃত করে বললেন: পাগল! এই নিয়ে আবার কেলেঙ্কারী করতে হবে নাকি? তুমি বরং জাহ্নবীকে খবর দাও—সে যেন সুহাসকে নিয়ে আসে। এ বাড়ীতে আর একলা থাকতে পারব না।

হঠাৎ বিপিনবাবুর মনে পড়ল, য়্যামুনিশন ব্যগটির কথা; সেটি যে বাইরের ঘরে ফেলে এসেছেন! তবে ভরসার কথা এই যে, সেখানে আলিজান আছেন। কিন্তু ভূপতি—সেই ভদ্রবেশধারী ডাকাতটা? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন: আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।

কথাগুলি বলেই তিনি বাইরের ঘরে ছুটলেন।

দরজার কাছে বিপিনবাবুও এসেছেন, ওদিকে আলিজান স্থানীয় ডাক্তার লছমীপ্রসাদকে নিয়ে ঠিক সেই সময় ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। তাঁদের দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই আলিজান বলল: আপনার সেই আত্মীয়টি আমাকে ডাক্তার ডাকতে বলায় আমি এঁকে এনেছি। তিনি কোথায় গেলেন? বাড়ীর অবস্থা এখন—

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থেকে বিপিনবাবু মনে মনে চাণক্য পণ্ডিতের উক্তিটা ভেবে নিয়ে ডাক্তারকে বিদায় দেওয়াই সাব্যস্ত মনে করলেন। অর্থনাশ ও মনস্তাপের কথা বাইরের লোকের কাছে ব্যক্ত করার লাভ নেই, বরং আছে অখ্যাতি এবং সেটি ক্ষতিরই নামান্তর। তাই, তাড়াতাড়ি শিষ্টাচারের সঙ্গে ডাক্তারকে জানালেন: স্ত্রীর হঠাৎ ফিট হয়েছিল। আমি শুনেই ভিতরে চলে গেলাম—বাইরের লোক, ভয় পেয়ে আপনাকে ডেকেছেন, অসময়ে অনর্থক কষ্ট পেলেন, কিছু মনে করবেন না—ইত্যাদি।

ডাক্তার জানতেন বিপিনবাবুকে এবং কলকাতা পুলিসের এককালের হোমরা চোমরা অফিসার ছিলেন বলে সমিহও করতেন। দর্শনীর টাকার প্রত্যাশায় তিনি আসেননি। বরং এই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা একটু গাঢ় হলো জেনে প্রসন্ন মনেই 'রাম রাম' জানিয়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিলটার পানে চেয়েই বিপিনবাবু মুখখানা ফ্যাকাশে করে বসে পড়লেন। আলিজান তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, তাঁর মুখভঙ্গি দেখে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার বলুন ত'? সেই ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

ম্লান দৃষ্টি আলিজানের মুখে নিবদ্ধ করে শুষ্ক কণ্ঠে বিপিনবাব বললেন: বসুন, সব বলছি।

আলিজান যখন পুলিসের লোক, তখন আর বাইরের নন এবং তার কাছে ঘরের দুর্গতির কথা লুকিয়ে লাভ নেই, বরং এরপর তদন্ত ব্যাপারে ক্ষতিই হবে। তাই সব কথাই তাকে বললেন—পাচিকা ও স্ত্রীর মুখে যা শুনেছেন এবং স্বচক্ষে নিজেও যা কিছু লক্ষ্য করেছেন। লাল চিঠিখানিও পকেট থেকে বার করে আলিজানকে পড়তে দিলেন।

এতক্ষণ কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই যে, গেটে লালসিং হাজির নেই।

জাহ্নবীর কাছে খবর পাঠাবার জন্ত তার খোঁজ পড়তেই জানা গেল, বাড়ীর ত্রিসীমাতেও সে নেই। আলিজান রাস্তায় নেমে তার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু তার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আলিজান ফিরে এসে বলল: তাইত, লাল সিংহের ব্যাপার কি? তবে কি সেও ঐ দলের সঙ্গে জড়িত?

বিপিনবাবু স্বরে জোর দিয়ে বললেন: না, না, তাকে সন্দেহ করবার কিছু নেই—ওর ছা'গোষ্ঠীর টিকি আমার দোরে বাঁধা।

তাহলে গেল কোথায়? তার ত' গেটেই থাকবার কথা।

তাইত ভাবছি! অথচ, জাহ্নবীকে এখনি ব্যাপারটা জানানো দরকার।

আলিজান বলল: তাহলে এক কাজ করা যাক না কেন, থানা থেকে তাঁকে ফোন করে ব্যাপারটা—

বিপিনবাবু যেন অকূলে কূল পেলেন: সত্যিই একথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, মিষ্টার জান! আমি এখন বাসা ছেড়ে যেতে পারছিনে, আর সেটা উচিতও নয়। আপনি যদি ফোনটা করে দেন ত, জাহ্নবী আপনার মুখে ব্যাপারটা ঠিকমত শুনতে পাবে। 'তারপর এখানে এলে পরামর্শ করা যাবে। আর আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, তিনি সস্ত্রীক আসেন। তবে এত রাত্রে সেটা সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছিনে। যাক্, আপনি ত বলবেন সব কথা, তারপর সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

—তাহলে আমি এখনি চললাম: বলেই আলিজান বেরিয়ে গেল।

* *

*

রাত ঠিক আটটার সময়ে জাহ্নবী মিত্র বাংলোয় এসে সপরিবার নৈশ ভোজনে বসেছেন। বড় টেবিলখানির সামনাসামনি বসেছিলেন

গৃহস্বামী ও গৃহিনী সুহাসিনী; বাম পার্শ্বে পুত্র কন্যা এবং তার বিপরীত দিকে বসে দুর্গা জাহ্নবীর জন্য কফি তৈরী করছিল। ভোজনের পর পুনরায় বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে তিনি এক পিয়ালা কফি পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। আজও তাঁকে ভোজনান্তে তাঁর আফিসে যেতে হবে।

কফির পিয়ালাটি এগিয়ে দিয়েছে দুর্গা এবং জাহ্নবী ডিস থেকে পিয়ালাটি তুলে একটি মাত্র চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় নবাগত সেই বালক ভৃত্য বিচ্চু অসঙ্কোচে দরজার উপর প্রলম্বিত পরদাখানি ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকল এবং একখানি লাল রঙের চিঠি টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। জাহ্নবী মুখের পিয়ালাটি ডিসে নামিয়ে রেখে চক্ষুর দৃষ্টি চিঠির উপর ফেলে অপ্রসন্ন মুখেই চিঠিখানা টেবিল থেকে তুলে নিলেন।

গৃহিনী ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন: নিশ্চিন্ত হয়ে যে খাওয়াটা শেষ করবে তারও যো নেই! ছোঁড়াটার যদি একটু আক্কেল বিবেচনা আছে, অথচ ওর সুখ্যাতি তোমার মুখে আর ধরে না। কেন, জানে ত এখনি বেরুবে, তখন দিলেই হত।

এমন সময় লাল লেফাফার ভিতর থেকে লালরঙের কার্ডখানি তাঁর নজরে পড়তেই অমনি মুখের কথাটার মোড় ফিরিয়ে, আগ্রহের সুরে বললেন: ও মা, নেমন্তন্নর চিঠি দেখছি যে! কোত্থেকে এলো? বড়দির মেয়ে মিনতির বিয়ে ত এই মাসেই—জামাইবাবুর চিঠি নাকি?

কিন্তু চিঠিখানি পড়তে পড়তেই জাহ্নবীর মুখের ভাব এমনি আশ্চর্য্য-ভাবে বদলে গেল যে, সুহাসিনীর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল—অবাক বিস্ময়ে সে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইল।

অতি বিস্ময়ের আঘাতে জাহ্নবীর গলার স্বরও বুঝি ভেঙে গেছে তখন! ভাঙা গলায় তিনি বললেন: নেমন্তন্নই বটে—পড়ে দেখ।

বলেই চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিলেন। সুহাসিনী রুদ্ধ নিশ্বাসে লাল কার্ডে লেখা ছত্র কয়টি পড়লেন :

পুলিস সুপার
জাহ্নবী মিত্রের হুসিয়ারী—
সব্যসাচীর বাহাদুরী!
কলকাতা পুলিসের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের নামী অফিসার
বিপিন বোসের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন!

—সব্যসাচী।

কম্পিত কণ্ঠে সুহাসিনী বললেন : একি কাণ্ড! কেউ ঠাট্টা করেনি ত?

জাহ্নবী উত্তর করলেন : তাইত ভাবছি! আজ বিকেলেও তাঁর খবর পেয়েছি, অথচ এর মধ্যে এমন কাণ্ড কি করে সম্ভব!

পরক্ষণে কফির পিয়ালায় একটি চুমুক দিয়ে তিনি কলিং বেলটি ঘুরিয়ে দিলেন। কলের যন্ত্রটির ক্রিং ক্রিং ক্রিং ধ্বনির সঙ্গেই বিচ্চু ঘরে ঢুকে পরদার পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

জাহ্নবী চিঠিখানা টেনে নিয়ে তার দিকে তুলে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন : এ চিঠি কে এনেছে?

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিচ্চু সাঁ করে পরদার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লাল সিংকে হাজির করল কক্ষ মধ্যে।

এই পরিচিত মানুষটিকে দেখে কক্ষের সকলেই চমকে উঠল। বিস্ময়ের সুরে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন : লাল সিং! তুমি এই চিঠি এনেছ? কে দিয়েছে?

লাল সিং এ সম্পর্কে যা দেখেছে, শুনেছে ও জানে বিস্তারিতভাবে সবই জানালো। তার কথাগুলি অবিশ্বাস করবার মত নয়—শুনতে শুনতে জাহ্নবীর চোখে মুখে একটা গভীর সংশয়ের রেখা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

ঠিক এই সময় ভিতর থেকে খবর এলো, সাহেবের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা অনেকক্ষণ থেকে বাজছে। জাহ্নবী তখন লাল সিংকে অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

রোহিনী থানা থেকে ফোন ধরেছিল আলিজান দেওঘর পুলিস ষ্টেশনের মাধ্যমে। জাহ্নবী সরাসরি সংযোগ করিয়ে নিয়ে আলিজানের কাছ থেকে সব খবর পেলেন। বুঝলেন, 'সব্যসাচী' নামধারী কৌশলী ডাকাত ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পূর্বতন অফিসারের হাতিয়ার, অলঙ্কার ও হাজার খানেক টাকার নোট আত্মসাৎ করে পুলিস সুপারের হুশিয়ারীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চলে গেছে! জাহ্নবী আলিজানকে বললেন: মিষ্টার বোসকে খবর দিন, আমি এখনি সস্ত্রীক রওনা হচ্ছি। আরো, শুনুন ভূপতি নামধারী আগন্তুকটিই লাল সিংকে এখানে পাঠিয়েছিল একখানা লেফাকা দিয়ে, আর সেই লেফাফার ভিতরেও সব্যসাচীর বাহাদুরীর খবর ছাড়া আর কিছু নেই—এ খবরও জানাবেন।

ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে জাহ্নবী স্ত্রীকে বললেন: রোহিণী থানার আলিজান তোমার মামাবাবুর তরফ থেকে ফোন করেছে। বলছে—সব্যসাচী নামে মানুষটি তাঁর ছেলের সুপারিশ নিয়ে দুটি মহিলাকে সঙ্গে করে তাঁর বাসায় আসেন। এক চ্যাঙারি খাবার আর ফৌজদারী বালাখানার মিঠাকড়া তামাকের একটা বাণ্ডিল দিয়ে তোয়াজ করে, আর তার বদলে মামাবাবুর রিভলভার শুদ্ধ য়্যামুনিসন বাক্স, তোমার মামীমার এক বাক্স গহনা, আর হাজার খানেক টাকার নোট নিয়ে চম্পট দেয়। যাবার সময় আবার শিষ্টাচার দেখাতে লাল সিংকে

দিয়ে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছে, সেখানেও একখানা এমনি চিঠি রেখে গেছে।

সুহাসিনী শিউরে উঠে বললেন: সে কি! মামাবাবুর বাসায় গিয়ে এমন করে ডাকাতি করেছে!

জাহ্নবী বললেন: হ্যাঁ—শুনে অবিশ্যি লোকে বলবে, এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের উৎপাত! যাক্, তোমার মামীমা ভারি ভয় পেয়েছেন, আর—তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বলেছেন। শীগ্‌গীর তৈরী হয়ে নাও। দুর্গা ছেলেদের আগলাবে'খন; থানা থেকে এক ডজন সিপাহী পাঠাতে বলেছি, তারা এখানে মোতায়েন থাকবে।

মিনিট দশেকের মধ্যে জিপে করে সিপাহীরা এসে পড়ল। জাহ্নবী যথোচিত নির্দেশ দিয়ে সুহাসিনীকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। চার জন বন্দুকধারী সিপাহী সেই জিপে তাঁর সঙ্গে চলল। লাল সিং তার সাইকেলটা জিপের পিছনে বেঁধে দিয়ে সোফারের পাশে বসল। নবাগত আটজন অতিরিক্ত সিপাহী জাহ্নবীর বাংলো পাহারা দিতে নিযুক্ত হলো।

বিপিনবাবুর বাসায় আসবার পূর্বেই জাহ্নবী সদর থানা থেকে মফস্বলের থানাগুলিতে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন—প্রত্যেক থানাদার যাতে সচকিত ভাবে তাঁর পরবর্তী নির্দেশটির প্রতীক্ষায় থাকেন। বাসায় এসে দেখলেন, রোহিণী থানা থেকে কয়েকজন কনেষ্টবল দেউড়ীতে পাহারা দিচ্ছে, বাহিরের ঘরে বিপিনবাবু আলিজানের সঙ্গে আলোচনা করছেন। জাহ্নবীকে দেখেই আলিজান সসম্ভ্রমে উঠে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে পাশের চেয়ারখানা একটু এগিয়ে দিল।

বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: সুহাস এসেছে নাকি?

জাহ্নবী বললেন: নিশ্চয়ই; ভিতরে গেছেন। খেতে বসেছি, এমন সময় এই চিঠিখানা আনে আমার সেই ছোকরা চাকর; পরে জানলাম যে, লালসিংকেই বাহক করে পাঠিয়েছিল। তার পরেই ফোনে সব জানলাম।

চিঠিখানা দেখেই বিপিনবাবুও সেই চিঠিখানা বার করলেন—ট্রাঙ্কের ঘেরাটোপের গায়ে পিন-বিদ্ধ অবস্থায় যেটি পেয়েছিলেন। দুখানি চিঠির বয়ান প্রায় একই রকমের; জাহ্নবী যে চিঠিখানি পেয়েছেন, তাতে সব্যসাচীর প্রথম স্মরণীয় নিদর্শনটা আরো স্পষ্ট করে এইভাবে বলা হয়েছে—'কলকাতা পুলিসের নামী অফিসার বিপিন ঘোসের সর্বস্ব লুণ্ঠন!'

বিপিনবাবু বললেন: ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে জাহ্নবী, এই 'সব্যসাচী' ডাকাত যেই হোক, তার আক্রোশটা তোমার উপরেই বেশী—এ যেন তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জানাচ্ছে যে, তোমার

হুঁসিয়ারীকে ব্যঙ্গ করে তোমারই এমন এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পত্তি লুঠ করা হয়েছে—যিনি কলকাতা পুলিসের একজন বড় অফিসার! এখন কথা হোচ্ছে—তোমার উপরে এ আক্রোশ কেন? ত্রিকূট পাহাড়ে যে য়্যাকসিডেন্ট হোয়ে গেছে, যে দলটা ওর মধ্যে ছিল, তারা নিঃশেষে ধ্বংস হয়নি—এটাও তাহলে এখন ভাবতে হয়।

জাহ্নবী বললেন: আজকের কাণ্ড দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। প্রতাপ নামে সেই বিপজ্জনক ছোকরাটি ঐ য়্যাকসিডেন্টে মারা পড়ায় আমি এই ভেবে আশ্বস্ত হয়ে ছিলাম যে, দলটা যদি ওখানে নিঃশেষ নাও হোয়ে থাকে, অন্তত ওদের বিষ দাঁত ভেঙে গেছে—কোন ডেন্‌জারাস য়্যাটেমপ্ট্ করতে আর ভরসা পাবে না; এখন দেখছি, সে ধারণা করাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু এই সব্যসাচী যেই হোক, তাকে দলশুদ্ধ ধরবার জন্যে সমস্ত সাবডিভিসানকে আমি বেড়া জালে ঘিরে ফেলব জানবেন।

আলিজান সবিনয়ে বলল: আপনি স্যার, ঝুমকার মতন হিলি এলাকায় নোটোরিয়াস ডাকাতদের সায়েস্তা করে গোল সাবডিভিসানকে চমকে দিয়েছিলেন, আপনার চোখে ধূলো দিয়ে এরা কদিন লুকিয়ে থাকবে!

প্রসন্ন দৃষ্টিতে আলিজানের মুখের দিকে তাকিয়ে জাহ্নবী বললেন: এখানে আসবার আগেই আমি থানায় থানায় ফোন করে দিয়েছি। এখন থেকেই আমাদের প্রত্যেককে খুব হুঁসিয়ার হয়ে এ ব্যাপারে মাথা দিতে হবে। গবরমেণ্টের ব্রেইন এখন ওয়ার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, চারদিক থেকে লোক রিক্রুট চলেছে। কাজেই, এ সব ব্যাপার গবরমেণ্টের নোটিশে যাবার আগেই আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে।

বিপিনবাবু বললেন: তাইত উচিত। ঝুমকার ব্যাপারে তুমি

সাক্‌সেসফুল হয়েই পুলিস-সুপারের পোষ্টে প্রোমোশ্যান পেয়েছ, এখন যদি তোমার এলাকায় এ-রকম কাণ্ড ঘটে, আর তার আস্কারা না করতে পেরে উপরওয়ালাদের জানাতে হয়, সেও ত তোমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়! কাজেই, এ গ্যাংটাকে ধরা চাইই।

এর পর জাহ্নবী আলিজানকে হুঁসিয়ারী সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে রোহিণী থানায় পাঠালেন বিশিষ্ট কতিপয় পুলিস-এলাকায় ফোন্ করবার জন্য। দেউড়ীতে পুলিস পাহারা যেমন ছিল, তেমনিই রইল।

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল যে, বিপিনবাবুর স্ত্রী অনুপমাদেবী এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। বরাবরই তাঁর হার্টটা দুর্বল, মধ্যে মধ্যে তার জন্য বেদনা বোধও করতেন; আজ থেকে নতুন এক উপসর্গ জুটেছে—থেকে থেকে তাঁর ফিট্ হোচ্ছে; অথচ এর আগে কোনদিন ফিট্ হতে দেখা যায়নি। বিপিনবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন স্ত্রীর এ রকম অবস্থা দেখে। খানিক আগে যে ডাক্তারকে দরজা থেকেই বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকেই আবার 'কল দিয়ে' ডেকে আনা হলো। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন যে, হঠাৎ সক্ লাগলে এরকম হয়। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। ওঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখানো উচিত—হার্ট সম্বন্ধে কোন স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রেখে।

রোগিণীও স্বামীকে অনুরোধ করলেন: আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলো। ডাকাতির কথাই বরাবর শুনে এসেছি, কিন্তু চোখের উপরে মেয়ে ডাকাতে যে কাণ্ড করে গেলো, তাতে আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে; জ্ঞান হোলেও কেবলি মনে পড়ে—দু পাশ দিয়ে দুটো মেয়ে-ডাকাত পাজরায় ছোরা চালাচ্ছে; অমনি কেমন যেন হোয়ে যাই, মাথা

ঠিক রাখতে পারিনে। এখানে থাকলে এ ব্যামো আমার সারবে না—আমাকে কালই নিয়ে চলো।

স্থির হলো যে, সকালে অবস্থা দেখে কি উচিত সেটা স্থির করা হবে। স্ত্রীকে বিপিনবাবুর স্ত্রীর পরিচর্যায় রেখে জাহ্নবী দেওঘরে ফিরে গেলেন।

স্থানীয় একটা মন্দির থেকে এইমাত্র রাত বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে। জাহ্নবী মিত্রের বাংলোর ভিতরটা নিস্তব্ধ, বাইরে দেউড়ীর সামনে ছ'জন প্রহরী সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে। চত্বরে মিশিরজী এবং আরো কয়েকজন এক একখানা খাটিয়া আশ্রয় করে গল্প-গুজব করছে। কারুর চোখে ঘুম নেই।

বাড়ীর ভিতরে—বাইরের বড় হলঘর ও ভিতরের দালানটির সামনে একফালি পাথর বাঁধানো চত্বর; তারই এক কোণে টাইলের ছাদ দেওয়া একখানা ছোট ঘর। অব্যবহার্য্য জিনিষপত্র এ ঘরে এলোমেলো ভাবে এতদিন পড়ে থাকতো, সম্প্রতি সেগুলি একদিকে গুছিয়ে রেখে ঘরখানি নিজের বাস-যোগ্য করে নিয়েছে বিচ্চু। জাহ্নবীও খুসী হয়ে সম্মতি দিয়েছেন।

কাকীমার ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দুর্গা তার ঘরে বসে খবরের কাগজের কতকগুলো কাটিংস পড়ছিল। এত রাতেও তার চোখে ঘুম নেই। পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজতেই সে চমকে উঠলো, আর ঠিক সেই সময় পা টিপে টিপে বিচ্চু ভেজানো দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে প্রবেশ করল। তারপর তেমনি নিঃশব্দে দুর্গার পিছনে গিয়ে মুখখানা একটু নিচু করে চাপা গলায় বলল: ওদিকেও বারোটা বাজলো, আর এদিকে তোমার কাকাসাহেবের হুঁসিয়ারীর বারোটাও বেজে গেল দিদিমণি!

ছেলেটার চাপা স্বর, আর বলার ভঙ্গি দেখে দুর্গা ফিক করে হেসে

ফেলল। সেই ঘটনার পর থেকে কাকা বা কাকীমার সামনে দুর্গা মুখের হাসি বন্ধ করলেও, বিচ্চুর সঙ্গে সংগোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হোলে তখন তার মুখে আর হাসি ধরে না—সে যেন একবারে বদলে যায়। বিচ্চুর কথায় মুখখানা হাসিতে ভরিয়া দুর্গা বলল : বারোটা বাজার মানেও তাহলে বুঝিস্ দেখছি।

তেমনি চাপা গলায় বিচ্চু বলল : বুঝব না মানে? তুমি কিন্তু কথাটা তলিয়ে বোঝনি, দিদিমণি!

সহাস্যে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : তাই নাকি?

বিচ্চু বলল : তুমি ভেবেছ রোহিণী পর্বই চলেছে; কিন্তু আমার ও কথা বলবার মানে—এখানেও ঐ বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন পর্ব শুরু হয়েছে।

সবিস্ময়ে দুর্গা বলে উঠল : বলিস কি?

গেঞ্জির ভিতর থেকে বিচ্চু লালরঙের লেফাফাখানি বার করে দুর্গার হাতে দিয়ে বলল : বলাবলির দরকার কি দিদিমণি—এই দেখ!

অবিকল সেই নীল লেফাফা, ভিতরে সেইরকম লালরঙের কার্ড। লেখাও প্রায় সেইরূপ—কেবল সংখ্যার স্থানে লেখা রয়েছে দুই। যথা :

জাহ্নবী মিত্রের হুঁসিয়ারী—
সব্যসাচীর বাহাদুরী!
নিদর্শন নম্বর—দুই !!
—সব্যসাচী

এক নিঃশ্বাসে কার্ডখানা পড়ে খামের মধ্যে ভরে বিচ্চুর হাতে দিয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : তাহলে আর একটা হয়েছে?

বিচ্চু বলল : হুজুর—চিঠি আসার আগেই কাঁটায় কাঁটায় বারোটাও

বাজবে, আর তোমার কাকা সাহেবের পেয়ারের দোস্ত্ আজিম সাহেবের চিনির তবিল লুঠ হবে। চিঠিখানা ত এবার আমার হাত দিয়ে বিলি করা ঠিক হবে না—মাথা খেলিয়ে বিলির ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: কিন্তু এ যে গাছে না উঠতেই কাঁদি কাটার জো হলো রে! লুঠের আগেই চিঠি বিলি হলো—লুঠ হয়ে গেছে বলে?

বিচ্চু মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মত ভঙ্গিতে বলল: এই ত দস্তুর! তা না হোলে আর বাহাদুরী কি! এমনি করে পর পর হবে গোটা বারো দফা, তারপর হয় ত রফা হয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদিও বিচ্চু কথা বলছিল, কিন্তু কাণ দুটী তার পড়েছিল বাইরের দিকে; একটা পরিচিত শব্দ কাণে লাগতেই সে চিঠিখানা খপ করে গেঞ্জির মধ্যে লুকিয়ে চোখে মুখে বিচিত্র ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল: চুপ—সাহেব এসেছে। আলো নিবিয়ে দাও, দিদিমণি!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্চু অদৃশ্য হলো। দুর্গাও তাড়াতাড়ি কাগজের কাটিংসগুলো টেবিলের ড্রয়ারে রেখে, আলো নিবিয়ে দিয়ে কাকীমার ঘরে ছুটলো—যেখানে তাঁর ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে।

হাঁক-ডাকে বাইরেটা সরগরম করে জাহ্নবী ভিতরে ঢুকেই দেখেন, বিচ্চু সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পাতাগুলো রোগড়ে চোখ থেকে ঘুমকে তাড়াবার কসরৎ করছে।

জাহ্নবী বললেন: ঘুমাগে যা, সকাল সকাল উঠবি।

পত্নীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে জাহ্নবী দেখলেন, দুর্গা তাদের শিয়রে বসে ছোট মেয়েটিকে ভোলাচ্ছে—এইমাত্র সে নাকি জেগে উঠে মাকে খুঁজছিল। ছেলেমেয়ে দুজনেই দুর্গার বাধ্য, তাকেও আজ এ ঘরেই কাকীমার বিছানায় শুতে হয়েছে। দুর্গাকেও ঘুমাবার নির্দেশ দিয়ে

জাহ্নবী নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। পাশাপাশি একই রকমের দুই-খানি ঘর—মাঝখানে একটা বড় দরজা, খোলাই থাকে।

খানিক পরেই বাহিরে একটা কোলাহল উঠল। জাহ্নবী তখন শয়নের উদ্যোগ করছেন। গোলমাল শুনে সার্টটা গায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ড্রয়িং রুমে এলেন। মিশির তাঁকে ডাকবার জন্য ভিতরে যাচ্ছিল— বাইরের ঘরগুলি তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। সাহেবকে দেখে মিশির সবিনয়ে জানালো যে, চিনির মহাজন আজিম সাহেবের তবিল লুঠ করে ডাকুয়া এক লাল চিঠি রেখে গেছে; সে মোলাকাত করতে চায়।

লাল চিঠি! জাহ্নবীর চোখের সামনের জিনিসগুলো এবং মিশিরের মূর্তিটা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মহাজনকে আনবার হুকুম দিয়ে পিছনের ইজিচেয়ারে বসতে গিয়েই তিনি যেন তড়িৎ-পৃষ্টের মত একটা ঝাঁকুনি খেয়ে শিউরে উঠলেন। চেয়ারখানার পাশে টিপয়ের উপরে রয়েছে একখানা লাল চিঠি!

কম্পিত হাতে চিঠিখানা তুলে নিয়ে খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সেই লালরঙের চৌকো কার্ড, তাতে পূর্ববৎ সেই তিনটি পংক্তি— হেড়িংএ তাঁকে ব্যঙ্গ, নিদর্শনের নম্বরে দুই অঙ্ক, স্বাক্ষরে সেই সব্যসাচী!

জাহ্নবীর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, আজিম সাহেবও অবিকল এই রকম এক রোক্কা দাখিল করবে এবং এই সব্যসাচী আখ্যাধারী ডাকাতের রীতিই হচ্ছে, লুঠের সঙ্গে অকুস্থলে যে চিঠি রেখে যাবে, তার প্রতিলিপি পুলিস সুপারের বরাবর ঠিক সেই সময়েই বিলি হবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এতোগুলি সতর্ক ব্যক্তির চোখে ধুলো দিয়ে সব্যসাচীর এই চিঠি তাঁর ড্রয়িং রুমে টিপয়ের উপরে কি করে এলো!

আজিম সাহেব এসে সরোদনে জানালো যে, রাত আন্দাজ বারোটার

সময় তার কোঠি থেকে রোজকার আমদানীর প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা লুঠ হয়ে গেছে। জীপ গাড়ী চেপে—হাফ প্যাণ্ট পরা—মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ী বাঁধা—লম্বা লম্বা চেহারাওয়ালা তিনজন জোয়ান আদমী এসে মালখানায় হামলা চালায়। আজিম সাহেব তখন কোঠির দু'জন দরোয়ান ও একজন মুনসীকে নিয়ে নোট টাকা রেজগি সব আলাদা আলাদা থলিতে ভরছিল। এমন সময় ডাকুরা যেন ছপ্পড় ফুঁড়ে কামরায় হাজির হলো—তিনজনেই পিস্তল দেখিয়ে বলল—বে-আইনি টাকা বে-আইনি রকমেই জব্দ করবার কানুন হয়েছে। নিশানা রইল—পুলিস-সুপারের কাছে পেশ করলে সেখান থেকেইট াকার কিনারা হবে। দু'মিনিটের মধ্যেই সব লুটে-পুটে এমন কায়দায় তারা জীপে উঠল, আর তখনি জীপখানা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উধাও হলো যে, কেউ তাদের কোন হদিস নিতে পারেনি। আর যে নিশানা তারা রেখে গেছে হুজুরের কাছে পেশ করবার জন্যে, সে আর কিছু নয়—লাল রঙের এই চিঠি!

ফতুয়ার পকেট থেকে সেই লাল লেফাফা বার করে আজিম সাহেব জাহ্নবীর হাতে দেবার জন্যে এগিয়ে এসেই সবিস্ময়ে দেখল, তার হাতের রোকার মত আর এক রোকা সাহেবের টিপয়ের উপর রয়েছে! লাল রোকাখানা তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে সাহেবের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। সেখানা তৎক্ষণাৎ নিজেই তুলে নিয়ে জাহ্নবী খুলে ফেললেন, ভিতর থেকে যে কার্ড বেরুল, একই রকমের লেখা—এই মাত্র তিনি যা পেয়েছেন—কোন তারতম্য নেই।

চিঠিখানি হাতে করে ক্ষণকাল মনে মনে কি ভেবে জাহ্নবী বললেন: তুমি এখানে এসে এত্তেলা দেবার আগেই এই খৎ আমিও পেয়েছি। একই লেফাকা, একই রকমের চিঠি, ভিতরের বয়ানও এক। এ তাবে

ডাকাতির কথা কেতাবেই পড়া গেছে—সত্যিই এ এক তাজ্জব ব্যাপার! যাই হোক, এখনি হুঁসিয়ারীর ব্যবস্থাটা আগে করা যাক, তারপর আর সব কথা হবে।

জাহ্নবী তখনই মিশিরকে দিয়ে টেলিফোনের যন্ত্র বাইরের ঘরে আনিয়ে থানায় থানায় এই ঘটনাটা জানিয়ে যথারীতি নির্দেশ দিলেন। প্রায় একটি ঘণ্টা ধরে একাজ চলল।

আজিম সাহেব অবাক বিস্ময়ে ঠায় বসে বসে পুলিসের এই কর্মতৎপরতা দেখছিল, আর মনে মনে ভাবছিল—কি তাজ্জব যন্তর্ বানিয়েছে সরকার বাহাদুর!

এর পর জাহ্নবী আজিম সাহেবকে নিয়ে পড়লেন। জীপ গাড়ী থেকে শুরু করে, ডাকুদের চেহারা, বয়স, হাবভাব, কথাবার্তা, পোষাক পরিচ্ছদাদি প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এবং বিশেষ বিশেষ বর্ণনাগুলো কাগজে টুকে নিয়ে বললেন যে, কাল সকালেই তিনি নিজে তার কুঠি তদারক করতে যাবেন। ঘটনার সময় কুঠির যে-সব লোক সেখানে ছিল, যারা তাদের দেখেছে বা কোন কিছু হদিস দিতে পারে, তারাও যেন হাজির থাকে।

আজিম সাহেবকে বিদায় দিয়ে জাহ্নবী চাকরদের তলব করে জানতে চাইলেন, এতগুলো লোকের চোখে ধূলো দিয়ে লাল চিঠিখানা কি করে তাঁর ড্রইং রুমে টিপয়ের উপরে এলো? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কারুর কাছ থেকে পাওয়া গেল না। মিশিরের মত দক্ষ ও অত্যন্ত হুঁসিয়ার লোকও কোন হদিস দিতে পারল না। বিচ্ছুও বাদ পড়ল না—মিশিরকে দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে খাটিয়া থেকে তুলে আনা হলো সাহেবের সামনে। কিন্তু সে যে এতক্ষণ কাণ দুটো খাড়া করে অন্ধকারের অন্তরালে দাঁড়িয়ে এ ঘরের সব কথা আত্মসাৎ করছিল এবং আর সব চাকরদের পর তারও

পালা আসবে জেনে মোক্ষম সময়ে তার ঘরে ফিরে গিয়ে কৃত্রিম নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিল, এ তথ্য কেউ জ্ঞাত ছিল না। চোখে জল দিয়ে ঘুমের ঘোর কাটাতে কাটাতে সাহেবের সামনে এসে বিচ্চু তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে ইশারায় যে সব কথা জানাল, তাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হলো যে, চিঠির ব্যাপারে সে একেবারে অজ্ঞ, এবং সস্ত্রীক জাহ্নবীর বাইরে রওনা হবার পর এ-ঘরের ত্রিসীমাতেও সে আসে নি। তার ইঙ্গিতে স্পষ্ট জানা গেল যে, মা'জীরা চলে গেলে বড় দিদিমণি গান গেয়ে ছোট দিদিমণিকে যখন ঘুম পাড়াচ্ছিলেন, সে তখন ঢুলতে ঢুলতে গান শুনছিল, আর গান শুনতে শুনতেই চাতালের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাহেব আসতেই বাইরে ডাক-হাঁক পড়ে, তাই শুনেই সে ধড়মড় করে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছুটে যায়, সাহেব তাকে দেখে কোন কিছু ফরমাস করেন না, ঘরে গিয়ে ঘুমাতে বলেন।

বিচ্চুর এই নির্বাক উক্তি সার্থক ভঙ্গির সঙ্গে এমনি সুস্পষ্ট হলো যে, তার প্রতি কোনরকম সন্দেহ করা ত দূরের কথা, জাহ্নবী বরং আরো প্রীতই হলেন। অতঃপর সকলকে ছুটি দিয়ে জাহ্নবী যখন শয়নকক্ষে ফিরে গেলেন, রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঠিক সেই সময় মন্দির থেকে পেটা-ঘড়ি চতুর্থ প্রহরের প্রক্রম ঘোষণা করছে।

২৭

পরদিন তদন্ত করেও জাহ্নবী নূতন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না—ডাকাতেরা লাল চিঠি ছাড়া এমন কোন নিদর্শন রেখে যায়নি, যার উপর নির্ভর করা চলে। সহরে তদন্তের পর রোহিণীতে বিপিনবাবুর বাসায় গিয়ে দেখলেন, সেখানে বিছানা পত্র বাঁধা-সাঁধা হোচ্ছে, বিকেলের ট্রেণেই বিপিনবাবু সপরিবার কলকাতায় রওনা হবেন। তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী কিছুতেই আর এখানে থাকতে রাজী নন।

জাহ্নবীকে আড়ালে ডেকে বিপিনবাবু বললেন : বাসা আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, তবে এই গ্যাংটা যাতে ধরা পড়ে—কলকাতায় গিয়ে সেই ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে ; অবিশ্যি, ব্যাপারটা যাতে রাষ্ট্র হয়ে না পড়ে, সেটাও দেখা চাই। আমি গিয়েই সুদর্শনকে এখানে পাঠাব উপরওয়ালাদের সুপারিশ করে।

জাহ্নবী খুসী হয়েই বললেন : তাহলে ত ভালোই হবে, এবং তাতে আমার প্রেষ্টিজটাই বজায় থাকবে। আর—সুদর্শন এখানে এসে আমার ব্যাংলোতেই থাকবে—কোন অসুবিধা তার হবে না।

সেদিন বিকেল পর্যন্ত জাহ্নবী সস্ত্রীক রোহিণীতে থেকে—বিপিনবাবুদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। দেওঘরের বাংলোয় লালসিংকে দিয়ে খবর পাঠালেন যে, দুর্গা যেন ওখানকার ব্যবস্থা করে নেয়—পাচিকা ও ভৃত্যদের সাহায্যে।

বিপিনবাবুদের ট্রেণে তুলে দিয়ে স্বামি-স্ত্রী সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, সুদর্শনকে পাঠাতে যেন বিলম্ব করা না হয়, আর সে যেন আপনার ভেবেই তাঁদের বাসায় এসে ওঠে, কিছুমাত্র সংকোচ না করে। এর পশ্চাতে

উভয় পক্ষের একটা উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্ন ছিল। সুদর্শন এখনও পর্যন্ত অকৃত-দার, নানা স্থান থেকেই বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু কোন পাত্রীই পাত্র-পক্ষের পছন্দ হয় নি। জাহ্নবীর বাংলোয় দুর্গাকে দেখে তাঁরা সভাই মুগ্ধ হন এবং জাহ্নবীরও সমর্থন পান। সুতরাং এক্ষেত্রে সুদর্শনের এখানে আসা ও থাকার সার্থকতাও আছে।

পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে সহরের তিনটি মহল্লায় আরও তিনজন ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে পর পর একই পদ্ধতিতে ডাকাতি হলো এবং অকুস্থলে ও পুলিস-সুপারের বাংলোয় যথাক্রমে সব্যসাচী-মার্কা লাল চিঠি পাওয়া গেল। সুতরাং সব্যসাচীর বাহাদুরীর সংখ্যা দাঁড়ালো—পাঁচ। ফলে, জাহ্নবী তথা থানাদারদের আহার নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

জাহ্নবী প্রথমে ভেবেছিলেন যে, সব্যসাচী ডাকাত প্রত্যেক ডাকাতির পর ঘটনাস্থলে এবং তাঁর বরাবর একখানি করে লাল চিঠি বিলি করে তার বাহাদুরীই জানায়। কিন্তু পরে জানলেন যে, আরো দুইজন পদস্থ ব্যক্তির নামেও অনুরূপ চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের চোখেও আলোকপাত করেছে। তাঁরা হচ্ছেন—ডুমকার পুলিস সাহেব মিষ্টার হুইলার এবং পাটনার পুলিস বিভাগের বড়কর্তা স্যার শংকরলাল।

পঞ্চম ডাকাতির তিন দিন পরে স্যার শংকরলাল জাহ্নবীকে টেলিফোনে জানালেন: ব্যাপার কি মিষ্টার মিত্র—হপ্তা খানেকের মধ্যে আপনার সাবডিভিসনে পাঁচটা ডাকাতি হয়ে গেছে—আর একই লোক এই ডাকাতি করছে! ব্যাপারটা আপনি চেপে রাখলেও দস্যুবীর সব্যসাচী বে-পরোয়া হয়ে প্রত্যেকবারই লাল রোকায় আমাকে খবর দিয়েছেন। আপনার এলাকায় হামলা চালাবার আয়োজন চলেছে—এমন একটা খবর আগেই আমি পেয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সে কথা জানিয়ে সাহায্য করতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তার

উপর কোন গুরুত্বই দেন নি—সাহায্যও নেন নি। এখন এখানকার যে অবস্থা, তাতেও কোন রকম সাহায্য পাঠানো সম্ভব নয়—বিশেষতঃ, আপনি তার জন্য সচেষ্টও নন, কোন খবরই আমাকে দেওয়া কর্তব্য মনে করেন নি—ইত্যাদি।

জাহ্নবী প্রত্যুত্তরে জানালেন: কিছু আগে একটা বিপ্লবী গ্যাং এখানকার ত্রিকূট পাহাড়ে জমায়েত হয়েছিল, আমি সে খবর জানতে পেরে পাহাড় ঘেরাও করি। ঠিক সেই সময় পাহাড়ের একটা অংশ ধ্বসে পড়ায় সে দলটা নষ্ট হয়ে যায়। উপস্থিত পর পর পাঁচটা ডাকাতি হয়েছে বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত নই, ডাকাত ধরবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট আছি; শীঘ্রই আপনি সে খবর পাবেন। এ ব্যাপারে আমার যে একটা অভিজ্ঞতা আছে—ডুমকার ঘটনা তার সাক্ষী; সে খ্যাতি ম্লান হবে না—আপনিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—ইত্যাদি।

ডুমকা থেকে হুইলার লিখলেন: প্রিয় মিটার, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সম্প্রতি তোমার এলাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে একই লোক পাঁচ জায়গায় অবাধে ডাকাতি করেছে। এ যেন সেই ইউরোপের রবিনহুড ডাকাতের কাণ্ড! তোমার এলাকার সব্যসাচী ডাকাত আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে—কেমন করে তোমার হুসিয়ারীর উপর সে কাজ বাগিয়ে চলেছে! প্রত্যেক স্থানের তার সাফল্য পুলিসের ক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করেছে। নিশ্চয়ই তুমি এ পর্যন্ত কোন কিনারাই করতে পারনি, তাহলে সে খবর আমাকে অবশ্য দিতে। এ থেকে পাটনার ওপরওয়ালা, আমার মনের অবস্থা এবং তোমার ভবিষ্যৎ, এই তিনটিই তুমি উপলব্ধি করছ। আমার আশঙ্কা হোচ্ছে এই ভেবে যে, ঐ সব্যসাচী ডাকাত এই ভাবে যদি তার বাহাদুরী দেখাতে থাকে, তখন আমাকেই হয়ত তোমাকে ওখান থেকে সরমার সরিয়ে দিতে

আর কোন পাকা লোককে ওখানে পাঠাতে হবে। সেটা কি রকম বেদনাদায়ক, তোমার মত বুদ্ধিমান লোক তা উপলব্ধি করবে জেনেই তোমাকে এই পত্র লিখে সতর্ক করে দিচ্ছি।

জাহ্নবী বুঝলেন, এই সব্যসাচী যেই হোক, তার লক্ষ্যই হচ্ছে সব দিক দিয়ে তাঁকে অপদস্ত করে তোলা। নইলে ডাকাতীর সঙ্গে সঙ্গে দুমকায় ও পাটনায় পুলিস বিভাগের দুই বড় অফিসারের কাছে এভাবে লাল চিঠি পাঠাত না। হুইলার সাহেবকে জাহ্নবী তাঁর দরদী হিতৈষী বলেই জানেন; কাজেই ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁকে সব কথা খুলেই লিখলেন; এমনকি, বিপিনবাবু যে চেষ্টা যত্ন করে কলকাতা থেকে একজন পাকা গোয়েন্দা পাঠাচ্ছেন এবং সে লোক তাঁরই নিজের ছেলে—সে কথাও জানালেন; শুধু তাই নয়, এ সম্বন্ধে বিভাগীয় বাধা অপসারণের জন্য তাঁর সাহায্যও চাইলেন।

কলকাতায় গিয়ে বিপিনবাবুও জাহ্নবীর পত্রে জ্ঞাত হলেন যে, তাঁর আসার পর আরও কয়েক জায়গায় সব্যসাচী ডাকাতি করেছে এবং প্রত্যেক স্থানেই ডাকাতির ধারা একই রকমের। তিনি কলকাতা থেকে জাহ্নবীকে তার করলেন: ভেঙ্গে প'ড় না, ব্যবস্থা সব করেছি—স্বপন এক সপ্তাহের মধ্যেই রওনা হোচ্ছে।

সে দিন সকালের দিকে প্রাতরাশের পর জাহ্নবী দুর্গাকে লক্ষ্য করে বললেন: পাশের ঘরখানা বন্ধই আছে—বাইরে থেকে কোন গেষ্ট এলে ওঘর খুলে দেওয়া হয়। তোমার কাকীমার কাছে ওর চাবি আছে। বিচ্চুকে নিয়ে ঐ ঘরখানি ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ—সাজানো ব্যাপারে তোমার বেশ রুচি আছে বলেই তোমার উপরেই ভারটি দিয়ে যাচ্ছি।

কাকার কথা তুলে কাকীমার কাছে চাবি চাইতেই তিনি একটু

মুচকে হেসে চাবিটা আঁচলে বাঁধা রিঙ থেকে খুলে দিয়ে বললেন: খাটের চাদর আর বালিসের ওয়াড়গুলো বদলাতে হবে, আমার আলমারিতে আছে। পার ত, ফুলদানিতে ফুলের একটা তোড়াও রেখো—সুদর্শনের আবার ফুলের ভারি সখ!

কদিন ধরেই এই নামটি সে শুনে আসছে কাকা ও কাকীমার মুখে, সেই সঙ্গে তার রূপ গুণ এবং বংশ সম্পর্কেও উঁচু ধরণের অনেক কথা। ইতিমধ্যে বিচ্চুও তাকে চুপি চুপি খবর দিয়েছে—দিদিমণি এবার হুঁসিয়ার হও! ডাকাত ধরতে কলকাতা থেকে ঐ যে সুদর্শনবাবু আসছেন, উনি হচ্ছেন বিপিনবাবুর ছেলে। ওরা কি মতলব করেছে জানো, ওনার সাথে তোমার সাদী দেবেন, আমি ওঁদের সলা শুনিছি গো!

দুর্গার মত বুদ্ধিমতী মেয়েও উপলব্ধি করেছে—তলে তলে একটা কিছু কাণ্ড চলেছে! কিন্তু বিপদে বিচলিত হবার মত দুর্বলতা তার কোন দিনই ছিল না, এখানেও সে উদ্বিগ্ন হয়নি বরং মনে মনে একটা কৌতুক বোধ করে। তাই, নীরবে কাকাবাবুর কথা শোনে এবং কাকীমার নির্দেশ সযত্নে পালন করতে থাকে। ঘরখানি ঝাড়াঝোড়া ও সাজানোর কাজ শেষ হলে সে বিচ্চুকে দিয়ে কতকগুলো ফুলও আনায়—বাংলার বাগিচায় ফুলের গাছগুলিতে প্রচুর ফুল ফুটে থাকে। বিচ্চুর সংগৃহীত সপল্লব ফুলগুলি বাহারী লতাপাতার সংযোগে নিজেই একটা তোড়া তৈরী করে বিচ্চুকে জল আনতে বলে। তারপর কারুকার্য খচিত ফুলদানীর মধ্যে প্রয়োজনমত জল ঢেলে তোড়াটী তার উপর রাখছে এমন সময় কক্ষদ্বার থেকে প্রশ্ন হলো: মিষ্টার মিত্র আছেন?

পিছনে ফিরে তাকাতেই প্রশ্নকর্তার সঙ্গে দুর্গার চোখাচোখী হয়ে গেলো। সে দেখল—সাহেবী পোষাক পরা এক দিব্য প্রিয়দর্শন যুবা দ্বারপথে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন করছে; তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি দুর্গার মুখে নিবদ্ধ। বুঝতে

তার বিলম্ব হলো না যে, এই আগন্তুকই বহু আকাঙ্ক্ষিত সুদর্শন—যার জন্য এই কক্ষ-সজ্জায় সে নিয়োজিত হয়েছে !

আগন্তুকের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে দুর্গা তাড়াতাড়ি কাকীমাকে খবর দিতে ছুটেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় জাহ্নবী সেজে-গুজে বাইরে আসছিলেন—অলিন্দের পথে দেখা হতেই দুর্গা বলল: বাইরে কে এসেছেন কাকাবাবু—আপনাকে খুঁজছেন।

সন্দিগ্ধভাবে বাইরে গিয়েই জাহ্নবী সহর্ষে বলে উঠলেন: আরে, এসে গেছ তাহলে—কিন্তু আগে একটা খবর দিলে অসুবিধায় পড়তে হতো না ; ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে যেতাম।

সবিনয়ে সুদর্শন বলল: তাতে কি হোয়েছে, কোন অসুবিধাই হয়নি—লগেজগুলো টাঙ্গায় আছে।

জাহ্নবী তখনি হাঁক-ডাক করে চাকর-বাকরদের অতিষ্ঠ করে তুললেন—জিজ্ঞাসা করলেন: সাহেব কুঠীতে নেমেছেন দেখেও কেন মালপত্র তারা গাড়ী থেকে নামায়নি? বড় ছোট সবাই ধমক খেলে। দুর্গাও রেহাই পেলে না—সুদর্শন আসছে জেনেও, তাকে বসতে না ব'লে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে ছুটে আসা হলো কাকাবাবুকে ডাকতে! একবারে হঠাৎ লজ্জাবতীলতা হোয়ে গেলেন!

হাঁক-ডাক শুনে সুহাসিনীও ভিতর থেকে ছুটে এলেন। সুদর্শনকে দেখে তাঁর মুখেও হাসি ফুটল ; ছেলে-মেয়ে দু'টি মায়ের পিছনে পিছনে আসতেই জাহ্নবী পরিচয় দিয়ে তাদের সুদর্শনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে দিলেন। বাইরের হলঘরেই সুদর্শনকে ঘিরে বৈঠক জমে উঠল। কেবল দুর্গাই ভিতরে লুকিয়ে রইল—সেই যে তাড়াতাড়ি সে ভিতরে ঢুকেছিল, সেখান থেকেই কাকার মুখ-ঝাপটা শুনল, তারপর আর তাকে বাইরের ঘরে মুখখানিও বাড়াতে দেখা গেল না। কিন্তু নবাগত

কুটুম্বপুত্রটির উৎসুক-দৃষ্টি আদর-আপ্যায়ন ও সংলাপের ভিতর দিয়ে ঘন ঘন যে দ্বারদেশে প্রলম্বিত পরদার ফাঁকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেটা গৃহিণীর চক্ষুকে চাপা দিতে পারেনি। মুখের হাসি চাপবার চেষ্টা করে তিনি ডাকলেন দুর্গাকে : ঘরের কোণে লুকিয়ে রইলি কেন, আয় এখানে— সুদর্শন কি আমাদের পর, যে এত লজ্জা ?

জাহ্নবী পূর্ব্ববৎ মুখখানা বেঁকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন : না—আজ ও লজ্জায় একবারে কুঁকড়ে পড়েছে। এক এক সময় ওর ঘাড়ে যেন ভূত চাপে—সাধারণ আক্কেল বিবেচনাও ভুলে যায়। এই শিক্ষাই কি পণ্ডিত বাপের কাছে পেয়েছিল ও ?

বিচ্চু এই সময় ভিতরে এসে ইশারায় জানালো যে, দিদিমণি চা তৈরী করছেন।

সুহাসিনী অমনি বলে উঠলেন : এই দ্যাখ, আমরা গল্প করছি, দুর্গা তার কাজ করছে—মিছিমিছি আমরা বকে মরলাম।

তারপর সুদর্শনের দিকে চেয়ে স্নেহের সুরে বললেন : তুমি পোষাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও—আমি এখুনি আসছি।

সুহাসিনী ভিতরে চলে গেলেন। সুদর্শনকে নিয়ে জাহ্নবী সজ্জিত ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করে বললেন : এই তোমার ঘর-সবই ব্যবস্থাই আছে, পাশেই বাথরুম।

তারপর গৃহ-সজ্জা দর্শনে প্রীত হোয়ে নিজের মনেই বললেন : না— মেয়েটাকে মাঝে মাঝে বকি-ঝকি বটে, কিন্তু যে কাজের ভার দিই, আর দেখতে হয় না। ঘরখানি বেশ সাজিয়েছে, আর রুচিও—

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল : উনিই কি দুর্গা দেবী—আপনার দাদার মেয়ে ?

সহাস্যে জাহ্নবী বললেন : নামটাও শুনেছ তাহলে ? হাঁ, ঐ দুর্গা।

খুব ইন্‌টেলিজেন্ট অ্যাণ্ড এজুকেটেড। তবে দোষ হোচ্ছে, ভারি একগুঁয়ে।

সুদর্শন বেশ পরিবর্তন করে জাহ্নবীর সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে এসে বসবা মাত্রই জাহ্নবী সব্যসাচী ডাকাতের প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে চা ও জল-খাবার এসে গেল। দুর্গাকেই চা পরিবেশন করতে হলো; সুহাসিনী হিসাব করে সেইরূপ ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু স্বামি-স্ত্রী উভয়েই লক্ষ্য করলেন, দুর্গার আচরণ এখানে সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতার প্রভাব মুক্ত হোলেও কেমন যেন আন্তরিকতা বা হৃদ্যতার অভাব প্রকাশ পাচ্ছে—যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই সে যেন তার কর্তব্য পালন করছে মাত্র!

জলযোগের পর সুদর্শনকে নিয়ে জাহ্নবী তাঁর আফিসে গেলেন। কয়েকজন সাব ইনেস্‌পেক্টর পুলিস-সুপারের প্রতীক্ষা করছিলেন। আফিসের কর্মচারী এবং সাব ইনেস্পেক্টরদের সঙ্গে সুদর্শনের পরিচয় করে দিয়ে জাহ্নবী আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এর পর সুদর্শনকে নিয়ে তাঁর এলাকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও পরিদর্শন করলেন।

সুদর্শনের আসার পর সাতটা দিন নিরুপদ্রবেই কাটল—সব্যসাচী ডাকাতের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কেউ কেউ সাব্যস্ত করলেন, কলকাতা থেকে সি, আই, ডি এসেছে শুনেই সে ঘাবড়ে গেছে, হয়ত এ এলাকা ছেড়েই সরে পড়েছে। জাহ্নবীর বাংলোয়ও কিছুটা শান্তির ছায়া পড়ল যেন। এর আগে তো কারুর চোখে ঘুমই ছিল না।

কিন্তু একটা ব্যাপারে সস্ত্রীক জাহ্নবী বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলেন কটা দিন ধরে। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, সুদর্শনের আসার পর দুর্গা আশ্চর্য রকম গম্ভীর হোয়ে পড়েছে। চায়ের টেবিলে নিয়মিত ভাবেই সে উপস্থিত থাকে, স্বহস্তে চা তৈরী করে, চায়ের পিয়ালা এগিয়ে দেয়,

ফাই-ফরমাজ সংসারে যেভাবে যেটুকু সে করে থাকে—তার দিক দিয়েও কোন ব্যতিক্রম নেই—কিন্তু তার আচরণটি যেন একেবারে নিষ্প্রাণ, তাতে স্ফূর্তি বা চাঞ্চল্যের কোন চিহ্নই নেই। মানুষ যে একটানা মুখ বুজিয়ে এভাবে থাকতে পারে—নানা কাজে এবং সবার সংশ্রবে এসেও কথা না ব'লে, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটি না ফুটিয়ে কলের পুতুলের মত চলা-ফেরা করে—সেটা যেন দুর্গা মেয়েটাই এই প্রথম দেখিয়ে দিলে! অথচ তার আচরণে কোন ত্রুটি নেই; আতিথ্য সৎকারে ঔদাসীন্যও চোখে ধরা পড়ে না; এ অবস্থায় কিছু বলাও মুস্কিল।

কিন্তু জাহ্নবীর অসহিষ্ণু চিত্তটি ক্রমশঃই বিরূপ হোয়ে উঠতে থাকে। তিনি তো পাটনায় গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন—বাইরের লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে ও মেলা-মেশায় এই মেয়েটি কি রকম সপ্রতিভ ও সঙ্কোচ-বিহীন। এখানেও তো লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের অনুপস্থিত কালে সেই গুণ্ডাপ্রকৃতি ছেলে প্রতাপ এ বাড়ীতে এলে কি ভাবে সে তার পরিচর্যা করেছিল! অথচ, তাঁর কুটুম্বস্থানীয় বিশিষ্ট বংশের এই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ছেলেটির প্রতি তার কি বিরাগ! যদিও মুখে কিছু প্রকাশ করে না সে—কিন্তু তার চোখ ও মুখের নীরব ভঙ্গি থেকে কিছুই যে জানতে বাকি থাকে না। স্বামি-স্ত্রীতে এ সম্বন্ধে কথাও হয়। সুহাসিনী বলেন: এমন চাপা মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি বাবা! সুদর্শন আসা অবধি সেই যে গম্ভীর হোয়েছে, তারপর আর একটি দিনের তরেও মুখে হাসি ফুটল না! মানুষের মনে জানবার বা জিজ্ঞাসা করবারও তো একটা অগ্রহ হয়—এ মেয়ের কুষ্ঠীতেই তা লেখেনি! যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছেন—ওর সঙ্গে কথা বলবে না বলে!

জাহ্নবী বিকৃত মুখে বলেন: দাঁড়াও না, ওর গুমর আমি ভাঙছি।

একান্ত বিপন্ন অবস্থায় তাঁর অগ্রজ বিশ্বাস করে অসহায় কন্যাটির

ভার তাঁকেই অর্পণ করে গেছেন, তিনি যে এখানে তাঁরই প্রতিনিধি রূপে মেয়েটির অভিভাবক হয়েছেন এবং তার এই ধরণের মনোবৃত্তিগুলি যে তাঁর পক্ষে একান্ত ভাবে উপেক্ষার বস্তু, জাহ্নবীর পুলিসী মেজাজ সেটা উপলব্ধি করতে চাইল না—এখানেও তিনি প্রকাণ্ড এক ভুল করে বসলেন এবং নিজেকেই এই মেয়েটির একমাত্র অভিভাবক এবং শাসক সাব্যস্ত করে তাকে সায়েস্তা করবার সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগলেন।

২৮

সেদিন বিকালের দিকে জাহ্নবী ড্রয়িং-রুমে ঢুকেই দেখলেন, দুর্গা তাঁর ছেলেমেয়েদের একখানা গল্পের বই পড়ে শোনাচ্ছে। এ অবস্থাতেও তিনি লক্ষ্য করলেন, তার মুখখানা বিবর্ণ ও বিষণ্ণ। ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই মনোবিকারের বিরুদ্ধেই তাঁর উষ্মা।

জাহ্নবীকে দেখেই দুর্গা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে জাহ্নবী গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন: সুদর্শন কোথায় রে?

কোন উত্তর না করে মুখখানি ফিরিয়ে নিল দুর্গা। তার এই উপেক্ষায় জাহ্নবী যেন জ্বলে উঠলেন। রুক্ষ কণ্ঠে বললেন: কথাটা কি কানে ঢুকল না তোমার? সুদর্শন কোথায়—জিজ্ঞাসা করা হোয়েছে।

মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে দুর্গা বলল: আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? বাইরের লোকের খবর রাখা কি আমার কর্তব্য বলতে চান আপনি?

ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথাগুলি বুঝি জাহ্নবীকে স্তব্ধ করে দিল, অথবা বিপুল

ক্রোধের প্রাচুর্য্যে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। বিচ্চু এই সময় পরদাটি সরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঈশারায় জানাল যে, ছোট সাহেব বাগিচায় বেড়াচ্ছেন—ডেকে দেব কি?

জাহ্নবী বললেন: হ্যাঁ, তাঁকে বল্—সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

ঝাঁ করে বিচ্চু সরে গেল। দুর্গাও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল—জাহ্নবী বাধা দিয়ে বললেন: যেয়ো না তুমি—বস ঐ চেয়ারে, কথা আছে।

সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে জাহ্নবী তাঁর চেয়ারে বসলেন। এই সময় সুহাসিনীও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। জাহ্নবী তাঁর মুখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন: এস—ব'স।

প্রায় একসঙ্গেই দুর্গা ও সুহাসিনী পাশাপাশি দুখানি কেদারায় বসতেই জাহ্নবী বলতে লাগলেন: আমার সুনাম ও সম্মান দুটোই গেছে, চাকরীও যাবার দাখিল হোয়েছে। এক মাসের মধ্যে যদি ডাকাতিগুলোর কিনারা করতে না পারি তো ওপরওয়ালারা আমাকে ডিগ্রেড করবে। এখন একমাত্র ভরসা ঐ সুদর্শন। কিন্তু ওকে যদি আমরা পর করে রাখি, অর্থাৎ দুর্গা যদি ওকে ও-ভাবে হেনস্তা করে, তাহলে তো মানে মানে ওর চলে যাওয়াই উচিত। এখন আমি জানতে চাই—দুর্গার ইচ্ছাটা কি—সুদর্শনকে বিদেয় করে দেব?

বিষণ্ণ মুখখানি আস্তে আস্তে তুলে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: আমার ইচ্ছার সঙ্গে সুদর্শন বাবুর এখানে থাকা না থাকার কি কোন সম্বন্ধ আছে কাকাবাবু?

দৃঢ়স্বরে জাহ্নবী বললেন: আছে। এই ঘরে একদিন পাটনার সেই ডানপিটে ছোঁড়াটাও এসেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে মেলা-মেশা করতে কথাবার্তা চালাতে তো তোমার স্ফূর্তির অভাব হয়নি! তার চেয়েও

সুদর্শন আমাদের ঢের বেশী আপনার এবং বড় ঘরের ছেলে। তার উপর সে আমাদের হিতৈষী। সেই ডানপিটে ছোঁড়া প্রতাপ আমাকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে যায়—তারপর সে অপঘাতে প্রাণ হারালেও আমি সে অপমান ভুলতে পারিনি। তার লাসটাকেও যদি পাওয়া যেত, আমি তার ছাল ছাড়িয়ে গায়ের সে ঝাল মেটাতাম। মনে ভারি লেগেছে বলেই তার কথাটা আমাকে তুলতে হলো। আমার দুঃখ এই যে, দুর্গা সেই ছোকরাকে তোয়াজ করতে পেরেছে, অথচ আমাদের আত্মীয়, হিতৈষী হোয়েও এই সুদর্শন—

কাকার কথাগুলো বুঝি তীরের মত বিঁধছিল দুর্গার কানে—এইখানে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে দুর্গা তাড়াতাড়ি বলে উঠল: প্রতাপ বাবুর কথা এখানে নাই বা তুললেন কাকাবাবু, অত কথা বলবারই বা কি দরকার—আপনি স্পষ্ট করেই বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রীর আরক্তিম মুখখানার দিকে চেয়ে জাহ্নবী তাঁর কথার উচ্ছ্বাস দমন করে একটু শান্ত ভাবেই বললেন: আমার ইচ্ছা, সুদর্শনকে তুমি পর না ভেবে সহজ ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলো—মেলামেশা কর। সেই প্রতাপ ছোকরার সঙ্গে—

দুর্গার চোখের মণি দুটো বুঝি ধক ধক করে জ্বলে উঠল তখনই; কণ্ঠস্বরেও তার আভা পড়ল যেন; দৃপ্তস্বরে সে বলল: প্রতাপবাবুর কথা ছেড়ে দিন কাকাবাবু—আপনার সুদর্শনবাবুর কথা যা বললেন, তাই হবে এখন থেকে, লজ্জা সঙ্কোচ সব মন থেকে সরিয়ে ফেলেই আমি ওঁর সঙ্গে মিশব—তোয়াজ করব।

গম্ভীর মুখে জাহ্নবী বললেন: বেশ, একথা শুনে আমি খুসী হলাম।

সুহাসিনীও এতক্ষণে স্বামীর কথার উপসংহারে বললেন: ছেলেটা তো এসে অবধি ছুটোছুটি করে গায়ের রক্ত জল করে ফেললে। যেটুকু

সময় বাড়ীতে থাকে, কথা বলার সঙ্গী পেলে তবু একটু শান্তি পায়। তাই ত দেখি—হয় মুখখানা বুজিয়ে একা ঐ ঘরখানায় বসে আছে, নয়ত বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর, ও যে বংশের ছেলে, ডেঁপোমী, জেঠামী বা নোংরামীপনার ধার দিয়েও যেতে শেখেনি।

সহসা দরজার পরদা নড়ে উঠল এবং পিছন থেকে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: আমাকে ডাকছিলেন দাদাবাবু?

ভিতর থেকে জাহ্নবী সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন: হ্যাঁ হে, এসো—

ভিতরে ঢুকতেই সুদর্শনের দৃষ্টি পড়ল দুর্গার স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সপ্রতিভ বিহসিত মুখখানির উপরে; চোখাচোখীও হলো—এই দ্বিতীয় বার। প্রথম দিনের পর আর একটিবারও দুর্গা এভাবে চোখ তুলে কোনদিনই তাকায়নি তার পানে। আজ বুঝি এই অবাধ সপ্রতিভ দৃষ্টি তাকে বিস্মিত করল।

আড়চোখে সেটা লক্ষ্য করে জাহ্নবী বললেন: কিসের লজ্জা তোমার বলত? আর এভাবে আড়ষ্ট হয়েই বা থাক কেন? ব'স।

যে চেয়ারখানি হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি—সেখানে বসলে দুর্গার সঙ্গে মুখোমুখী হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্কুচিতভাবেই সুদর্শন সেই চেয়ারে বসে পড়ল।

কিন্তু বসবামাত্রই তাকে সোজা তাকাতে হলো; ফলে দুর্গার বিস্ফারিত চক্ষুর নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির সঙ্গে তার মুগ্ধ দৃষ্টির আবার সংযোগ ঘটে গেল। দুর্গা কিন্তু লজ্জায় চোখ নতও করল না, দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিল না, সেই সঙ্গে তার ঠোঁটে সহসা যেন হাসির রেখা ফুটে উঠল। সুদর্শনের মাথাটিও বুঝি ঘুরে গেল—তার সমস্ত অন্তর মথিত করে হর্ষের একটা শিহরণ জেগে উঠল শির শির করে।

জাহ্নবী বললেন: পাটনা থেকে আজ স্যার শঙ্করলাল ফোন করে-ছিলেন হে!

সুদর্শন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল : তাই নাকি ! কি বললেন ?

জাহ্নবী উত্তর করলেন : সেই মামুলী কথা—সব্যসাচীর পাত্তা কিছু পেলাম কি না ? কটা দিন সে চুপচাপ আছে বলে আমি যেন না নিশ্চিন্ত থাকি, আর—যে কেস্‌গুলো হয়ে গেছে, যেন ধামা চাপা দিয়ে না রাখি। ওগুলোর আস্কারা করা চাই—এর জন্যে ওঁর ঘুম নেই। এই সব বাঁধা কথা আর কি ! এই লোকটা যেন আমার পিছনে শনি হয়ে ঘুরছে।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি বললেন ?

জাহ্নবী উত্তর করলেন : বললাম, চেষ্টায় ত ক্রটী করছি না। তারপর তোমার কথা হলো। তোমার প্রশংসা আমার মুখে শুনে ঠাট্টা করে বললেন—'দেখো, শেষে যেন বাপের মত ওকেও সব্যসাচী বেকুব বানিয়ে তোমার আশায় না ছাই দেয় !'—ইতরটার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়, অথচ সইতেও হয়।

স্যার শঙ্করলালের কথা জাহ্নবীর মারফত শুনলেও সুদর্শন বরদাস্ত করতে পারল না। এই অনুপস্থিত পদস্থ মানুষটিকে লক্ষ্য করে সেও বেশ কড়া করে নিজের মন্তব্যটা ব্যক্ত করে গায়ের ঝাল ঝাড়তে চাইল ; বলল ; Do in Rome, as Rome does ! ছাতুর দেশেই লোকটার পাগলামী শোভা পায়। আপনি ভাববেন না দাদাবাবু, ঐ স্যারটির থোঁতা মুখ যদি ভোঁতা করতে না পারি, তাহলে গ্রেহাম সাহেবের কাছে আমার সাকরেদী করাই মিছে। একটা মাসের মধ্যে আমি ঐ বদমায়েস ডাকাতটাকে খুঁজে বার করবই—And I shall give him such a lesson, that he will never forget afterwards. এ আমি প্রমীজ করছি আপনার কাছে।

কথাগুলি সদর্পে বলে সে দুর্গার মুখের পানে তাকাতেই দেখল, সে যেন হাসিমুখে তার প্রতি কথাটি গিলছে কিম্বা মনে মনে মুখস্থ করছে।

জাহ্নবীও সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন: এ যদি তুমি পার সুদর্শন, তাহলে আমি তোমাকে ব্ল্যাংক চেকে নাম সহি করে দেব, অর্থাৎ তোমাকে আমার কিছুই অদেয় থাকবে না।

আশ্চর্য, জাহ্নবীর কথা শুনেই দুর্গাও মুখ টিপে হেসে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে বলে উঠল: কাকাবাবু দেখছি রূপকথার রাজার মতন পণ করে বসলেন—অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা! সুদর্শনবাবু দেখছেন কি—আপনারই পোয়াবারো! অতএব Hurry up to catch the সব্যসাচী!

সবাই চমৎকৃত—দুর্গার মুখে এই সরস মন্তব্য শুনে। সুদর্শনের চোখ দুটো এক সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে ও প্রচ্ছন্ন উল্লাসে একেবারে কপালের দিকে ঠেলে উঠল।

জাহ্নবী সহাস্যে বললেন: সাবাস! এই ত চাই। শুনলে তো সুদর্শন দুর্গার কথা—তোমাকে কেমন চীয়ারআপ করলে! আর তুমি কিনা দুঃখ করছিলে, তোমার সঙ্গে কথা বলে না—দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়!

আনন্দে অভিভূত ও বিহ্বলপ্রায় হয়ে সুদর্শন আমতা আমতা করে বলল: না-না—তাহলে আমিই ভুল করেছিলাম, ওঁকে ঠিক বুঝতে পারি নি।

মৃদু হেসে সুহাসিনী বললেন: ভুল তো এখন ভেঙ্গে গেল; তাহলে বলি বাপু—দুর্গাই ওটা ভেঙ্গে দিলে, তুমিও তো মুখচোরা কম নও। এখন ভাই তোমার বরাত আর হাত-যশ!

২৯

জাহ্নবীর কাছে দুর্গা সেদিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোন দিক দিয়েই তার নড়-চড় হয়নি। নারী সুলভ সংকোচ বা লজ্জা কোনদিনই এই সপ্রতিভ মেয়েটির বলিষ্ঠ মনটিকে আড়ষ্ট করতে পারে নি বলেই প্রথম দিনে দক্ষ অভিনেত্রীর মত অত সহজ ভাবে সে সুদর্শনের সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট অভিভাবকদের সমক্ষে আলাপ করতে পেরেছিল। অধ্যাপক যদুপতিবাবু কন্যাকে শৈশব থেকেই অসঙ্কোচে ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে আলাপ-আলোচনা করবার মত শিক্ষা দিয়েছিলেন—দেশের বর্তমান অবস্থায় এর উপযোগিতা তিনি ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতেন। অবশ্য, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হোলে রক্ষা-কবচের মত যে গুণগুলি আয়ত্ত করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও তিনি সতর্ক ও সচেতন থাকতেন এবং সর্বপ্রযত্নে সেগুলিতে পটিয়সী করে তুলতে কন্যাকে রীতিমত তালিম দিতেন। সুতরাং সুদর্শন এই মেয়েটির সংস্পর্শে এসে অল্পদিনেই বুঝতে পারল যে, তার প্রতিভা শুধু বাকপটুতাতেই আবদ্ধ নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়েও এত অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে যে, বিতর্কে তাকে অতিক্রম করা তার মত উচ্চশিক্ষিত মেধাবী ছেলের পক্ষেও দুঃসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে বাঁকা পথে কূটবুদ্ধি চালিত করে সে এই প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যখন নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করত, দুর্গা তখন মনে মনে হেসে সহসা বিতর্ক বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে বলত: দেখুন, বইয়ের পাতা থেকেই আমাদের যা কিছু জানা শোনা, আপনাদের মতন বাইরে ঘুরে ফিরে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তো পাইনি কখনো, কাজেই ওসব নিয়ে তর্ক না করাই ভালো।

সুদর্শন ভাবে, সে খুব জিতে গেছে! দুর্গাকে অভিভূত করবার জন্য পুলিস বিভাগের বড় বড় কথা তুলে এবং নিজেকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে সে মনগড়া বহু উপাখ্যান সৃষ্টি করলেও দুর্গার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার ফাঁকি এমনি আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে যায় যে, বক্তার ব্যক্তিত্ব তাকে চমৎকৃত না করে তার অন্তরের প্রকৃত রূপটিই এই মিথ্যাচারের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। অথচ, শ্রোত্রী কিন্তু মুগ্ধার মত তন্ময় হোয়ে সুদর্শনের কথা শোনে, ভাবে ভঙ্গিতে কথায় জানাতে চায়—সুদর্শন যে কলকাতা পুলিসের উপরওয়ালা-দলের এক রত্নবিশেষ, সেটা সে উপলব্ধি করেছে!

সুহাসিনী আশ্বস্ত হন—মুখ টিপে হেসে জাহ্নবীকে বলেন: আমাদের সুদর্শন দেখছি তুখোড় ছেলে, এক দিনেই দুর্গার সঙ্গে এমনি ভাব জমিয়ে তুলেছে যে, কতকাল ধরেই যেন ওদের জানা-শোনা, কতদিনেরই সদ্ভাব!

জাহ্নবী প্রসন্ন মুখে উত্তর করেন: এটা খুব সুলক্ষণ। সুদর্শন যখন দুর্গার মত চাপা মেয়ের মনের ঢাকাটি এত সহজে খুলতে পেরেছে, তখন সব্যসাচীর মুখোস-খানাও ওর পক্ষেই খোলো সম্ভব হবে। আর, এর উপরে ওর ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে। ব্যাপারটির কিনারা যদি ও করতে পারে, উন্নতি তো আছেই, তার উপরে ফাউ—এই দুর্গা।

সুহাসিনী সহাস্যে বলেন: তুমি দেখে নিও, ও তোমার মুখ রাখবেই ঐ সব্যসাচী ডাকাতকে ধরে।

সময় সময় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে দুর্গা সম্পর্কে বিতর্কও বাধে। সুহাসিনী বলেন: তুমি যে দুর্গাকে নিজের সম্পত্তির মত ভেবে এইসব কল্পনা কর, কিন্তু ওর বাপের কথা ভেবেছ? বড় ঠাকুর যদি—

মুখখানা গম্ভীর করে জাহ্নবী উত্তর করেন: দাদার কথা বলছ? এ যুদ্ধ শেষ হবার আগে দাদার মুক্তির কোন আশা নেই। কাজেই তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা আমি ভাবি না। দুর্গার ভার যখন আমাকে নিতে হয়েছে,

তার ভবিষ্যৎ যাতে ভালো হয়—আমাকেই সেটা দেখতে হবে। সুদর্শনের মত সৎপাত্র পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

দুর্গাকে উপলক্ষ করে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে সময় এইসব কথা হয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে বিচ্চু সেগুলি যেন গিলতে থাকে। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সরে যায়, তারপর দুর্গার কাছে গিয়ে একটি একটি করে সব বলে; দুর্গার মুখখানি অমনি হাসিতে ভরে যায়—সে হাসির রূপ আলাদা। দুর্গার মনে পড়ে প্রচলিত একটি প্রবচনের কথা—'মিটমিটে ছেলেগুলোই ডানের মত মেয়েদের মাথা খায়!' সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে থাকে, এক জাতের মানুষ আছে, লোকের কাছে মিষ্টি কথায় শিষ্ট ভাব-ভঙ্গিতে জানাতে চায় যে, তারা ভারি ভালো—মনের মধ্যে কোন কদর্য ভাব, এমন কি কালো দাগটুকুও নেই! কিন্তু এমন একটি ক্ষণ আসে, যখন লোভের ছোঁয়াচ পেয়ে তাদের ভিতরকার সেই শান্ত-শিষ্ট রূপটি সংকোচের পরদা ভেদ করে অতি বিশ্রী ভাবে ফুটে ওঠে। তখনই সেই কদর্য মূর্তি ঐ প্রবচনটি মনে করিয়ে দেয়। দুর্গার সংস্পর্শে এসে সুদর্শনও ক্রমে ক্রমে দুর্গার কাছে রহস্যময় হোয়ে ওঠে। মানুষের আসল রূপ দেখবার দৃষ্টি দুর্গা অনেক আগেই পেয়েছে। সেই জন্যেই প্রথম দিন প্রথম দর্শনেই সে এই প্রিয়দর্শন ছেলেটীর চোখ দুটির ভিতর দিয়েই তার ভিতরের রূপটি ধরতে পেরেছিল। কাকা ও কাকীমার মুখে সুদর্শনের চারিত্রিক প্রশস্তি শুনে দুর্গার মনে হতো—এই ছেলেটি যদি কোনদিন তার পিতার সামনে শিক্ষার্থীরূপে গিয়ে দাঁড়াত, তাহলে তিনি সর্বাগ্রে তার চরিত্র শোধনের ব্যবস্থা দিতেন এবং তাঁর শিক্ষাধীনে হয়ত এর অন্তর্নিহিত রূপটিরও পরিবর্তন ঘটত।

অগ্নিশিখার মত দুর্গার রূপজ্যোতির প্রখর আভায় প্রথম দর্শনেই সুদর্শনের চোখ দুটি ঝলসে গিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চোখের উপর

সংকোচের পরদাটি এমন ভাবে টেনে দেয় যে, তার সেই আপাত মধুর ভদ্রতায় জাহ্নবী ও সুহাসিনী সহজেই মুগ্ধ না হোয়ে পারেন নি। দুর্গার এ সব বালাই কোন দিনই ছিল না—সাধারণত বাঙ্গালী মেয়েরা অপরিচিত পুরুষের সংশ্রবে এলে যেভাবে সলজ্জ সংকোচে আড়ষ্ট হোয়ে পড়ে, পিতার শিক্ষায় শৈশব থেকেই তার প্রভাব অতিক্রম করতে অভ্যস্ত থাকায়, দুর্গার আচরণে যেমন কোন সংকোচের নিদর্শন পাওয়া যায় নি, তেমনি কোন রকম আন্তরিকতাও কথায় বা ভাব ভঙ্গিতে সে প্রকাশ করে নি। চায়ের টেবিলে অসংকোচেই সে চা পরিবেষন করে, অন্যের অলক্ষ্যে সুদর্শন অতি সন্তর্পণে চুরি করে তার দিকে তাকালেও সে স্থির থাকে, মুখখানা লজ্জার পরশে আরক্ত হোয়ে ওঠে না; অথচ এই রূপবান প্রিয়দর্শন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ছেলেটির সঙ্গে মিলে মিশে আলাপ করবার কোন রকম আগ্রহকেও সে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ যে নবাগত এই ছেলেটিকে ক্রমশঃ অতিষ্ঠ করে তুলেছে—এমন কি সব্যসাচী ডাকাতের রহস্যোদ্ঘাটন ব্যাপারে পুলিস সুপারকে সাহায্য করার চেয়ে এ বাড়ীর এই আশ্চর্য মেয়েটির দুর্গম অন্তর রাজ্যের রহস্যোদ্ঘাটনেই যে তার উৎসাহ গভীর ভাবে উদগ্র, দুর্গা সেটি ভালো-ভাবেই বুঝতে পেরে মনে মনে যখন কৌতুক বোধ করছিল, সেই সময় সুদর্শনের প্রতি তার এই উপেক্ষাকে আতিথেয়তার ত্রুটি সাব্যস্ত করে পিতৃব্য যেভাবে কটাক্ষ করলেন, দুর্গার মত মেয়ের অন্তর তাতে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহোন্মুখী হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে যেভাবে দুর্গা আতিথেয়তার ত্রুটি স্খালনে অতিমাত্রায় সপ্রতিভ ও প্রগলভ হোয়ে উঠল, তাও বিস্ময়াবহ।

এই বিস্ময়টা জাহ্নবী ও সুহাসিনীর চেয়ে সুদর্শনকেই গভীরভাবে অভিভূত করায় তার মনে এই ধারণাই প্রবল হেয়ে ওঠে যে, এ বাড়ীতে

তার আসা মাত্রই শুভক্ষণে তাদের মধ্যে চকিতে যে শুভদৃষ্টি হোয়েছিল, অতিরিক্তভাবে এই চাপা মেয়েটির সমগ্র চিত্ত তাতে তার প্রতি আকৃষ্ট হোয়ে পড়লেও সে শুধু এমনি কোন সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। এর ফলে, দুর্গার অকুণ্ঠ আলাপে সুদর্শনের তথাকথিত লজ্জা সংকোচের পরদা উদঘাটিত করে তার লোভাতুর মনটির নগ্নরূপ এমনি বিশ্রীভাবে প্রকাশ করে দিল যে, তার মত ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত যুবার পক্ষে কোনক্রমেই যা সুশোভন নয়। ঝাঁ করে অমনি দুর্গার স্মৃতির পাতায় সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে সেই বিখ্যাত প্রবচনটি—'মিট-মিটে ডান মেয়ে খাবার যম।' সদ্য পরিচিতা নারীর অন্তররাজ্যটির উদ্দেশে এত সত্বর এই ছেলেটির এরূপ দুঃসাহসী অগ্রগতি দেখে সে ভাবতে থাকে—দুর্জয় ও দুর্গম ভেবে যে দুর্গটীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকত সে, এখন দুর্গ-স্বামিনীর সহৃদয়তার পরিচিতি তার মনে এই দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে যে, দুর্গও সে করতলগত করে ফেলেছে।

কল্পিত এই আনন্দানুভূতি পরদিনই সুদর্শন মুখেই প্রকাশ করে ফেলল : আপনি কিন্তু খুব চাপা মেয়ে—মহাভারতের কুন্তীকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

মুখ টিপে হেসে দুর্গা প্রশ্ন করল : ঐ উপমাটি কেন দিলেন—বলবেন দয়া করে ?

একটু গম্ভীর হোয়ে সুদর্শন বলল : আমার প্রশ্ন থেকে আপনিই বলতে পারবেন। আচ্ছা, আমার এখানে আসাটা—কালকের তারিখটা ধরে পুরো দশ দিন হলো না ?

সুদর্শনের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দুর্গা উত্তর করল : তা হবে।

বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করে সুদর্শন বলল : তাহলে হিসেব করুন ত, কতগুলো ঘণ্টা হয়—দশটা দিবারাত্রির ঘণ্টা হিসেব করলে দু শো চল্লিশ ঘণ্টা হয় কি না ?

মনে মনে কৌতুক বোধ করে মৃদুস্বরে দুর্গা বলল : তা হয়।

সুদর্শন তেমনি গম্ভীর মুখেই বলে চলল : এ থেকে দৈনিক দশটি ঘণ্টা বাদ দিন ; কারণ স্নানাহার আছে, নিদ্রা আছে, আজ্জে বাজে কাজও কিছু আছে। তা হোলে, দশ দিনে একশো ঘণ্টা বাদ দিয়ে হাতে থাকে একশো চল্লিশ ঘণ্টা। এখন হিসেব করে বলুন—ক্ষতি কতটা করেছেন ?

চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে দুর্গা বলল : আমি তো আপনার মতন পণ্ডিত নই, অঙ্ক শাস্ত্রে অত মেধাও নেই। তা ছাড়া সময় ধরে এভাবে লাভ লোকসানের হিসেবও খতাইনি কোন দিন। কাজেই, আপনার কথাটা যে দুর্বোধ্য থেকে যাচ্ছে সুদর্শন বাবু !

মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে সুদর্শন বলে উঠল : তাহলে কি আমি বুঝব—আপনি একবারে 'হোপলেস' ? যে মেয়ের চেহারার এমন চটক, চোখ দিয়ে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটি ফুটি করছে, তার পেটে বিদ্যে নেই—ম্যাথামেটিকে এমন কাঁচা ? না এ অসম্ভব—হোতেই পারে না। সত্যিই কি এমন সোজা হিসেবটি আপনি বুঝতে পারেন নি ?

মুখখানা একটু ভার করে দুর্গা উত্তর দিল : আপনি হোচ্ছেন, কলকাতার ছেলে—পৃথিবীর মধ্যে একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, তার ওপর কত দিক দিয়ে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন—ছাতুর দেশের মেয়ে আমি, আপনার তুলনায় আমার শিক্ষা ঠিক যেন পাহাড়ের কাছে উই ঢিপি, কাজেই আপনার শিক্ষিত মনের অভিব্যক্তি আমি কি করে বুঝতে পারি বলুন ? গত দশটা দিনে আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি, সেটা খুলেই বলুন না !

সুদর্শন বলল : আমাকেই বলতে হবে ? বেশ, তাহলে কাল থেকে আজকের হিসেবটা আপনি ধরুন ; অর্থাৎ, চায়ের টেবিলে আপনি

মুখ খোলবার পর যতগুলি কথা আপনি বলেছেন—তার হিসেব। আচ্ছা, কালকের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে এখন পর্য্যন্ত অন্ততঃ আমরা পুরো দুটি ঘণ্টা কথা বলেছি। এই সময়ে যে শব্দগুলি আপনার ঐ শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয়েছে, সেগুলো গণনা করলে কত হবে মনে করেন? খুব কম করে ধরলেও দু হাজারের কম নয়। অতএব, ভেবে দেখুন—এক ঘণ্টায় যদি হাজার শব্দ আপনি সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে গত দশ দিনের ঐ একশো চল্লিশ ঘণ্টায় কত হাজার শব্দ নির্গত হোয়ে আমার মনোরাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করত বলুন ত? একে ক্ষতি করা বলে না? ক্ষতি আপনি করেন নি—মুখখানা অনর্থক বন্ধ করে রেখে? কুন্তীদেবীও নাকি এমনি করে মুখ বন্ধ করে পঞ্চপাণ্ডবের যে বিরাট ক্ষতি করেছিলেন, তা অপূর্ণ থেকে গেছে! এ অবস্থায় আমার উপমাটি কি ভুল হোয়েছে দুর্গাদেবী?

হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষে সুদর্শনের প্রগলভ মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গা উত্তর করল: আপনার কিন্তু হিসেবে গোড়াতেই গলদ হয়েছে সুদর্শন বাবু! আমাদের আলাপের পর আপনিই যে হারে শব্দ বর্ষণ করছেন, আর সেগুলি এতই অভিনব যে,—আরো আগে আপনারই মুখর হওয়া উচিত ছিল। তাতে আমাদের ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হোতে পারত। এর জন্যে আমাকে অপরাধী করা আপনার উচিত হয় নি কিন্তু।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্গার মুখের পানে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি করে সুদর্শন বলল: বাঃ! আমার এত বড় আইডিয়াটার আপনি তারিফ না করে দোষটা আমার ঘাড়েই চাপাচ্ছেন। আমার সৃষ্টি করা দামী কথাগুলোর কোন গুরুত্বই আপনি স্বীকার করতে চান না?

দুর্গার মুখের হাসিটুকু তখনো মিলিয়ে যায় নি, ওষ্ঠের দিকে সেটি আরো একটু ফুটিয়ে তুলে সে বলল: আপনি যে আনাড়ীর মতন

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে হাত বাড়িয়েছেন সুদর্শন বাবু! হিসিবি মানুষের তো এটা লক্ষণ নয়!

স্থির দৃষ্টি দুর্গার মুখে নিবদ্ধ করে সুদর্শন বলল: আপনি বলছিলেন, আমার কথা দুর্বোধ্য! কিন্তু এখন দেখছি, কথার মায়াজালে আপনিই আমাকে জড়িয়ে ফেলেছেন!

মৃদু হেসে দুর্গা বলল: আমি চিরদিনই আশাবাদিনী সুদর্শন বাবু, মায়াবাদে আমার আস্থা নেই। আপনি তো কলেজে পড়েছেন, বলুন তো—প্রফেসরের একশো চল্লিশ ঘণ্টার লেকচারগুলো অবহেলা করে, নিদেনকালে একদিনের ঘণ্টাখানেক লেকচার শুনেই কি সেগুলো মেক-আপ করা যায়?

সুদর্শন এতক্ষণে কথাটা বুঝল এবং মুখখানা শক্ত করে সদর্পে উত্তর করল: নিশ্চয়ই; প্রফেসরের লেকচারে য়্যাটেণ্ড না করলেও—এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি যে একশো চল্লিশ ঘণ্টার নোটস্‌গুলো সব জেনে নেবার ক্ষমতা রাখি! জানেন তো, এ যুগে যারা হিসিবি আর চালাক, তার সট-কার্ট—অর্থাৎ কিনা সোজা রাস্তার সন্ধান রাখে। আগে কলকাতা থেকে দেওঘর আসতে দশদিন সময় লাগত, ট্রেণে এই পথ সাত ঘণ্টায় আসা যায়, আর এরোপ্লেনে উঠলে এক ঘণ্টাও লাগে না। অতএব, আপনি মনে মনে হিসেব করে নিতে পারেন যে, এরোপ্লেন চালিয়েই আমি আপনার মনোরাজ্যে পাড়ি দিয়েছি।

চোখ দুটো বিস্ফারিত ও মুখশ্রী আরো পরিস্ফুট করে দুর্গা বলে উঠল: তাহলে আপনার আর একটা পরিচয়ও পেলুম। আপনি শুধু দক্ষ হিসেবনবিশ নন, সেই সঙ্গে মনোরাজ্যে পাড়ি জমাতেও পারেন!

গম্ভীর মুখে সুদর্শন বলল: সাহসী, হিসেবী আর শক্তিমানদের পক্ষেই এটা সম্ভব। ইতিহাসে পড়েন নি—জুলিয়াস সিজার এসিয়ায় এসেই

বলেছিলেন—এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম। তারপর আফ্রিকায় গিয়ে মিশর-রূপসী ক্লিওপেট্রাকে জয় করতেও তাঁর এক ঘণ্টার বেশী সময় বোধ হয় প্রয়োজন হয় নি।

কথাটা শুনেই দুর্গা খিল খিল করে হেসে উঠল। চমকে উঠে সুদর্শন তার সেই হাস্যোজ্বল মুখখানার পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল: অমন করে হেসে উঠলেন যে?

হাসিমুখেই দুর্গা কথাটার উত্তর করল: আপনার আইডেনটি-ফিকেশনের মহামানুষটিকে দেখে! ভাগ্যিস ইতিহাসের পাতায় সিজার নামে ঐ মানুষটির কথা ছিল—নইলে দুঃসাহসিক প্রেমিকদের দশা যে কি হতো তা ভাবতেও ভয় হয়। মুশকিল হয়েছে মেয়েদের; যদি তারা পথে ঘাটে, ট্রেণে জাহাজে, কিম্বা কোন সভায় বা মজলিসে এমনি দুঃসাহসী মানুষদের পাল্লায় পড়ে মনের কবাটটি একটু খুলে দিলে, কিম্বা প্রাণ খুলে একটু হাসলে—তাহলে আর রক্ষে নেই, অমনি ঐ সিজারী-ভূত তাদের ঘাড়ে চেপে মুখ দিয়ে সিজারের কথাগুলি বলিয়ে নেবেই, জাঁক করে তারা বলতে থাকবে—ভিনি, ভিডি, ভিসি; এলুম, দেখলুম, জয় করলুম! তা বলে মনে করবেন না যেন, কথাগুলো বানিয়ে বলছি—অনেকগুলো নজীরও আছে, দেখাতে পারি।

কথাটা শুনে সুদর্শন দমল না, কিম্বা কথাটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টাও করল না, গলার স্বরে জোর দিয়ে সে বলল: সিজারের ভূত যাদের ঘাড়ে চাপে, তারা কখনো পিছোয় না—জিৎ জেনেই এগিয়ে যায়। পরের কথা শুনে তো লাভ কিছু নেই—আমার ক্লিওপেট্রা কিন্তু নিজেই তাঁর অন্তর দুর্গের দ্বারটি আমার সামনে খুলে দিয়েছেন।

সুদর্শনের ঘরে টেবিলখানির সামনে দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসে দুজনের সংলাপ চলেছিল। কথাগুলি শেষ করেই সুদর্শন সহসা সামনে

ঝুঁকে টেবিলের উপর ন্যস্ত দুর্গার ডান হাতের প্রকোষ্ঠটি দুহাতে ধরে সবলে একটু চাপ দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সুদর্শনের মনে হলো, বুঝি তার উভয় হস্তই এক সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রচণ্ড চাপ-পৃষ্ট হোয়ে আড়ষ্ট হোয়ে পড়েছে এবং পদনখরপ্রান্ত থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সমগ্র দেহটিও মুহূর্তমধ্যে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হোয়েই সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, কঙ্কণভূষিত কমনীয় করপল্লবদুটি সংযুক্ত করে দুর্গা কৌতূহলহীন অলস দৃষ্টিতে তার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির পানে চেয়ে আছে!

ঠিক এই সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিচ্চু—তার হাতে একখানি চিঠি।

৩০

এই আকস্মিক আঙ্গিক অবসাদে সুদর্শন রীতিমত বিহ্বল হয়েই পড়েছিল, পরক্ষণে বাড়ীর মূক ভৃত্য বিচ্চুর হাতের চিঠিখানার উপরে তার আড়ষ্ট দৃষ্টি পড়তেই চোখের তারা দুটিও বুঝি সেই সঙ্গে স্থির হয়ে গেল! রক্তবর্ণের লিফাফাখানি সগর্বে যেন জানাতে চাইছে—সাধারণের দলে সে নহে, অসাধারণ লোকের পরিচিতি বহন করে সে কুখ্যাত হয়েই আছে। হাত বাড়িয়ে বিচ্চুর হাত থেকে তাকে নেবার সময় নিজের অজ্ঞাতেই হাতখানি যে কেঁপে উঠেছিল, সুদর্শনের চোখে সেটা ধরা না পড়লেও, তার সামনের দুটি প্রাণীর দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় নি। তাই চিঠিখানার দিকে সুদর্শনের দুই চক্ষু যখন গভীর ভাবে নিবদ্ধ, সেই অবসরে বিচ্চু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দুর্গার মুখের পানে একটিবার চেয়েই—যেমন ক্ষিপ্রভাবে সেঁধিয়েছিল ঘরে, তেমনি ক্ষিপ্র-গতিতেই অদৃশ্য হলো।

চিঠিখানা পড়ে সুদর্শনের হুঁস হলো যে, কিভাবে এ চিঠি বিচ্চুর হাতে এলো—সেকথা ত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি! তার সামনে যে একটু আগেকার প্রিয় সঙ্গিনীটি বিদ্যমান রয়েছে ও সকৌতুকে তার মুখ ভঙ্গি লক্ষ্য করছে, সে কথা ভুলেই বুঝি গেল সে, উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকতে লাগল: বিচ্চু, বিচ্চু, বিচ্চু—

সহাস্যে মৃদুস্বরে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: হলো কি? একঘণ্টা আলাপের পরও মানুষ যে এমন বদলাতে পারে, তা জানতুম না। চিঠিখানা যে সব ভুলিয়ে দিলে দেখছি!

চোখে মুখে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট করে সুদর্শন বলল: আমার মনের অবস্থা আপনি বুঝবেন না, ঐ বিচ্চুকে আমার এখুনি দরকার—

দুর্গাকে অতিক্রম করে সুদর্শন সবেগে বাইরে যাবার জন্য অগ্রসর হোতেই বাধা দিয়ে দুর্গা বলল: সব্যসাচীর চিঠি আপনার মনে যে কালবোশেখের ঝড় তুলেছে, তা তো বুঝেছি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিটাও হারিয়ে ফেলছেন যে!

রুক্ষ স্বরে সুদর্শন বলল: কি বলতে চান আপনি?

তেমনি মৃদু হেসে দুর্গা বলল: বলছি যে, বোবারা শুনতে পায় না এটা সবাই জানে। সারাদিন ধরে চেঁচালেও বিচ্চুর সাড়া পাবেন না। আপনি স্থির হয়ে চিঠিখানা আর একবার পড়ুন; জানি তো, অনেকবারই পড়তে হবে! আমি ততক্ষণ বিচ্চুকে ডেকে আনছি।

বলেই দুর্গা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ অবস্থায় সুদর্শনের মনে লজ্জার প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তার সমস্ত চিত্ত তখন বিষিয়ে উঠেছে, তার মাথার মধ্যে জ্বালা ধরেছে। তার এখানে আসার পর সব্যসাচীর আর কোন উপদ্রব না হওয়ায় সে নিশ্চিন্ত এবং মনে

মনে অনেকটা আশ্বস্ত হোয়েছিল। কিন্তু এই পত্রখানা তার সে ধারণা নস্যাৎ করে মস্তিষ্কে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গা ফিরে এসে বলল : শুনুন সুদর্শন বাবু, আপনার সব্যসাচী বন্ধুর কাণ্ড! থানার একজন চৌকিদার বিচ্চুকে পথে দেখতে পেয়ে চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বলে—সাহেব ওখানা ছোট সাহেবকে অর্থাৎ আপনাকে দিতে বলেছেন। ও তাই চিঠিখানা নিয়েই ছুটতে ছুটতে এসে আপনাকে দিয়েছে।

সুদর্শন রুক্ষ স্বরে বলল : কিন্তু ও কি শোনে নি যে আপনার কাকা সবাইকে ডেকে বলে দিয়েছেন, অচেনা কোন লোক চিঠি আনলেই তাকে চিঠি শুদ্ধ ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

মৃদু হেসে দুর্গা বলল : কাকাবাবুর কথাটা নিশ্চয়ই সব্যসাচী শুনে থাকবে। তাই কাকাবাবুর নাম করেই সে চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্যে পাঠিয়েছিল, সেই চৌকিদারের হাতে। সে যে ছদ্মবেশী, ও বেচারা কি করে জানবে বলুন? আমার কাছে সব শুনেই সে ছুটেছে সেই চৌকিদারের সন্ধানে, আর কাকাবাবুকে খবরটা দিতে। এখন চিঠির খবরটা বলুন—সব্যসাচী কি এবার আপনাকেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে?

দুর্গার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সুদর্শন বলল : সেটা অনুমান করেই বুঝি খুব খুসী হোয়েছেন?

মুখখানা একটু গম্ভীর করে দুর্গা বলল : এ কথা বললেন কেন?

সুদর্শন পালটা প্রশ্ন করল : আপনিই বা ঐ চ্যালেঞ্জের কথা তুললেন কেন?

সহজ ভাবেই দুর্গা বলল : চিঠিখানার রং দেখেই যেভাবে আপনি চমকে ওঠেন, তারপর পড়তে পড়তে আপনার মুখে চোখে যে ভঙ্গি ফুটে ওঠে, তাতেই ভেবেছিলুম ও লাল পরোয়ানা আপনাকেই দিয়েছে।

উদ্ধত কণ্ঠে সুদর্শন বলল: আমাকে পরোয়ানা পাঠানো মানেই সাক্ষাৎ শমনকে স্মরণ করা। আপনার সব্যসাচী জেনেছে যে, সুদর্শন বোস তার যম হোয়েই এসেছে।

শ্লেষের সুরে দুর্গা উত্তর করল: তা আসুন—কিন্তু সব্যসাচী লোকটি যে আমার—একথা বললেন কি ভেবে?

সুদর্শনও তার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের ঈষৎ আভাস দিয়ে বলল: আপনার বলার ভঙ্গি দেখে! সব্যসাচীর বাহাদুরী ব্যাপারে আপনি যে খুসীতে ফেটে পড়েন, আপনার মুখে হাসি ধরে না—এ আমি শুনেছি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: আমার কাছে?

সুদর্শন বলল: না—আপনার কাকাই আমাকে বলেছেন। তাঁর কথা শুনে মনে হলো, আপনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন, ঐ চোরা ডাকাতটার ইতর ব্যাপারে তিনি অপদস্ত হোচ্ছেন দেখে মনে মনে আপনি খুসী!

মুখখানা শক্ত করে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: কাকা আপনাকে একথা নিজের মুখে বলেছেন?

একটা ঢোঁক গিলে, মুখখানা কিঞ্চিৎ বিকৃত করে সুদর্শন বলল: ঠিক খোলাখুলি ভাবে অবিশ্যি বলেননি, তবে তাঁর সেই কথার মধ্যে আপনার সম্বন্ধে এমনি সুর ছিল। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি.না, আমি তখনি প্রতিবাদ করেছিলাম।

গম্ভীর মুখে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: তার মানে? কালই আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হোয়েছে, তার আগে আপনার সঙ্গে মিশিনি, কথাও বলিনি। তাহলে বলুন তো, আলাপের আগেই আমার প্রতি আপনার এতখানি দরদ জাগল কেন?

মুখের ভঙ্গি ও চোখের দৃষ্টির রূপটি পলকে পরিবর্তন করে একটা তরল হাসি ফুটিয়ে সুদর্শন একটু গর্বিত ভাবেই কথাটার জবাব দিল:

শুনবেন ? যেদিন আমি প্রথম এ বাড়ীতে ঢুকি, আপনার সঙ্গেই সর্বাগ্রে চোখাচোখী হয়। সেই থেকেই আমি একটা আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করি, আর—সেই সময় আপনার মুখখানা এক নজরে দেখেই বুঝতে পারি যে, মনের ভিতরেও স্থান আমি পেয়েছি।

মুখের হাসির সঙ্গে চোখের কটাক্ষ মিশিয়ে রহস্যময়ীর মত সুদর্শনের মনে রীতিমত একটা চাঞ্চল্য তুলে দুর্গা বলল : তাই নাকি ? তাহলে আপনার নজর তো সংঘাতিক ! মুখখানা দেখেই আপনি আমার মনের ভিতরটা সব জেনে ফেলেছিলেন সেই দিনই ? আচ্ছা, আমার কাছ থেকে সাড়া কিছু না পেয়েও তখন কি ভাবতেন তা কি বলবেন ? শুনতে কিন্তু ভারি কৌতূহল হোচ্ছে।

গম্ভীর ভাবেই সুদর্শন বলল : যেটা ভাবা স্বাভাবিক তাই, নারীর সম্বন্ধে যেটা চিরন্তনী সত্য।

দুর্গা : সে সত্যটি কি সুদর্শন বাবু ?

সুদর্শন : মনের কথা চেপে রাখবার চেষ্টা—প্রত্যেক মেয়েই যে বিদ্যায় ওস্তাদ—এই আর কি ! আমি তখন ভেবেছিলাম যে, আমার সঙ্গে আলাপ করতে আপনি একান্ত উৎসুক, কিন্তু মুখ খুলতে সংকোচ হোচ্ছে।

দুর্গা : সেই জন্যেই বুঝি আপনিও আমার মনের দৌড়টা পরীক্ষা করতে অসম্ভব রকমের মুখচোরা সেজে ছিলেন ? যেন, অত্যন্ত ভাল-মানুষ, সোজা কথায় যাকে বলা হয়—গো-বেচারী ; মেয়েদের দেখলেই লজ্জায় কুঁকড়ে পড়েন, মুখখানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে যান, তারপর একটু ফাঁক পেলেই চুপি চুপি আড় চোখে তাকান—

সুদর্শন : আপনিই বা তখন আমার সম্বন্ধে মনে মনে কি ভাবতেন বলুন ত ?

দুর্গা : একটা প্রবচন মনে করতুম—তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

সুদর্শন : বুঝলাম না।

দুর্গা : এর ইংরিজী প্রতিশব্দটা বললেই বুঝতে পারবেন বোধ হয়। সেটা হোচ্ছে—Owls do not make monks আর বাংলা ভাষায় আরো খুলে বোঝাতে হোলে বলতে হয়—মিটমিটে ডান মেয়ে খাবার রাক্ষস!

সুদর্শন : আপনি যাই ভাবুন, আর ঠাট্টা করে এখন যাই বলুন, আমি কিন্তু আপনার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে খালি ভাবতাম—you are a plucky girl—awfully nice girl—তাই, আপনার কাছে আমার মনের দরজাটি খুলে দেবার জন্যে খালি উস্‌খুস্‌ করতাম।

দুর্গা : থামুন, আর বেশী বাজে বকবেন না। চিঠি পেয়ে নিজেই পড়লেন, শোনাতেও ভরসা নেই; আপনি আবার মনের দরজা খুলবেন!

সুদর্শন : আপনি কি ভাবছেন, চিঠিখানা আপনার হাতে দিতে আমি কুণ্ঠিত? আপনি জানবেন যে, কিছুই আপনার কাছে আমি চেপে রাখতে চাইনে—চিঠিবাজীর এই সব্যসাচী ডাকাতটির ওপর আপনার যত দরদই থাক! এই নিন্‌, পড়ে দেখুন—আপনার বন্ধু কি উপদেশ আমাকে খয়রাৎ করেছেন!

চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে সুদর্শন দুর্গাকে দিতে গেল, কিন্তু দুর্গা আপত্তির ভঙ্গিতে বলল : পরের চিঠি পড়বার অভ্যাস আমার নেই; ইচ্ছা হয় তো আপনিই পড়ে শোনাতে পারেন।

সুদর্শন স্থির দৃষ্টিতে দুর্গার মুখের প্যানে একটিবার চেয়েই বলল : বেশ আমিই পড়ছি, শুনুন।

অতঃপর সুদর্শন ভণিতা করে চিঠির কথাগুলি পড়তে লাগল :

প্রিয় সুদর্শন বাবু,

কলকাতার ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে আপনি এসেছেন সব্যসাচী নামে সমাজ-হিতৈষী মানুষটির মুখোস খুলে দিয়ে পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্রের মুখরক্ষা করতে। আপনার আসার পর থেকে সব্যসাচীর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে আপনি হয় তো ভেবেছেন—আপনার আগমন হওয়াতেই সে তার কর্ত্তব্য পালনে নিরস্ত হয়েছে। কিন্তু তার এই পত্রই আপনার ধারণা যে বদলে দেবে, তাতে ভুল নেই। এই কটা দিন অভিনিবেশের সঙ্গে সে আপনার প্রকৃতি ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করছিল; সে কার্য তার শেষ হয়েছে এবং বোঝা গেছে যে, পুলিস-সুপার আপনাকে এনে এক দম্ভের সঙ্গে আর এক দম্ভের সংযোগ ঘটিয়েছেন মাত্র। এযুগে দম্ভের কোন দামই নেই। জাহ্নবী মিত্রের দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যই সব্যসাচীর আবির্ভাব। যারাই তাঁর দম্ভকে স্ফীত করতে বদ্ধপরিকর ও সহায়—তাদের উপরেই সব্যসাচী চাবুক হাঁকরেছে। প্রত্যেকেই তারা সমাজদ্রোহী—সমাজের মানুষকে ঠকিয়ে পুঁজি বাড়াচ্ছে। আপনার তরুণ মন কি এদের সমর্থণ করবে? এই ধরুন—আগামী সপ্তাহের সাতটি দিনে যে সাতজন সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে সব্যসাচীর পরোয়ানা জারি হবে—প্রত্যেকেই তারা স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, অনাচারী ও অপরাধী; বর্তমান যুদ্ধের হিড়িকে ও-দেশের নজিরে যারা ভারতবাসীর জীবনযাত্রার বনেদী কাঠামো ভেঙে ফেলে এক বিপর্যয় ঘটাতে মেতে উঠেছে—এরা তাদেরই হাতের পুত্তলিকা। তথাপি, এই পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্র এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে কুন্ঠিত নন। যেমন: শিউকরণ আগরওয়ালা, মাঠুরাম মহাতো, বিশ্বনাথ পণ্ডিত, কাদের আলি খাঁ, অতীন্দ্রনাথ দে, সুরবক্স মোল্লা, গরীব সিং—এই সপ্তরথীর নাম ও পদবী আলাদা হোলেও, আসলে এরা এক জাতের লোক; অর্থাৎ এদের উদ্দেশ্য হোচ্ছে—দেশের লোকের সর্বস্ব শোষণ করে নিজেদের পরিপোষণ করা। এই ঝাড়খণ্ডের

জনবিরল অঞ্চল থেকে এরা নিত্য নূতন ফন্দী বার করছে, আর তাই চালু হোচ্ছে সারা দেশে। চানা, গম, ডাল, গুড়, লঙ্কা, তামাক প্রভৃতি বিহারেই বেশী উৎপন্ন হয়—এরা মাথা খেলিয়ে এইসব পণ্য ধরে রেখে বাজার মাত করবার যে চাল চেলেছে, তার খবর রাখেন আপনার পুলিস সুপার? এই সয়তানদের কারসাজীতে দু' আনা সেরের ছোলা ডাল কলাই প্রভৃতির দাম পাঁচ গুণ চড়ে যাবে। যে ভেলিগুড় গোরু মোষে খায়, টাকায় ষোল সতেরো সের বিকোয়, এদের চক্রান্তে তাই বিকোবে টাকা সেরে। চিনির ঘাটতির সুযোগ নিয়ে আগে থেকেই এরা ভেলি-গুড়ের বাজার মাত করবার মতলব ভঁাজছে। আপনি এসেছেন কোল-কাতা থেকে, এইদিকে নজর দিয়ে দেশের এবং সরকারের সত্যিকার উপকার করুন। সব্যসাচী আপনার মতি-গতি লক্ষ্য করে সেই অনুসারে কাজ করবে। তার লক্ষ্য—এই সব সয়তানকে সায়েস্তা করা। এ কথা বলতে—আর্থিক ও দৈহিক নিগ্রহ—দ্বিবিধই বুঝতে হবে। আপনি যদি এদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তি নিয়োগ করেন, তাহলে কোন কথা নেই—কিন্তু যদি দেখা যায় যে, আপনিও পুলিস-সুপারের মত এদের সমর্থক, তাহলে ঐ সয়তানের সঙ্গে আপনাকেও সায়েস্তা করবার জন্য সব্যসাচীর পারোয়ানা জারী হবে। আজ থেকে তিনটি দিন আমরা আপনার মতি-গতি লক্ষ্য করে তদনুসারে পরবর্তী কার্যে প্রবৃত্ত হব। অর্থাৎ পুলিস-সুপারের প্রভাবাধীন না হোয়ে আপনি উক্ত সাতজন অপরাধীর বিরুদ্ধে কাজ করেন তো ভালোই, নতুবা চতুর্থ দিন থেকে সব্যসাচীকেই সে-ভার গ্রহণ করতে হবে। বন্দে মাতরম্!—সব্যসাচী।

চিঠিখানা পড়তে পড়তেই মধ্যে মধ্যে সুদর্শন দুর্গার দিকে চেয়ে তার মুখভঙ্গি পরীক্ষার চেষ্টা করছিল। পড়ার পর তার গম্ভীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুদর্শন বলল: শুনলেন ত? এদেশে ডাকাতেও উপদেশ দেয়!

দুর্গা সহাস্যে বলল : লোকের ধারণা তো এক রকম নয়—শুনিছি, মহাবীর শিবাজীকেও কেউ কেউ ডাকাত বলেছে।

ভ্রূভঙ্গি করে সুদর্শন বলল : শিবাজীর সঙ্গে আপনি এই ইতরটার তুলনা করছেন ?

দৃঢ়স্বরে দুর্গা উত্তর দিল : তুলনা করিনি; কিন্তু চিঠিতে যে কথাগুলি ইনি লিখেছেন, সে কি সত্যিই ডাকাতের মনের সঙ্গে মেলে ? যে সব খবর উনি দিয়েছেন, আপনি এর আগে শুনেছিলেন ?

মুখখানা শক্ত করে সদর্পে সুদর্শন বলল : চোর ডাকাতের মনোবৃত্তি কি আপনার মত একটি মেয়ের কাছ থেকে আমাকেও শিখতে হবে ? এত বড় আস্পর্দ্ধা পাজীটার যে, পুলিস-সুপার মিত্রের কাজের ভুল ধরতে চায়! আসল কথা, আমাদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্যেই এই চাল ও চেলেছে। যারা সব বড় বড় মহাজন, তাদের উনি সায়েস্তা করবেন !

দুর্গা তেমনি হেসেই বলল : বেশত, ঐ সব বড় বড় মহাজনদের আড়তে সন্ধান নিয়ে দেখুন না—সত্যিই তারা অন্যায় কিছু করছে কি না ! খবরের কাগজে তো প্রায়ই পড়ি—জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে এক শ্রেণীর লোক চাইছে আঙুল ফুলে কলাগাছ হোতে !

রুক্ষস্বরে সুদর্শন বলল : খবরের কাগজওয়ালারা অমন অনেক কিছু লেখে—বাজে কথা বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করাই হোচ্ছে ওদের কাজ।

সহজভাবেই দুর্গা বলল : কিন্তু একটা কথা আছে—যা রটে, তা বটে ! পাঁচ টাকা মণের চাল যে, চল্লিশ টাকায় উঠবে, একথা কেউ কোনদিন ভেবেছিল ? চিনি নিয়ে যে মারামারি চলছে, তাতে অখাদ্য ভেলি গুড়কেই পরম খাদ্য ভেবে এর পর যদি কাড়াকাড়ি পড়ে, আশ্চর্য

হবার কিছু নেই! কিন্তু আশ্চর্য এইখানেই যে, আপনি এ খবরটার ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে নিজের জেদকেই ফাঁপিয়ে তুলছেন! সব্যসাচী লোকটার একটা কথা কিন্তু ভারি মিলে যাচ্ছে!

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: কোন্ কথা বলুন তো?

মৃদু হেসে দুর্গা বলল: আপনাদের যোগাযোগের কথাটা উনি লিখেছেন না—পুলিশ-সুপার আপনাকে এনে এক দস্তের সঙ্গে আর এক দস্তের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন?

মুখখান আরক্ত করে সুদর্শন বলল: আপনার এই কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার সম্বন্ধে মিষ্টার মিত্র যা বলেছিলেন, তা মিথ্যে নয়।

সহাস্থে দুর্গা বলল: অর্থাৎ এই সব্যসাচী সম্বন্ধে আপনাদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কোন মিল নেই, বরং একবারে উল্টো? তা কথাটা মিছে নয় সুদর্শন বাবু, নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, তফাৎটা কত বেশী। চিঠিতেই তো পড়লেন, ঐ লোকটি এই কদিনেই আপনাকে কেতাবের মত পড়ে ফেলেছেন; সেইজন্যেই আপনাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সব্যসাচীর পিছনে বৃথা ছুটোছুটি না করে ঐ সপ্তরথীর গুপ্ত রত্নের সন্ধান করুন, তাতে দেশের উপকার হবে, নিজেও খ্যাতিলাভ করবেন।

জ্বলন্ত দৃষ্টি দুর্গার মুখে নিবদ্ধ করে সুদর্শন বলল: তাহলে বলি শুনুন—এই সপ্তরথীর সুখ্যাতি আপনার কাকার কাছেই আমি শুনেছি। আপনার, সব্যসাচী বন্ধুর লক্ষ্যও যে এদের ওপরে—সে খবরও আমরা পেয়েছি। আপনার বন্ধুও সেটা জানতে পেরে, ওদের দুর্নাম রটিয়ে এই চিঠি-বাজী করেছে। এতে বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে এখন রীতিমত ভয় পেয়েছে। জানবেন—এই চিঠিই তার কাল হোয়েছে; আমি বলছি—সপ্তরথীর রথের ছায়াও স্পর্শ করা তার সাধ্যে কুলাবে না;

এবার তাকে ধরা দিতেই হবে। তার পরে আপনার সামনেই দেখানো যাবে—ডাকাতকে কি করে সায়েস্তা করতে হয়।

দুর্গাও ছাড়বার মেয়ে নয়, সুদর্শনের কথা শেষ হোতেই, সেও হাসতে হাসতে বলল: কিন্তু আমার মন যে উল্টো গাইছে সুদর্শনবাবু, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সপ্তরথীর রথচক্র সব্যসাচী ভেঙ্গে ফেলেছে, সেই সঙ্গে আপনাকেও নাস্তানাবুদ হোতে হোয়েছে তার হাতে।

এ কথার পর সুদর্শনের সুন্দর মুখখানি একেবারে যেন বদলে গেল—দুই চোখ কপালের দিকে তুলে মুখভঙ্গি বিকৃত ও বিশ্রী করে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: ঠাট্টার একটা সীমা আছে দুর্গাদেবী! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনার মনে এ রকম উলটো চিন্তার উৎপত্তি হলো কেন বলবেন? আপনার কাকাকে, আমাকে নিরাশ করে আপনার কল্পনা ঐ ডাকাতটার প্রতিই সদয় হোলো কি জন্যে?

দুর্গা এবার গম্ভীর মুখে বলল: শুনতে চান? আপনারা যাকে অন্যায় করছে ভেবে জব্দ করতে ক্ষেপে উঠেছেন, আমাদের মতন মেয়েরা তার সেই কাজের মধ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখে তাকেই সমর্থন করছে।

বিস্মিত কণ্ঠে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: কি বলছেন আপনি? আমাদের কর্তব্য বোধকে তুচ্ছ করে' তার সেই অন্যায়কেই আপনারা প্রশ্রয় দিতে চান?

স্নিগ্ধ স্বরে দুর্গা উত্তর করল: এই দস্তুর, সুদর্শনবাবু। এ সত্যকে নাই বা গোপন করলুম। মেয়েদের এই মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিই 'কোট' করছি, শুনুন।

সুদর্শন সবিস্ময়ে বলল: রবীন্দ্রনাথের কথা? তিনিও কি অন্যায়কে সমর্থন করেছেন?

সহাস্যে দুর্গা বলল: শুনুন না; তিনি বলেছেন—'কর্তব্য বোধকে

যারা অত্যন্ত সামলে চলে, মেয়েরা তাদের পায়ের ধূলো নেয় ; আর—যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোন বালাই নেই ন্যায় অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাধে।'

কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলেই দুর্গা খিল খিল করে হেসে উঠলো, সে হাসির আভায় সুদর্শনের মুখখানা কিন্তু প্রসন্ন হলো না—আড় চোখে দুর্গা চেয়ে দেখল, যেন একখানা কালো পরদায় সে মুখ ধীরে ধীরে আবৃত হোচ্ছে।

সব্যসাচীর এই উদ্ধত চিঠিখানা পাঠ করে জাহ্নবী মিত্র ক্ষিপ্তের মত এমনি উগ্র হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মূর্তি দেখে অফিস শুদ্ধ সকলের মনে হলো, সেই সব্যসাচী নামধারী মানুষটি যদি এ সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে আদিম যুগের হিংস্র মানুষের মত তিনি হয়ত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অঙ্গ প্রত্যংগগুলো নখদন্তে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতেন। সাহেবের কোপ দেখে অধস্তন কর্মচারীরা কেঁপেই অস্থির! টেবিলের উপর সবলে একটা মুষ্টাঘাত করে জাহ্নবী বললেন: ইতরটাকে ধরবার এই একটা ফুরসদ এসে গেছে। সমস্ত টাউন ঘিরে ফেলে ওকে—

সুদর্শন বলল: মুস্কিল হয়েছে স্যর, লোকটাকে আমরা কেউ দেখিনি। তবে সে যেই হোক, নিজের জালেই যে এবার জড়িয়ে পড়বে তাতে ভুল নেই।

জাহ্নবী বললেন: ফোন করে থানাদারদের এখনি খবর দাও—আজই সন্ধ্যার পর যেন এখানে এসে হাজির হয়। ওদের নিয়ে একটা মিটিং করা যাবে। আর ঐ সাতজনকেও মিটিংএ আসবার জন্যে চিঠি পাঠাও।

আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হোল। থানা অফিসারদের ফোন করে জানান হলো যে, সন্ধ্যার পর তাঁরা যেন হুজুরে হাজির হন। মহাজনদের গদীর উদ্দেশে চিঠি নিয়ে পিওন ছুটল সাইকেল চেপে।

সন্ধ্যার পর পুলিস-সুপারের খাস কামরায় একে একে সকলেই উপস্থিত হলেন। রোহিণী থানার দারোগা আহম্মদ আলি এখনো পর্য্যন্ত সুস্থ হতে পারেন নি—কাজেই তাঁর ভাতিজা আলিজানকে এবারও প্রতিনিধিরূপে হাজির হোতে হয়েছে। ইদানীং বিপিন বাবুর রোহিণীর বাসায় ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে আলিজানের সঙ্গে জাহ্নবীর ঘনিষ্ঠতাও কিছু নিবিড় হয়েছিল। এই প্রিয়দর্শন বাকপটু তরুণ যুবাটি স্বভাব মাধুর্যে জাহ্নবীকে যে বেশ আকৃষ্ট করেছে, এই বৈঠকে তার প্রতি সাহেবের সদয় ও প্রসন্ন ব্যবহার থেকেই সেটা সকলে উপলব্ধি করল। এমন কি, সব্যসাচী ডাকাতকে পাকড়াও করা সম্পর্কে আলিজানের কোন কোন যুক্তি খুব সমীচীন মনে করে জাহ্নবী গ্রহণ করবার নির্দেশও দিলেন।

সুদর্শনকে লিখিত পত্রে যে সাতজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর অসাধুতার উল্লেখ ছিল, তাঁরা জানালেন যে, ঐ ডাকুর কাছ থেকে কোন পত্রই তাঁরা এ পর্যন্ত পাননি। তাঁদের সম্বন্ধে উক্ত পত্রে যে সব দুর্নীতিমূলক অভিযোগ ছিল, তাঁরা ত একবাক্যে অস্বীকার করলেনই, উপরোক্ত সদম্ভে জানিয়ে দিলেন যে, এ হোচ্ছে তাঁদেরই প্রতিযোগীস্থানীয় বদমায়েসদের কাজ। সরকারের কাছে কনট্রাক্ট না পেয়ে, চালানীর কাজ বাগাতে অসমর্থ হোয়ে—ওরাই একটা ডাকুর দল খাড়া করেছে, আর, এইভাবে তাঁদের মত ইমানদার কারবারীদের হায়রাণী করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: তাই যদি, তাহলে যাদের ওপর আপনাদের সন্দেহ হয়—নাম বলুন।

নাম বলতে প্রথমত তাঁরা ইতস্তত করলেন; কিন্তু জাহ্নবী যখন অভয় দিয়ে বললেন যে, একথা চাপা থাকবে—আজ এখানে যে সব কথা হলো বা আপনারা যাদের নাম বলবেন, বাইরে তা প্রকাশ পাবে না,

আমরা তাদের উপর লক্ষ্য রাখব মাত্র—তখন ব্যবসায়ীরা এক সংগে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে পরামর্শ করে তাঁদের সন্দেহভাজন কতকগুলি লোকের নাম সাহেবের কাছে পেশ করলেন। নামগুলি এক নজরে পড়ে নিয়ে জাহ্নবী তাঁর পাশের আসনে উপবিষ্ট সুদর্শনের হাতে দিলেন। লিখিত নামের কোন ব্যক্তিই সুদর্শনের পরিচিত নয়; তাদের পেশা ও বাসা সম্বন্ধেও সে অন্ধকারে। এরপর জাহ্নবী সবার সামনেই লিখিত নামগুলি পড়ে বিভিন্ন থানার অফিসারদের অভিমত জানতে চাইলেন এই লোকগুলির সম্বন্ধে।

এই ব্যাপার নিয়ে বৈঠকে একটা বিতর্ক উঠল। অধিকাংশ থানা অফিসার এ-সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করলেন যে, এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীন-ভাবে কোন না কোন ব্যবসায় অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠাপন্ন। এঁদের কেউই বহিরাগত নন—পুরুষানুক্রমে এই অঞ্চলের বাসীন্দা। এঁরা কোন অন্যায় কাজ করেছেন বা সেজন্য অভিযুক্ত হোয়েছেন বলে তাঁদের জানা নেই। সুতরাং হঠাৎ সন্দেহের উপর নির্ভর করে এঁদের বিরুদ্ধে কোন রকম action নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু অল্প কয়েকজন অফিসার সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ও যুক্তি সমর্থন করে জানালেন যে, এঁরা যখন এত লোক থাকতে এই ক'জনের নাম করেছেন এবং এঁরা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল—তখন এই লোকগুলির উপর নজর রাখা ত কর্তব্যই বটে, উপরোক্ত তলে তলে গোপন তদন্ত করাও যুক্তিসিদ্ধ।

এই বিতর্কের পর আলিজান একটা প্রস্তাব করল। সে বলল: একটা কাজ করতে পারলে কিন্তু দুটো দিকই বজায় রাখা যায়।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: সে কাজটা কি?

আলিজান বলল: দেখুন—সব্যসাচী যেই হোক, তার এই চিঠির যে

একটা গুরুত্ব আছে, এটা ভেবেই আমাদের কাজ করতে হবে। এই চিঠিতে সে তিন দিন সময় দিয়েছে মিষ্টার বোসকে ভাববার জন্যে। তাহলে তিন দিনের আগে সম্ভবত সে নিজে কোন action নেবে না। চতুর্থ দিন থেকে যা তার করণীয় তা করতে পারে। আমার মতে চতুর্থ দিনে ঠিক এই সময় এই ঘরে আর একটা বৈঠক বসানো হোক। সেই বৈঠকে আমরা সকলেই থাকব, উপরোক্ত থাকবেন—এঁরা যে লোকগুলির নাম দিয়েছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই। ঐ দিন সন্ধ্যার পর এখানে হাজির হবার জন্যে তাঁদের ডাকা হোক। তাঁরা যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করেন যে, এই সাতজন ব্যবসায়ীর অভিযোগেই তাঁদের তলব করা হয়েছে; তাঁরা শুধু জানবেন যে, তাঁদের মত এঁরাও আহূত হয়েছেন। সেই বৈঠকে এই চিঠির প্রসঙ্গ না তুলে শুধু সব্যসাচী ডাকাতের কথাই উঠবে এবং এই ডাকাত সম্বন্ধে তাঁদের কি মনোভাব সেটা আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে হবে। তারপর সেই বুঝে অন্য ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করাই শোভন হবে।

আলিজানের এই প্রস্তাব জাহ্নবী ও তাঁর সহকর্মীরা সানন্দে গ্রহণ করলেন। অবশ্য, ব্যবসায়ীদের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হলো না, যেহেতু প্রতিযোগী সম-ব্যবসায়ীদের সংগে থানায় হাজির হওয়া তাঁদের পক্ষে গৌরবের কথা নয়, কিন্তু আপত্তি করবার শক্তিও তাঁদের ছিল না, কাজেই মত দিতে হলো। স্থির হলো, চতুর্থ দিন সন্ধ্যার পর এই কক্ষে সেই জরুরী বৈঠকের অধিবেশন হবে।

দুর্গার সম্পর্কে সুদর্শনের সংকোচ ত কেটে গেছেই, বরঞ্চ সাহসটাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন দুর্গার সঙ্গে বাড়ীর কক্ষে বা বাগানে আলাপ করে সে তৃপ্তি পায় না—বাংলোর এলাকা ছাড়িয়ে দুর্গাকে নিয়ে প্রত্যহ অপরাহ্ণেই অনেকখানি পথ পদব্রজেই ঘুরে আসে। জাহ্নবী কোনদিনই দুর্গাকে বাংলোর বাইরে বেরুতে দেন নি—বাংলোর মধ্যেই তাকে আটক থাকতে হোত। সুদর্শনের সৌজন্যে এই স্বাধীনতাটুকু পেয়ে দুর্গা যেন নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। জাহ্নবীও সুদর্শনকে জানিয়ে দিয়েছে, বাইরে বেড়াও তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দুর্গাকে যেন একলা কোথাও ছেড়ে দিও না; আর পকেটে রিভলভারটা সর্বক্ষণ রাখবে। আরো বলেছেন, কথার পীঠে কথা তুলে দুর্গার মনোভাবটা জানবে—এই সব্যসাচী ডাকাতটার সম্বন্ধে তার কি ধারণা, সেই বওয়াটে প্রতাপ ছোঁড়াটা যে দলে ছিল, সেই দলের অস্তিত্ব আজও আছে কিনা, প্রতাপের অপমৃত্যু সম্বন্ধে সে কি বলতে চায়—এ সব কথাগুলোও কথায় কথায় তুলে কোন সূত্র খুঁজে পাও কিনা দেখবে। জাহ্নবীর মনে এমন সন্দেহও এখন মাঝে মাঝে খোঁচা দেয় যে, ত্রিকূট পাহাড়ের বুকে যে দল আড্ডা নিয়েছিল, তাদের সবাই ধ্বস চাপা পড়ে না মরতেও ত পারে, এই সব্যসাচী তাদেরই সৃষ্টি নয় ত? তাঁর ধারণা, তা যদি হয়—তা হলে দুর্গা যে এ ব্যাপারে একেবারে অন্ধকারে আছে—তা বলা যায় না। তা ছাড়া, প্রতাপের মৃত্যু সংবাদে যে মেয়ে প্রথমে পাথরের মত অসাড় হোয়ে গিয়েছিল, অল্প কিছুদিন পরেই সে-ভাব সে কাটালে কি করে? তার পরে, সুদর্শনের সঙ্গে প্রথমে ত সে মিশতেই চায় নি, কিন্তু তাঁর শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই

এমন ভাবে মিশতে আরম্ভ করেছে—কে বলবে যে, এর আগে প্রতাপের সঙ্গে তার কোন রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না! প্রিয়জনের শোক এত শীঘ্র ভুলে গিয়ে একান্ত অপরিচিত, আর একজনের-সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা রীতিমত বিসদৃশ বোধ হয় বৈকি! এইভাবে সুদর্শনের সঙ্গে দুর্গার সম্প্রীতির পর থেকে, বিশেষত—সম্প্রতি সব্যসাচীকে পত্রযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করতে দেখে, জাহ্নবীর মনে এই ধরণের সন্দেহ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। সেই জন্যেই পাকে-প্রকারে ও পুলিশি সংকেতে যতটা সম্ভব সুদর্শনকে এইভাবে একটু আভাসও দিয়েছেন যে, যাতে সে সুকৌশলে ফন্দি করে কথায় কথায় এই মেয়েটার কাছ থেকে কথা-সূত্রে নতুন কিছু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এর জন্যে পাটনার ঘটনা ও সেই সূত্রে প্রতাপ নামে দস্যু প্রকৃতির ছেলেটার দুঃসাহসের কথাও সুদর্শনকে শোনাতে বাধ্য হয়েছেন জাহ্নবী। অবিশ্যি, এর আগেই ত্রিকূট পাহাড়ের দুর্ঘটনার কথা সুদর্শন তার বাবার কাছেই কলকাতায় যেভাবে শুনেছিল, তাতে সুদর্শনের মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবার কথা নয়। কিন্তু জাহ্নবীর সাম্প্রতিক ইঙ্গিত সুদর্শনের মনের মধ্যে অনুমানের পরিপ্রেক্ষিতে যে রূপরেখা অংকিত করেছে, তার পক্ষে সেটা যেন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এখন সুদর্শন ভাবতে থাকে, প্রতাপ সম্পর্কে সংশয় ত নিরর্থক না হতেও পারে? ত্রিকূট পাহাড়ের দুর্ঘটনাকে সুযোগ স্বরূপ গ্রহণ করে তার আড়ালে থেকে সেই লোকটাই এই সব্যসাচীর অভিনয় করছে না ত? এ সম্পর্কে জাহ্নবীর নির্দেশও অপরিহার্য। দুর্গার মুখ থেকেই কৌশলে কথা-প্রসংগে এই গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভবপর, সেই চেষ্টাই তাকে করতে হবে। পরক্ষণে সুদর্শনের মনে প্রশ্ন জাগে, দুর্গার এই অকুণ্ঠ অন্তরঙ্গতার পিছনেও কোন উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন নেই ত? সব্য-সাচীকে লক্ষ্য করে দুর্গার রূঢ় কথাগুলি সুদর্শনের মনে পড়ে, অমনি সর্বাঙ্গ

তার জ্বলে ওঠে ঈর্ষায়; সে স্থির করতে পারে না—কেন এই ঈর্ষা? দুর্গা তার কে? কিন্তু পরক্ষণেই সুদর্শনের পৌরুষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তার সভ্য ভব্য শিক্ষিত মন পৌরুষের দাপটে অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় তলিয়ে যায়, আর ভেসে ওঠে আদিম যুগের মানুষের উদ্দাম দুর্বার বর্বর প্রকৃতির এক বীভৎস কদর্য রূপ-ছায়া!

সেদিন বৈকালী প্রসাধনের পর দুর্গা ড্রয়িং রুমে বসে একখানা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাচ্ছে, এমন সময় সুদর্শনও সাহেবী ফ্যাসানে সেজে ফিটফাট হয়ে সেখানে এলো; পাঠরতা দুর্গার দিকে চটুল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর করে সে বলল: বেড়াতে যাবেন?

হাতের পত্রিকাখানায় ছাপা একটা ছবির দিকে চোখ রেখেই দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: কোথায়?

সুদর্শন বলল: তা বলে বাংলোর বাগানে নয়—তার এলাকার বাইরে।

পত্রিকা থেকে চোখ তুলে সুদর্শনের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: কাকার কাছ থেকে পাসপোর্ট পেয়েছেন নাকি?

তেমনি গম্ভীর মুখেই সুদর্শন উত্তর করল: আপনার সম্বন্ধে 'য়্যাবসলিউট অথরিটি' (সম্পূর্ণ অধিকার) তিনি আমাকে দিয়েছেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে দুর্গা বলল: তাই নাকি! কিন্তু আপনার আজ 'লাষ্ট ডে' ('শেষ দিন)—সেটা মনে আছে?

মুখখানা বিকৃত করে সুদর্শন প্রশ্ন করল: তার মানে?

সহজ কণ্ঠে দুর্গা বলল: সব্যসাচী আপনাকে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনার জন্যে আপনাকে যে তিন দিন সময় দিয়েছিলেন, আজই তার শেষ দিন—না?

এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনের মুখের ভংগি ও চোখের দৃষ্টি বদলে গেল, বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে সব্যসাচীর কাছ থেকে আপনি, কি কোনো পরোয়ানা পেয়েছেন ?

মুখ টিপে হেসে দুর্গা সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল : আপনার পরিণাম ভেবে কথাটা নিজের মন থেকেই বলা হয়েছে ; পাসপোর্ট সংগ্রহ করে আমাকে নিয়ে বাইরে বেরুচ্ছেন—পথে পাছে ফঁ্যাসাদে পড়েন—তাই !

অর্থাৎ—সব্যসাচী পথে পেয়েই তার চিঠির জবাব চেয়ে বসে—এইত ?

না—সব্যসাচী ত স্পষ্ট করেই বলেছেন, চতুর্থ দিন থেকেই তিনি সক্রিয় হবেন, জবাবও তিনি মুখে মুখে বা পত্রে চান নি—আপনার কাজেই জবাব মিলবে। আমার আশংকা ওজন্যে নয়।

আশংকাটা তবে কি জন্যে ?

আপনার ভিতরের মানুষটার জন্যে—তার আদিম কালের রূপ মাঝে মাঝে আপনার চোখের মধ্যে ফুটে ওঠে।

চোখ দেখে আপনি মানুষ চিনতে পারেন নাকি ?

মানুষ চেনবার এমন কষ্টিপাথর আর আছে নাকি !—তবে ব্যবহার জানা চাই।

সুদর্শনের এখন মনে হলো যে, কৌতুকছলে কথা প্রসংগে এমন জায়গায় তারা এসে পড়েছে, সব্যসাচী সম্পর্কে দুর্গার মনটাকে নাড়া দেবার হাতলটি একবারে হাতের কাছেই এসে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল : ঐ কষ্টিপাথরে সব্যসাচীকে কষে দেখবার সুযোগও পেয়েছিলেন নাকি ?

স্থির অচপল দৃষ্টি সুদর্শনের মুখে নিবদ্ধ করে দুর্গা উত্তর দিল : আপনি

জানতে চাইছেন ত—ঐ অদ্ভুত লোকটিকে চোখে দেখিছি কিনা? কিন্তু চোখে না দেখেও কি মানুষ চেনা যায় না? মানুষের মূর্তি না দেখলেও তার আদর্শ থেকে তাকে বোঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা দেখিনি, কিন্তু তাঁকে চেনবার জন্যে কষ্টিপাথরের দরকার হয় কি?

বিদ্রূপের ভংগিতে সুদর্শন বলল: সব্যসাচী লোকটিকেও আপনি স্বামীজীর কোঠায় তুলতে চান নাকি?

স্নিগ্ধ স্বরে দুর্গা বলল: স্বামীজীর আদর্শের সংগে এঁরও আদর্শের মিল দেখেই ও কথা বলিছি। যাদের কল্পনা-শক্তি প্রখর, তারা কোন মানুষের কাহিনী শুনলেই চোখের সামনে তার একটা মূর্তি খাড় করে ফেলে। সে মূর্তির মুখ থাকে, চোখ থাকে, তার কথা শোনা যায়, চোখের দৃষ্টি দেখা যায়।

সুদর্শনের দুই চক্ষু অসাধারণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে সে দুর্গার আরও সান্নিধ্যে এসে তার বিহসি মুখের উপর নিজের জ্বালাময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল: তাহলে দয়া করে বলবেন আমাকে—প্রতাপ-বাবুর মূর্তির সঙ্গে এঁর মূর্তির কতটুকু মিল আছে?

প্রশ্নটা করেই সুদর্শন ভেবেছিল কথাটা তীরের মত দুর্গার বুকখানা বিদ্ধ করবে, সেই সংগে একটা চাঞ্চল্য তাহার দেহটাকে নিয়ে রীতিমত মোচড় দেবে। কিন্তু আশ্চর্য, দুর্গা স্থির হয়ে যেমন এই নিষ্ঠুর প্রশ্নটি শুনল, তেমনি স্থিরভাবেই সহজকণ্ঠে উত্তর করল: এইমাত্র আপনাকে স্বামীজীর আদর্শের কথা বললাম না! আপনার এই প্রশ্নে সেই কথাই এসে পড়ে—আদর্শের দিক দিয়ে আশ্চর্য মিল আছে বলেই আমি এত শীগগীর এই আশ্চর্য মানুষটিকে চিনতে পেরেছি। দুজনেই এঁরা এক জাতের মানুষ।

কথাগুলো বলেই দুর্গা খিল খিল করে হেসে উঠল।

৩২

বিচ্চুর আসার পর জাহ্নবী সেই যে দুমকার হ্রদে মানুষ অদ্বৈত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেওঘরে আসবার জন্যে একখেতা চিঠি লিখে-ছিলেন, তারপর কিন্তু সেই হিতকারী মানুষটির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সেই ভুলটা তাঁর মনের মধ্যে একটা খোঁচা দিল। তাইত, এই সব্যসাচী লোকটাকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছি, অথচ এ সব ব্যাপারে কিনারা করতে যার জুড়ি নেই—আমার সেই সুদিনের বন্ধু চৌধুরী মশাইকে মনেই পড়েনি! তাঁকে লিখলে এতদিনে এর একটা হেস্তনেস্ত নিশ্চয়ই হোয়ে যেত! ছি, ছি, এমন ভুলও হয়?

সেইদিনই দুমকায় চিঠি পাঠালেন—ভণিতা করে আগাগোড়া সব ব্যাপার জানিয়ে। পাটনার ঘটনাগুলোও বাদ দিলেন না। অনেক কথাই লিখলেন; যথা—একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যক্তি, অসময়ে কত সাহায্যই করেছেন, যে যশ পাবার ন্যায্য অধিকারী তিনি, অম্লান বদনে সেদিনের সেই দুর্লভ যশোমাল্য নিজের গলায় না পরে আমার গলাতেই দুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে এত বড় জটিল ব্যাপারটা চেপে রাখাই মস্ত ভুল হোয়েছে!—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একদিন পরেই চিঠির উত্তর এলো দুমকা থেকে। কম্পিত হস্তে খামখানা খুলে সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন জাহ্নবী। কিন্তু খুসি ত হোলেনই না, বরং মুখখানা ভার হোয়ে উঠল। শুধু তাই নয়—অত বড় হিতৈষী বন্ধুর উপরে যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তাঁর, যেন পলকের মধ্যে ফিকে হয়ে গেল। চিঠিখানা উপেক্ষার সঙ্গে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ক্ষুব্ধস্বরে আপন মনে বলে ফেললেন: ননসেন্স!

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, বাইরের লোকের কাছ থেকে মুক্ত হস্তে নিতেই তাঁরা অভ্যস্ত, আর সেইটিই ভালোবাসে। স্তব, স্তুতি, প্রীতি, অযাচিত সাহায্য—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এলেই তাঁদের আনন্দ। যাঁরা দিতে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রতি মুখ ও মন সদা প্রসন্ন থাকে। কিন্তু কোন গতিকে যদি কোথাও এর ব্যতিক্রম হয়, অপর পক্ষ হাত গুটায় বা স্নেহের দাবী কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তাহলে আর নিস্তার নেই, তখনই মুখ তাঁদের অন্ধকার হয়—অতীতের সব কথাই চাপা পড়ে বর্তমানের ব্যাপারটাই বড় হোয়ে ওঠে। এই প্রকৃতির মানুষ হোচ্ছেন পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্র।

অদ্বৈত চৌধুরী তাঁর পত্রে জাহ্নবীর প্রার্থনা সম্পর্কে সংক্ষেপে জানান যে—সব্যসাচী নামে একটা রসস্যময় অজ্ঞাত লোকের উপদ্রবে জাহ্নবী বিব্রত শুনে তিনি ব্যথাই পেলেন, কিন্তু এখন এ সম্পর্কে মাথা দেবার কোন উপায়ই তাঁর নেই। এর আগেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়তে হোয়েছে। অবস্থার ফেরে তাঁর এই অক্ষমতার জন্যে তিনি দুঃখ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছেন না।

চৌধুরীর এই অক্ষমতার জন্য জাহ্নবী তাঁর অতীতের দুর্লভ সাহায্য-গুলির কথা ভুলে গেলেন, মুখখানা বিকৃত করে অস্ফুট স্বরে বললেন: অপরের কাজটাই এখন তাঁর বড় হলো, সরকারী জরুরী ব্যাপারটা কিছু নয় তাঁর কাছে—ইডিয়ট আর কাকে বলে!

সুদর্শন এই সময় সামনে এসে দাঁড়ালো—সাহেবের অর্ধস্ফুট কথাগুলি অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল সে; সহানুভূতির ভঙ্গি মুখে এনে জিজ্ঞাসা করল: কার কথা বলছিলেন?

চিঠিখানা তর্জনী সংকেতে দেখিয়ে দিয়ে সাহেব বললেন : দেখ না প'ড়ে।

টেবিলের উপরেই উপেক্ষাভরে নিক্ষিপ্ত চিঠিখানা পড়েছিল ; সুদর্শন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলল, তারপর সেও মুখখানা বিকৃত ক'রে তিক্ত স্বরে মন্তব্য করল : এই সব হামবাগ বে-সরকারী লোকদের কাছে হেল্প চাওয়াটাই মস্ত ভুল ; এতে ওরা মাথায় চেপে বসে—সরকারের প্রেষ্টিজও এতে নষ্ট হয় স্যার !

ইদানীং সুদর্শন মুরুব্বীর মতন পুলিস-সুপার জাহ্নবীকে পরামর্শ দেয়, তাঁর ভুল ত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করে। জাহ্নবীও এমনি বিহ্বল হোয়ে পড়েছেন যে, সুদর্শনের অনধিকার চর্চায় অপমান বোধ করেন না, বরং অধিকাংশ সময়ই তার কথা মেনে নেন। কাজেই সুদর্শনের স্পর্দ্ধাও বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ।

এখানে সুদর্শনের মন্তব্য শুনে জাহ্নবী একটু গম্ভীর হোয়ে বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কি জানো, সময় সময় বে-সরকারী লোকের কাছ থেকেও ভালো কাজ পাওয়া যায়, আর তারাও আমাদের কাজে লেগে গিয়ে বর্তে যাবার মতই হোয়ে থাকে। এই লোকটার ডুমকায় প্রতিপত্তি বড় কম নয় ; আমি যখন ডুমকায় ছিলাম, যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এখন এভাবে সরে দাঁড়াল কেন কে জানে !—তাছাড়া উনি আবার কি এমন গুরুতর ব্যাপারে মাথা দিয়েছেন তাও বুঝছি না! যাকৃগে—লোকটাকে চেনা গেল। তুমি বোধ হয় জানো না, ঐ যে বিচ্চু বলে বোবা চাকরটা, তাকে উনিই এখানে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর কথাতেই ছোঁড়াটাকে রেখেছি। দেব এর পর দূর করে তাড়িয়ে।

বিচ্চুর নাম শুনেই সুদর্শনের রক্ত গরম হোয়ে উঠল—এই মিশমিশে কালোবরণ এবং মিটমিটে স্বভাবের ছোঁড়াটাকে সুদর্শন মোটেই পছন্দ

করে না। এর চাহনি দেখলেই সে জলে যায়। যখনই সে ভাবের ঘরে চুরি করবার জন্তে চুপিসাড়ে এগিয়ে যায়, অর্থাৎ নিজের জাগ্রত মনকেও দাবিয়ে রেখে অবচেতন মনের চালনায় মরিয়া হোয়ে ওঠে—বাগানে, পড়ার ঘরে, স্নানের জায়গায় দুর্গা গেলেই—সেও উন্মুখ হোয়ে সেই দিকে সন্তর্পণে পাড়ি দেবার চেষ্টা যেই করে, অমনি এই কালো সয়তান যেন মাটী ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, ইশারা করে জানায়—দিদিমণি ওখানে গা ধুচ্ছেন, কাপড় ছাড়ছেন কিম্বা শুয়ে আছেন—তার সেই ইঙ্গিত এমনি সুস্পষ্ট ও নিষেধাত্মক যে, সুদর্শনের জাগ্রত মনও তখন শিউরে ওঠে, সেও লজ্জায় ফিরে আসবার পথ পায় না। পরে কিন্তু রাগে ক্ষিপ্ত হোয়ে ওঠে সেই বেয়াড়া ছেলেটির উপরে। এখন জাহ্নবীর মুখে তার প্রসঙ্গ উঠতেই সেও বিদ্বিষ্ট মন্তব্য করল: দেখুন, বাইরের লোকের সাহায্য নেওয়া আমি যেমন পছন্দ করি না, তেমনি তাদের সাপ্লাই করা লোক-জনকেও কাজে বাহাল করা ভালো বুঝি না। আপনার এই বিচ্চুটি যেন মিটমিটে ডান—সর্বক্ষণই ত দেখি আপনার ভাইঝির পিছনে ঘুরছে!

শেষের মন্তব্যটি শুনেই জাহ্নবীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল; সেই মুখেই সুদর্শনের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন: ও! তুমি দেখছি সব দিকেই নজর রেখে চলেছ। কিন্তু সেটা ঠিক ওর দোষ নয়, আমিই ওকে দুর্গার হালচালের ওপর নজর রাখতে বলেছি, তাই ও অতটা সতর্ক। তোমাকে ত আগেই বলেছি, দুর্গাকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না—সন্দেহের আভাসও জানিয়েছি; তুমি কথা কিছু বার করতে পেরেছ ওর কাছ থেকে?

সুদর্শন কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিল; কি সর্বনাশ! কর্তা নিজেই তাহলে বিচ্চুকে গোয়েন্দা করে দুর্গার পিছনে লাগিয়েছেন! সেইজন্যই

চুপিসাড়ে যখনি নজর দিতে গিয়েছি, অমনি বিচ্চুর নজরে ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হোতে হয়েছে! বিচ্চু সে খবর কর্তাকে ইশারায় জানায় নি ত?

সাবধানে আত্মসম্বরণ করে সুদর্শন বলল: খুব চেষ্টা করছি; কিন্তু এমনি কায়দা করে উনি কথা বলেন, যেন হেঁয়ালীর মত, তা থেকে আসল কথা বার করাই মুস্কিল হোয়ে ওঠে।

জাহ্নবী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: প্রতাপের সম্বন্ধে ওর মনোভাবটা কি রকম বুঝলে?

সুদর্শন একটু থেমে, মনে মনে একটু ভেবে উত্তর করল: এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে চেষ্টা করছি বোঝবার। কিন্তু যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয়, ভিতরে রহস্য কিছু আছেই। ও লোকটার কথা তুললেই এতো তাকে বাড়াবেন যে—তা সহ্য করা কঠিন হোয়ে ওঠে।

মুখের এক বিকৃত ভঙ্গি করে জাহ্নবী বললেন: বটে! কি বলে ও?

সুদর্শন উত্তর করল: খুব বড় বড় কথা—ওঁর মতে প্রতাপবাবু হোচ্ছেন—স্বামী বিবেকানন্দের স্তরের লোক। তাঁদের মৃত্যু নেই—এমনি সব কথা। মৃতের সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে ত কখনো কাউকে দেখিনি। তাতেই সন্দেহ হয়, ত্রিকূট পাহাড়ের ব্যাপারটার মধ্যে হয়ত কোন রহস্য আছে, প্রতাপবাবুর দলটাই আমাদের ভুলিয়ে সব্যসাচীর অভিনয় করছে—এ সন্দেহকে একবারে বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি খুব কৌশল করেই ওঁর সঙ্গে কথা বলি—কোনরকমে কোন অসতর্ক ফাঁকে ওঁর মুখ দিয়ে যদি কথাটা বেরিয়ে আসে।

সুদর্শনের কথা শুনতে শুনতে জাহ্নবীর মুখখানা বিদ্বেষে যেন কালো হোয়ে উঠল। দুই চোখ পাকিয়ে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: এ সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে দুর্গাকে আর কিছুতেই

বিশ্বাস করা চলে না; নিশ্চয়ই ও সব জানে, আর—ওর সঙ্গে যোগাযোগ ঐ দলের আছে। এখন একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে।

কথাটা বলেই জাহ্নবী চুপ করলেন, কিন্তু তাঁর মাথার আইডিয়াটা জানবার জন্য সুদর্শনের আগ্রহও কম নয়; কাজেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জাহ্নবীর দিকে তাকাল। জাহ্নবী কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মৃদু করে বললেন: কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি দুর্গাকে নিয়ে কোনো একটা ঝামেলা বাধাতে পারলে, ঐ দল যদি সত্যিই থাকে, ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: কি ঝামেলা বাধাতে চান?

জাহ্নবী বললেন: দুর্গার বিয়ে দিতে চাই। যে কোন একটা পাত্র ঠিক করে—ধরে বেঁধে জোর করেই এ বিয়ে দেব। বিয়ে যদি নির্বিঘ্নে হোয়ে যায়, তাহলে বুঝবো—ও দল সম্বন্ধে যে সন্দেহ করছি, তা ভুল। কিন্তু ঐ দলই যদি সব্যসাচীর হয়, দুর্গাকে উদ্ধার করতে আসবেই। আমরা সমস্ত পুলিস ফোর্স আড়ালে রেখে ওদের প্রতীক্ষা করব, তারপর হঠাৎ বেড়াজালে ঘিরে ফেলব।

সুদর্শন একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলল: কিন্তু যেমন তেমন কোন পাত্রের সঙ্গে দুর্গার মত মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? দুর্গার পিতা কি পরে সেটা সহ্য করবেন?

সদম্ভে জাহ্নবী বললেন: তার জন্যে কিছু আসে যাবে না—নটোরিয়াস্ বিপ্লবীদলের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে কোন শান্ত শিষ্ট ভদ্র সন্তানের হাতে তাকে তুলে দেবার অধিকার অবশ্যই আমার আছে—আমিই যেখানে তার অভিভাবক। আমি ত জানি দুর্গাকে পুত্রবধূ করবার জন্য তোমার বাবার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু তার সম্বন্ধে এসব নালিশ ওঠার পর বলবার সে মুখ আমাদের এখন নেই।

সুদর্শন বুঝি শেষের কথায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে আলোর

একটু রশ্মিরেখা দেখতে পেল। মনের সমস্ত সংকোচ ঠেলে ফেলে সে এখন স্নিগ্ধ স্বরে বলল: যে নালিশ ওঁর সম্বন্ধে উঠেছে, সে এমন কিছু মারাত্মক নয়—ওর জন্যে আমাদের পক্ষ থেকেও কোন নালিশ নেই। আমার বাবা মাও জানেন, বিবাহ করব না বলেই একটা মত বরাবর পোষণ করে এসেছি। তবে দুর্গার মত বেপরোয়া মেয়েই আমার সেই দৃঢ়মত ভাঙতে পারে। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, আমিই এ বিবাহে পাত্র হোতে রাজি আছি। আর—আসলে এ ত পলিটিক্যাল ম্যারেজ হোয়েই দাঁড়াচ্ছে।

আড় চোখে সুদর্শনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জাহ্নবী তার কথা-গুলি শুনছিলেন। কথা শেষ হোতে সহাস্যে বললেন: আমার মনের কথাই তুমি টেনে বললে হে! আমি চাই না আমাদের বংশের মেয়ে বিগড়ে গিয়ে—বওয়াটে ডানপিটে কোন বিপ্লবী ছোঁড়ার হাতে পড়ে। যতই প্রগতিবাদিনী মেয়ে হোক, ধরে বেঁধে একবার তাকে ছাঁদনাতলায় এনে বিয়ের মন্ত্রটা পড়ে দিলেই হলো, তারপর বিয়ের জল পড়লেই সব ঝাঁঝ তার নিবে যাবে। তোমার বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবার যখন আপত্তি নেই, তখন আর কথা কি! বেশ, তুমি প্রস্তুত থাকো, আমি চুপি চুপি সব ঠিক করে ফেলছি। তবে, আগে থেকে কিছুই প্রকাশ ক'র না—বিয়ের দিনই এখানে সবাই জানবে যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে তোমার বিয়ে হোচ্ছে। দুর্গার কাছেও কথাটা চেপে রাখবে, তবে সে যাতে খুসি থাকে—তোমাদের মেলামেশায় বাধা না পড়ে, সেদিকে ভালোরকম লক্ষ্য রাখবে। দুর্গাকে যখন গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নেই, তখন দুর্গা এখন থেকে তোমার, এই ভেবেই তুমি তার সঙ্গে ব্যবহার করবে।

জাহ্নবীর মুখে শেষের কথাটা শুনেই সুদর্শনের সমস্ত অন্তরটা নেচে উঠল আনন্দের প্রাচুর্যে—তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

এর পর নীরব ভঙ্গিতেই সুদর্শন সম্মতি জানিয়ে জাহ্নবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়েই বুঝল, তাদের বৈকালী ভ্রমণের সময় হোয়েছে—এখনি তাকে বেরুতে হবে দুর্গাকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি সে অফিস থেকে বাংলোর দিকে চলল।

জাহ্নবীও যেন এই প্রসংগে বেশ একটু উৎসাহিত হোয়ে উঠলেন। সব্যসাচীর ব্যাপারে দুর্গার সম্বন্ধে সন্দীহান হোয়ে অবধি তিনি মনে মনে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সন্দেহ নিরসনের পক্ষে তাঁর এই ফন্দিটি যে বিশেষ উপযোগী হবে, নিজের মনেই তা উপলব্ধি করে সেটি প্রয়োগের জন্যে যখন উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সে সময় সুদর্শন এসে পড়ায় সহজভাবেই তার সমাধান হোয়ে গেল। কল্পিত দৃষ্টিতে জাহ্নবী যেন দেখতে পেলেন—তাঁর বাংলোর ড্রয়িং রুমে দুর্গার পরিণয়োৎসব চলেছে—বরসজ্জায় সজ্জিত সুদর্শন করছে তার পাণিগ্রহণ; বাইরের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তভাবে পুলিসরক্ষীরা রাইফেল হাতে করে প্রতীক্ষায় রত; নিরুপায় অসহায় মেয়েটা এতটা ভাবতে পারে নি, সে যেন বিমূঢ় হোয়ে পড়েছে, কিম্বা প্রতীক্ষা করছে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির; এমনি সময় সেই দুঃসাহসী দস্যুদের সাধারণভাবেই আগমন—যেন তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত; কিন্তু তাঁর সতর্ক সহকর্মীরা তখনি অতর্কিতভাবে তাদের ঘিরে ফেলে ইশারা করতেই গুপ্তস্থান থেকে পুলিস বাহিনী বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে এসে চাঞ্চল্যকর এক নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করল! তারপর—

জাহ্নবীর কল্পনার সূত্র সহসা ছিঁড়ে গেল টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ তরঙ্গের আঘাতে। রিসিভার তুলে কানে দিতেই আহ্বানকারীর নামটি শুনে চমকে উঠতে হলো তাঁকে। স্যার শংকরলাল ফোন করছেন পাটনা থেকে। শুষ্ক স্বরে জাহ্নবী জানালেন: গুড ইভনিং স্যার!

স্যার শংকর জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সব্যসাচীর খবর কি?

একটু থেমে ও একটা ঢোঁক গিলে জাহ্নবী বললেন : তারপর আর কোন উপদ্রব করতে পারেনি স্যার !

সব্যসাচীর পঞ্চম উপদ্রবের পর স্যার শংকর নিজেই ঠিক এইভাবে জাহ্নবীকে ফোনে জিজ্ঞাসা করে চমকে দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরই মুখে তিনি জানতে পারেন যে, সব্যসাচী নিজেই চিঠি লিখে তার উপর্যুপরি পাঁচটি লুণ্ঠন সম্পর্কে কৃতিত্বের কথা তাঁকে জানিয়েছে। তারপর আজ পুনরায় সব্যসাচীর নূতন কোন উপদ্রব সম্বন্ধে তাঁর এই প্রশ্ন।

জাহ্নবীর উত্তরে আর কোন উপদ্রব সে করতে পারেনি শুনে স্যার শংকর বললেন : উপদ্রব করতে পারেনি, না, ইচ্ছা করেই করেনি—আপনার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট মিষ্টার বোসকে 'আলটিমেটাম' দিয়েছে বলেই ?

প্রশ্ন শুনে জাহ্নবী আবার চমকে উঠলেন। দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি করে সে চিঠির কথা জানলেন, স্যার ?

ভারী গলায় স্যার শংকর জানালেন : যেমন করে পর পর তার পাচটা উপদ্রবের কথা জানতে পারি। মিষ্টার সব্যসাচী আমার কাছেও ঐ চিঠির একটা নকল পাঠিয়েছেন কিনা ! তা আপনার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কি সাব্যস্ত করেছেন ?

মনে মনে সব্যসাচীর মুণ্ডপাত ও স্যার শংকরের নিপাত কামনা করে জাহ্নবী বললেন : দলশুদ্ধ ঐ ইতরটাকে ধরবার চেষ্টা চলেছে।

পুনরায় প্রশ্ন হলো : সন্ধান কিছু পেয়েছেন নাকি ?

জাহ্নবী একটু ভেবে উত্তর দিলেন : যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন—তবে আশা আছে স্যার, আগের প্রেষ্টিজ নষ্ট হবে না।

স্যার শংকর বললেন : ও ! ডুমকার কথা বলছেন, বুঝি ? কিন্তু এখানেও তেমনি কোন মুরুব্বী পেয়েছেন নাকি ?

মুখখানা বিকৃত করে জাহ্নবী জানতে চাইলেন : মুরুব্বী মানে ?

ফোনে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল ; তারপর শ্লেষের সুরে স্যার শংকর যে কথাগুলি বললেন, শুনতে শুনতেই জাহ্নবীর চিত্ত রাগে জ্বলে উঠল : মুরুব্বী বুঝলেন না ? দুমকার অদ্বৈত চৌধুরীকে ভুলে গেলেন ? কিন্তু এত শীগ্‌গীর ত তাঁকে আপনার ভোলা উচিত নয়, মিষ্টার মিত্র !

জাহ্নবীর মুখ দিয়ে এর পর আর কথা নির্গত হলো না—স্তব্ধ হোয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, তবে কি দুমকার সেই ইতরটা সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে নিজের বাহাদুরী জানাবার জন্যে !

জাহ্নবীর পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে স্যার শংকর বললেন : হ্যাল্‌লো !······হ্যাঁ, দেখুন—আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আপানার ঐ মুরুব্বীর সঙ্গে আমার আলাপই এখনো হয়নি। তবে কি জানেন, সারা প্রভিন্সের সব খবরই আমার কাছে আসে—বাতাস আমাকে কানে কানে বলে যায়।

গলায় জোর দিয়ে জাহ্নবী বললেন : কিন্তু মুরুব্বীর কথা আপনি যা বললেন স্যার, তা ঠিক নয়। দুমকায় ঐ লোকের সঙ্গে আমার কিছুটা আলাপ হোলেও আমি কোনদিনই ওঁকে মুরুব্বী ভাবিনি—নিজের শক্তির ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, স্যার ! আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

স্যার শংকর জানালেন : ও ! তাহলে আমারই হয়ত শুনতে ভুল হোয়েছিল ! আচ্ছা, আপনার সব্যসাচী যে ক'জন মার্চেণ্টের নাম দিয়ে তাদের বিজনেস সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হোতে লিখেছিল তার পত্রে, কোন খোঁজখবর বা তদারক করেছিলেন তাদের সম্বন্ধে ?

জাহ্নবী বললেন : একবারে বাজে কথা, স্যার ! ওরা এ সহরের রইস লোক, নামী, মানী আর বনেদী কারবারী।

স্যার শংকর বললেন: তাই নাকি! কিন্তু আমার ধারণা কি জানেন, এই সব বেড়ালই বনে গিয়ে রক্তের স্বাদ পেলে নেকড়ের মত হিংস্র হয়ে ওঠে! ভালো কথা, আপনার ভাইঝির কি খবর? আছে কেমন?

জাহ্নবী নীরস কণ্ঠে উত্তর করলেন: ভলোই। তবে এখানে ত সমিতি নেই, টারগেট শেখবার প্রেস নেই, হৈ-হুল্লোড় করবার সঙ্গী পায় না; কাজেই, ভদ্র বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা সাধারণতঃ যেভাবে থাকে, সেইভাবেই আছে।

স্যার শংকর পুনরায় প্রশ্ন করেন: বাবার কথা কিছু বলে?

জাহ্নবী জানান: না, কোন কথাই বলে না। আশ্চর্য!

স্যার শংকরের কণ্ঠ থেকে একটা চাপা শব্দ শোনা গেল: বটে!

তারপর একটু নীরব থেকে পুনরায় বলে উঠলেন: এটা খুবই আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার এত কথা হলো, আপনি ত একটিবার আপনার দাদার কথা জিজ্ঞাসা করলেন না মিষ্টার মিত্র?

জাহ্নবীর মুখ পুনরায় বিকৃত হোয়ে উঠল এবং সেই মুখ দিয়ে তিক্ত স্বর নির্গত হলো: না, আমার কথা আলাদা। নিজের দোষে দাদা যখন আটক হোয়েছেন, সরকারের কাছে অপরাধী, দাদা হোলেও কোন সম্বন্ধই এখন তাঁর সঙ্গে আমার নেই, আর রাখা উচিতও নয়—আমি যখন সরকারের লোক। কাজেই তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

আবার ক্ষণকাল স্যার শংকর নীরব রইলেন, তারপর দুর্বোধ্য একটা সুরে বললেন: ঠিক কথা, আপনি যে বৃটিশ সরকারের এতবড় কর্তব্যনিষ্ঠ ইমানদার সেবক—সেটা জানতাম না! যাই হোক, একটা কথা বলে রাখি মিষ্টার মিত্র, আপনার ভাইঝি সরকার-বিদ্বেষীর কন্যা হোলেও, সে বেচারীকে যেন শত্রুকন্যা ভেবে জ্বালা যন্ত্রণা দেবেন

না ; আপনার দাদা বিশ্বাস করে আপনাকেই তার অভিভাবক করেছেন, এটা অন্তত: মনে রাখবেন দয়া করে।

কণ্ঠে একটু জোর দিয়ে জাহ্নবী জানালেন : এ অনুরোধ করাই বাহুল্য স্যার, দুর্গা আমাদের বংশের মেয়ে, তার সম্বন্ধে আমরা সচেতনই আছি।

স্যার শংকর এর পর ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন, জাহ্নবীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

৩৩

সন্ধ্যার দিকে দেওঘরের প্রান্তভাগে জেসিডির পথে একটা সুবৃহৎ ঘেরা ফুল-বাগিচার মধ্যে দুর্গা ও সুদর্শন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আগেই কথা হয়েছিল, এই বিখ্যাত ফুল বাগানটির সুবিস্তীর্ণ অংশগুলি এদিন তারা ভালো করে দেখবে। কলকাতার কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই বাগানটির মালিক ; চৌরঙ্গীর হগ সাহেবের মার্কেটে তাঁর প্রকাণ্ড ফুলের স্টল, এই বাগানের ফুলই তাঁর মস্ত সম্পদ। এখান থেকে ট্রেনে নিত্য ফুল যায়। অনেকগুলি মালী ও কতিপয় কর্মচারী বাগানের তত্ত্বাবধান করে। বাইরের লোকদের বাগানে প্রবেশাধিকার নেই। তবে পুলিসের লোকের কথা আলাদা। পুলিস-সুপারের ভাইঝিকে নিয়ে ছোট সাহেব বাগান দেখতে চান, এখবর পেয়েই বাগানের অধ্যক্ষ সানন্দে এদের আহ্বান করে। খবরটা আগেই দেওয়া হয়েছিল। বিকেলের দিকে এরা দুজনে আসতেই কর্মচারীরা তাদের অভ্যর্থনা করে বাগানের বিভিন্ন অংশ দেখাতে থাকে। খানিক পরে সুদর্শনই তাদের

বলে—আপনারা কাজ করুন গিয়ে, আমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির দরকার নেই। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থেকে ফুলবাগানের হাওয়া খেতে চাই। কর্মচারীরা তখন বেড়াবার ও বিশ্রাম করবার পথ ও স্থানের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে আফিসে ফিরে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে দুজনে বাগানটির এমন এক অংশে এসে পড়ল, যেখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, সামনেই একটা ঝিল—দুই পাশে ও পিছনে ফুটন্ত অর্দ্ধ ফুটন্ত মুকুলিত অজস্র ফুলের সম্ভার নিয়ে গোলাপের সারিবদ্ধ গাছগুলি যেন ভূতলে নন্দন রচনা করেছে। আশে পাশে ফিরে তাকালে গোলাপগুচ্ছ ভিন্ন কিছুই আর নজরে পড়ে না। শ্রাবণের আর্দ্র বাতাস সুবাস ছড়িয়ে সারা পরিবেশটিকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এরই মদিরাময় আবেশ বুঝি সুদর্শনকে সহসা মাতাল করে দিল। এদিন তার ঘাড়ে আবার ভূত চাপল—হঠাৎ দুহাতে দুর্গার চিবুকটি তুলে ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বলল: এর কাছে হাজার গোলাপ হার মানে!

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাও তার হাতখানা ঝাঁ করে বাড়িয়ে দিল—সুদর্শনের হাতের কনুইটি লক্ষ্য করে। কিন্তু সুদর্শন আজ প্রস্তুত ছিল—অপর হাতে দুর্গার বাড়ানো হাতের মনিবন্ধটি চেপে ধরে মুখখানার এক চটুল ভংগি করে শ্লেষের সুরে বলল: ছেলেবেলার সেই ছড়া মনে আছে ত—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার পাখী তব বধিব পরাণ?

সেদিন জাপানী যুযুৎসুর প্যাঁচটা আচমকা চালিয়ে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন—সেই জন্যে আজ আগে থেকেই তৈরী ছিলাম। ও প্যাঁচ আমারো জানা আছে।

খিল খিল করে হেসে উঠল দুর্গা। হাসির সেই গমকের সংগেই তার দুই চোখ দিয়ে এমন একটা আভা বেরুল, বিদ্যুতের মতই চোখ ঝলসানো ঝলক যার। সুদর্শন এমনি বিহ্বল হোয়ে পড়ল যে, কখন তার হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দুর্গা পাশের একটা গোলাপগুচ্ছের পিছনে অতর্কিতে সরে গেছে, সেটা জানতেই পারল না—চমকে উঠল তার কথা শুনে: এ কিন্তু আপনার মশা মারতে কামান দাগা সুদর্শনবাবু! আর জানেন ত, চেনা পাখীকে ফাঁদে ফেলা যায় না, তবে বধ যদি করতে চান, আপত্তি নেই। তার জন্যে প্যাঁচের কি দরকার, পকেটে ত রিভলবার আছে।

মুখখানা রাঙা করে দুই চোখ পাকিয়ে সুদর্শন বলল: সে ইচ্ছা থাকলে কি আর ফুলের বাগানে নিয়ে আসি! ছড়ায় বধ করবার কথা আছে বলে, উদ্দেশ্যও কি তাই ভাবলে? এখানে বধ মানে বাধ্য। আজ এখানেই একটা বোঝা পড়া করতে চাই তোমার সঙ্গে দুর্গা দেবী! ফুলগাছগুলো সাক্ষী থাকবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে দুর্গা বলল: কথাটার মানে আরো একটু স্পষ্ট করে বলবেন না?

মুখখানা শক্ত করে সুদর্শন বলল: আর ছলনা কেন, মানে কি তুমি বুঝতে পার নি?

দুর্গার নেত্রমণি যেন জ্বলে উঠল কথাটা শুনে, কিন্তু পরক্ষণে সে দৃষ্টি সংযত করে জিজ্ঞাসা করল: আজ আপনার হোয়েছে কি বলুন ত শুনি? সম্বোধনটা উত্তম পুরুষ থেকে নামিয়ে দিলেন, গলার আওয়াজও বদলে ফেললেন! ব্যাপার কি?

এ প্রশ্নের উত্তরের দিক দিয়েও না গিয়ে মুখখানা হঠাৎ রীতিমত গম্ভীর করে দৃঢ় স্বরে সুদর্শন বলল: একটা কথা আছে জান বোধ হয়—

নেই নেই বলতে বলতে সাপের বিষও থাকে না। তুমিও ক্রমাগত ঠাট্টার ছলে যেভাবে আমাদের মহাশত্রু ঐ সব্যসাচী ডাকাতটাকে বাড়িয়ে চলেছ, সেটা আমার বরদাস্ত হোচ্ছে না। অথচ ঐ ঠাট্টা থেকেই এমন দু একটা কথা বেরিয়ে পড়ে, যা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। এখন আসল কথাটা তোমার কাছ থেকেই জানতে চাই—বুঝলে?

আশ্চর্য্য, সুদর্শন রীতিমত গম্ভীর হোয়ে এক নিশ্বাসে এমন গুরুত্ব-পূর্ণ কথাগুলো বললেও, দুর্গার মুখে কিন্তু গাম্ভীর্য্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না—তেমনই চটুলভাবে মুখখানা হাল্কা করে হাসতে হাসতে সে বলে উঠল: এই কথা! কিন্তু এর জন্যে আমাকে এই বাগানের গল্প শুনিয়ে এভাবে এখানে আনবার মানে? বাড়ীতেই ত কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন?

সুদর্শন ভেবেছিল যে, তার মুখের কথা শুনে দুর্গাও রীতিমত শক্ত হোয়ে এমন কিছু উত্তর দেবে, যা থেকে তার আসল উদ্দেশ্য অন্ততঃ কিছুটা সফল হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্গার এই চাপল্য তার মনেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কিছুক্ষণ তার সেই বিহসিত মুখের পানে বদ্ধদৃষ্টিতে থাকার পর তার সেই প্রশ্নের উত্তরটাই সুদর্শনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল: হ্যাঁ, বাড়ীতেও জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই করিনি।

পূর্বের হাসির রেখা মুখে টেনে এনেই দুর্গা পরের কথাটা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতেই বলল: পাছে সেই বোবা ছেলেটা এসে বাধা দেয়—সেই ভয়ে?

কথাটা শুনেই সুদর্শনের সর্বাংগ ক্রোধে কণ্টকিত হোয়ে উঠল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই সে বলল: ভয় মানে? সেই রাস্কেলটা—

তেমনি সহাস্যে দুর্গা বলল : হ্যাঁ, তার ভয়েই আপনি আপনার অনেক নোংরা ইচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য হন। আপনার সে ইচ্ছাটা যেই মনে ওঠে, সেই সময়টিতে ঠিক সেও এসে পড়ে! তখন আপনাকে দেখে আমারি দুঃখ হয়।

জলন্ত দৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চেয়ে সুদর্শন বলল : কি পাগলের মতন বকছ—থামো।

মুখ টিপে মুখের উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে চেপে রেখে দুর্গা বলল : কিন্তু কথাগুলো সত্যি বলেই আপনি চটে উঠছেন। আপনার মনের কথাটা আমি বলছি শুনুন। আমাকে পাবার জন্যে আপনার মনে যে একটা দারুণ লোভ হোয়েছে, তাতে ভুল নেই। অথচ মনে সন্দেহ জেগেছে, সব্যসাচীর সংগে আমার হয়ত মাখামাখি আছে। তাহলে ত সে লোভটা নিরর্থক হয়! তাই আজই এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবেন বলে ঠিক করে ফেলেছেন। যদি বোঝেন যে, সত্যি সত্যিই আমি সব্যসাচীকে জানি, আমি তার প্রণয়িনী—তাহলে সব্যসাচীর ওপরে আপনার যে রাগ সেটা আমার ওপরেই ঝাড়বেন; তার জন্যে কোন কিছু অন্যায় করতে পিছোবেন না। বলুন ত—এই মতলবেই আমাকে এই নির্জন বাগানে এনেছেন কি না?

স্তব্ধ বিস্ময়ে সুদর্শন কিছুক্ষণ নিরুত্তরে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনী অসামান্যা তরুণীটির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—তার অন্তরের এই অভিপ্রায়টি কি করে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এ জানতে পারল, এবং এর পরে তার কর্ত্তব্য কি?

কিন্তু কর্তব্য স্থির করতে সুদর্শনের বিলম্ব হলো না, জাহ্নবীর কথায় ভরসা পেয়ে আজ সে সমস্ত সংকোচ দুহাতে সরিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে; তাই শিক্ষিত বাঙালী যুবার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকেও সবলে দাবিয়ে

রেখে এটা দুর্বার জেদ ও ঈর্ষার তাড়নায় সে আজ এই অসহায় নিরস্ত্র বাক-সম্বল মেয়েটির সঙ্গে চরম বোঝাপড়া করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত নয়! সাধারণত, এরূপ উগ্র পরিস্থিতিতে শান্ত সংযত শিক্ষিত ঘরের মানুষ উগ্র মদিরার আশ্রয় নিয়ে সাময়িক ভাবে দুর্বৃত্ত হয়ে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে থাকে—সুদর্শনেরও সেটা অবিদিত নয়। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিকে ইদানীং সে ধাপে ধাপে এরূপ উদ্ধত, দুর্বিনীত ও লুব্ধ করে তুলেছে যে, কোন কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি স্বাভাবিকভাবেই এই কঠিন সমস্যাটির নিষ্পত্তি করা খুব সহজ সাধ্য ভেবে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এর পিছনে বহু সামর্থনও রয়েছে—পুলিসের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী রাজদ্রোহীর প্রণয়িনীকে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করবার নজীর এদেশে এবং ওদেশে অভাব নেই। এই মেয়েটির সংস্পর্শে এসে সুদর্শন বরাবর লক্ষ্য করেছে যে, কোন রকম আশংকার ধার দিয়েও সে কেন যেতে চায় না। তার ধারণা যে, কোন শক্তিই তার কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারে না। সুদর্শনের সংকল্প জেনেও সে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেই তাকে যেন অবাক করে দিতে চায়, আর এমনভাবে হাসির গিটকিরি দিয়ে রহস্যময় ভাষায় কথাগুলো বলে যায়, যার মর্মোদ্ধার করাই কঠিন হয়ে পড়ে। সুদর্শন এখন এর হেস্তনেস্ত করতে চায়। যদি আজ সে এই দুর্বিনীতা মেয়েটিকে চরম অপমানের আঘাত দিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে, তারপর এর প্রকৃতির কি রূপান্তর ঘটে, সেটাও কি এক অভিনব রকমের দর্শনীয় বস্তু নয়? এই শ্রেণীর রহস্যময়ী নারীর মনোবৃত্তি নির্ণয়ের পক্ষে সেটাও ত একটা নূতন ধরণের নজীর হতে পারে!

ইংরাজিতে Thought Reading (চিন্তা-পাঠ) বলে একটা কথা আছে। ব্যাপারটিকে মনোবিজ্ঞান বলা যায়। এটা যে একেবারে

বিদেশী ব্যাপার ঐ ইংরিজী শব্দটার জন্যে, একথা মনে করা ভুল। প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানেও অন্যের মনের কথা জানবার প্রসংগ ও পদ্ধতি আছে। 'সর্বজ্ঞ' ও 'অন্তর্যামী' শব্দ দুটি প্রাচ্য সংস্কৃতির অবদান, সাহিত্যের অলংকার। ভারতীয় যোগীরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা পাঠ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বর্তমানে কোন কোন শিক্ষিত যাদুকরকেও চিন্তা পাঠ করতে দেখা যায়। কিন্তু এই বিদ্যা যাঁদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও কার্যকরী হতে পারে, তাঁরাই একে উপেক্ষা করেন, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। দুর্গার মতন সুদর্শনও যদি চিন্তা-পাঠে অভ্যস্ত থাকত, তাহলে তাকে এই সব সমস্যার চাপে পড়ে বিব্রত ও বিরক্ত হতে হোত না।

এখন দুর্গা যে চরম প্রশ্ন তুলে চ্যালেঞ্জ করেছে, সুদর্শনকেই তার উত্তর দিতে হয়। সাহস করে মুখ তুলে হয় তাকে কথাটা মেনে নিতে হয়, নয় ত প্রতিবাদ তুলে বলতে হয়—না। কিন্তু সুদর্শনের মনে হলো যে, দুর্গাই তার কাজ এগিয়ে দিয়েছে—অনুমানের ওপর নির্ভর করে মনের অভিপ্রায়টা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে। এখন তারই উত্তর দেবার পালা।

হ্যাঁ, উত্তর তাকে দিতেই হবে, কিন্তু কথায় নয়; কথা কাটাকাটি ত এই মেয়েটির সঙ্গে অনেক হয়ে গেছে, আর সুদর্শনকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কথায় সে কোনদিনই পেরে ওঠেনি—কথার ব্যাপারে অতিরিক্ত রকমের পাকা এই মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু কথাইত সব নয়, কাজে যদি সে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে এ সব কথার কি দাম তখন থাকবে?

হ্যাঁ—কাজ। পুরুষ সে, কাজেই তাকে কৃতিত্ব দেখাতে হবে—বিশেষতঃ সে যখন এইমাত্র চ্যালেঞ্জ করেছে!

উপর থেকে কোনো ভক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করে চিল যেমন তীরের বেগে ছুটে আসে তার দিকে কিম্বা সামনের কোন দুর্বল পশুর উপর নজর রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে ক্ষুধার্ত শার্দুল—ঠিক তেমনি একটা লুব্ধ প্রবৃত্তি নিয়ে কয়েক হাত মাত্র দূরে মর্মর মূর্তির মত স্থির নির্বাক ধীর নারীটির হাত দুখানি সবলে চেপে ধরবার জন্য সবেগে ছুটে গেল সুদর্শন। সে স্থির করেছিল, তার বলিষ্ঠ দুটি হাতে যুগপৎ দুর্গার হাত দুখানি এমন অতর্কিত ভাবে ধরে ফেলবে যে, জুজুৎসুর কোন রকম প্যাঁচ কসবার সুযোগই সে পাবে না—তখন করবে সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ব্যাধের কঠোর হাতে কুরঙ্গিনী ধরা পড়লে তখন সমস্ত মনোবলই সে হারিয়ে ফেলে ব্যাধের কাছেই আত্মসমর্পণ না করে পারে না—এ তথ্য সুদর্শনের জানা আছে।

কিন্তু সুদর্শনের মনের হিসাব বুঝি আগেই ফাঁস হয়ে গেয়েছিল, নৈলে দুর্গার হাত দুখানার দিকে নিজের সবল হাত দুখানা বাড়িয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়বার আগেই দুর্গা খিল খিল করে হেসে ঝাঁ করে পাশের গোলাপ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবে কেন? মনের ইচ্ছাটির হিসাব সুদর্শন করলেও তার বেগের হিসাবে ভুল হয়েছিল নিশ্চয়ই! এমন কি, দুর্গা যদি সরে না দাঁড়াত, বে-হিসাবী বেগের জন্যে তাকে দুর্গার সঙ্গেই হুড়মুড় করে সেই কংকরময় পথে পড়তে হোত! দুর্গা সরে গিয়েছিল তাই রক্ষা, সুদর্শন নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেইখানে হাত দুখানা দিয়ে মাটিটা আঁকড়ে ধরে। ফলে, কোন রকমে সে নিষ্কৃতি পেল বটে, কিন্তু উভয় হাতের তালু দুটো কাঁকরের ঘসড়ায় ছড়ে গেল, জ্বালাও ধরল রীতিমত। তবে হাত দু'খানার জন্যেই হাঁটু দুটো আর আঘাত পেল না।

গোলাপ গাছের ডাল থেকে ফুটন্ত একটা গোলাপ তুলে তার

আঘ্রাণ নিতে নিতে দুর্গা বলল : হাত দুটো ঠিক বাঘের থাবার মত বাগিয়ে ছুটেছিলেন কিন্তু—একেই বলে—ব্যাঘ্র-ঝম্প! ক্যামেরা কাছে থাকলে, ফটোটা তুলে নিতাম। লোককে দেখাতাম—গোলাপ বনে বাঘের খেলার ছবি। এরপর একটা ক্যামেরা নিয়ে বেরোবেন কিন্তু!

প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলেই আবার খিল খিল করে হেসে উঠল দুর্গা।

সুদর্শন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে; দুর্গার কথায় তার হাত দুখানাও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে—যদিও মুষ্টির মূলে তখন রক্ত ঝরছে, আর—একটা যন্ত্রণাও অনুভূত হচ্ছে ধীরে ধীরে! সুদর্শন এরপর সমস্ত দেহটাকে টান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুর্গার পানে আর একবার তাকাল—কি তীব্র সে দৃষ্টি!

মুখখানা এক ঝলক হাসিতে ভরিয়ে হাতের ফুলটি তেমনি করেই শুঁখতে শুঁখতে দুর্গা বলল: আশ্চর্য ভাবেই মিলে যাচ্ছে কিন্তু—শিকার হাত ছাড়া হোলে বাঘের দৃষ্টিও ঠিক এমনিতরই হয়! একখানা আয়না কাছে থাকলে দেখাতাম। এর পর যখন শিকারে বেরুবেন, মনে করে পকেটে একখানা আয়না রাখবেন সুদর্শন বাবু!··· কথার পরেই আবার খিল খিল করে হাসি!

সুদর্শনের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল রাগে; হাসির শব্দের সঙ্গে কংকর-ময় মাটিতে জুতা শুদ্ধ ডান পাটি সবলে ঠুকে সে বলে উঠল: মনে রেখো, ঐ হাসির পেছনে আছে বুক-ভাঙা কান্না—

বেদনাহতের মত মুখভংগি করে কৃত্রিম ব্যথার সুরে দুর্গা বলে উঠল: য়্যাঁ—কাঁদাবেন আমাকে? এই আপনার এত ভালবাসা! তাহলে আর দেরী করছেন কেন, পিস্তলটা বার করে নিশানা করুন,

আমিও 'হা হতোস্মি' বলে লুটিয়ে পড়ি আপনার সামনে। চমৎকার স্থান, তোফা ফুল বাগান—চারদিকে ফুল ; মৃত্যুর পর দেহটাকেও ফুল দিয়ে নিশ্চয়ই ঢেকে দেবেন। আহাহা—'সে মরণ স্বরগ সমান গণি !' কিন্তু একটা বিপত্তিও তাতে আছে। তখনি কিন্তু সব্যসাচী এসে টুঁটি চেপে ধরবে, তারপর গায়ের ছালখানা ছাড়িয়ে—

—হুম !

সুদর্শন এবার অধৈর্য হয়ে চাপা হুঙ্কার তুলে সবেগে এগিয়ে গেল দুর্গার সামনে। দুর্গা কিন্তু তার আগেই গোলাপ গাছের কণ্টকময় ফুল-পাতা-ভরা পুরন্ত ডালটি এমনি কৌশলে সামনে হেলিয়ে দিল যে কাঁটার ভয়ে সুদর্শনকে পিছিয়ে আসতে হলো। সেই বহু প্রশাখাযুক্ত কণ্টকময় ঘন ডালটি দুজনের মাঝখানে ব্যবধানের মত দেখা গেল।

খিল খিল করে হেসে দুর্গা বলল : দেখলেন ত, কাঁটার ভয়ে পিছুতে হলো ! পুলিসের লোকও কাঁটাকে ভয় করে তাহলে !

সুদর্শন মুখখানা বিকৃত করে বলল : কাঁটার কথা থাক, আমি সব্যসাচীর কথা ভাবছি। তুমি যে তার সন্ধান জানো, সে বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ।

সুদর্শনের আরও কিছু বক্তব্য ছিল। কিন্তু তার আগেই দুর্গা তাড়াতাড়ি বলে উঠল : সুতরাং তার সন্ধানটি আমাকে এখনি দিতে হবে—এই ত আপনার হুকুম ?

দৃঢ় স্বরে সুদর্শন বলল : অগত্যা তাই। হাঁ—আমি ঐ ডাকাতটার সন্ধান চাই।

সহজ কণ্ঠেই এবার দুর্গা বলল : কিন্তু তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? তিনি আপনাকে যে 'ওয়ার্ণিং' দিয়েছেন, আজই ত তার মেয়াদের শেষ দিন। বেরোবার আগেই সে কথা মনে ফুরিয়ে

দিয়েছিলাম—মনে নেই? তারপর, আসছে কালই ত পুলিস-সুপারের আফিসে আপনাদের মিটিং বসছে?

চোখ দুটো পাকিয়ে চড়া গলায় সন্দিগ্ধ স্বরে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি করে জানলে সে কথা? মিটিংএর কথা ত—

—আমাকে বলেন নি—এই ত? কিন্তু না বললেও কি জানা যায় না বলতে চান? অথচ সব্যসাচীর সন্ধান চাচ্ছেন আমার কাছে! এতখানি আনাড়ি আমাকে ভেবে রেখেছেন কেন বলুন ত? হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ঐ মিটিংএর পরও যদি সব্যসাচীর দেখা না পান, আমি কথা দিচ্ছি—যাতে তাঁর দেখা পান তার উপায় করে দেব।

দুর্গার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুদর্শন বলল: তাহলে আমার অনুমানটাই সত্য, সব্যসাচীর সমস্ত খবরই তুমি জানো! আচ্ছা, তাহলে এ খবরটা আমাদের জানাবে কি—ত্রিকূট পাহাড়ে ডিগবাজী খাবার পরেই তোমার সেই পাটনাই প্রেমিক প্রতাপবাবুই সব্যসাচীর খেলাটি দেখাচ্ছেন কিনা?

প্রশ্নটা শুনেই দুর্গা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল—এখনকার হাসি আরো তীব্র, তার গমকও চলল অনেকক্ষণ ধরেই। সুদর্শন একই ভাবে দুর্গার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে বলল: তোমার এ হাসির মানেটা আমি বুঝেছি। পাছে মুখের ভাবটা দেখে মনের ভাবটা ধরতে পারি, তাই অমন করে হেসে সব ভণ্ডুল করে দিলে! যাক, যা জিজ্ঞাসা করেছি, তার জবাব দাও।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দুর্গা বলল: যে কথার মানে নেই, তার জবাবও নেই।

রুক্ষস্বরে সুদর্শন বলল: অর্থাৎ—

তেমনি গম্ভীর মুখেই দুর্গা বলল: আমার কাকাকে জিজ্ঞাসা

করবেন, অথবা কলকাতায় আপনার বাবাকেও লিখতে পারেন। তাঁরা সবাই মিলে তদন্ত করে প্রতাপবাবুর অপমৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। আর আপনাকে'ত আগেই আমি বলেছি—তিনি অন্যের কাছে যাই হোন, আমার কাছে অনন্যসাধারণ কিছু—সেই ভেবেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি, পূজা করি। কোন অমানুষের মুখে তাঁর মতন এক অতিমানুষের প্রতি অশ্রদ্ধাকে আমি অপরাধ বলেই মনে করি।

সুদর্শনও গম্ভীর হয়ে বলল: জবাব আমি পেয়েছি—এখন বাড়ী যাওয়া হবে কি?

সুদর্শনের চোখের দিকে চেয়ে দুর্গা বলল: কি জবাব আপনি আমার মুখ থেকে পেলেন জানিনে; কিন্তু, বাড়ী যাবার কথায় আমি আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করছি যে, আপনার মনের বাঘটা এখনো জেগে আছে—ঘুম পাড়ানো উচিত।

চোখের দৃষ্টি আরো একটু প্রখর করে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: ও! ভয় পেয়েছ বটে! তাই বুঝি—গোলাপ গাছের ডালটাকে ঢালের মতন আড়াল করে তার পিছনে দাঁড়ানো হয়েছে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে? অনুভব শক্তিটা আমারও কিছু কিছু আছে।

ঠোঁটের কোনে বিচিত্র রকমের হাসি একটু ফুটিয়ে দুর্গা বলল: সেই অনুভব শক্তিটা দিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করুন না কেন—সভ্য শিক্ষিত সমাজের কোন মানুষ সঙ্গিনী নারীকে নির্জনে পেয়ে বাঘের মুখে যদি ঠেলে ফেলে দিতে চায়—সভ্য সমাজে তার কি পরিচয়?

আঘাতটা কোথায় পড়েছে সেটা স্পষ্ট বুঝেও না বোঝবার ভাণ করে সুদর্শন বলে উঠল: তুমিও কি তাহলে মনে কর—

সুদর্শনের মনের কথা মুখে আটকে গেল—দুর্গা অকস্মাৎ সেই

কথার পীঠেই তীক্ষ্ণস্বরে বলল: সত্যিই আমি মনে করতে পারি নি যে—এমন করে এত শীগগীর আপনি মুখোস খুলে ফেলবেন।

সুদর্শন বলল: সব্যসাচীর জন্যেই মুখোসটা খুলতে হয়েছিল।

প্রতিবাদের সুরে দুর্গা বলল: না—আপনার মনের বাঘটা ক্ষেপে উঠেই মুখোসখানা খুলে দিয়েছিল সুদর্শন বাবু! বাঘের সেই ক্ষিপ্ত দৃষ্টি এখনো আপনার চোখে দেখছি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: তাই কি সঙ্গে যেতে ভয় হচ্ছে?

মুখখানা আরো উঁচু করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দুর্গা বলল: দাঁতাল, মাতাল, আর সিংয়েল—এই তিনটি প্রাণীকে তফাতে রেখে যেতে শাস্ত্রকাররা নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি এদের মধ্যে কোনটির পর্যায়ে পড়ছেন ভাবলেই আমার কথাটার উত্তর পাবেন।

চোখের দৃষ্টি আরো একটু প্রখর করেই সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: কিন্তু গাছের ঐ ডালটার আড়ালে থেকেই কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে?

মৃদু হেসে দুর্গা উত্তর করল: বিপন্নকে ভগবানই রক্ষা করেন। আপনার মনের পশুকে শান্ত করবার মানুষ এসেছে—আপনাকে আর এগিয়ে আসতে হবে না, পিছনে চেয়ে দেখুন।

সত্যিই সুদর্শন এগিয়ে যাচ্ছিল গোলাপের ডালটাকে অতিক্রম করে ঘুরে দুর্গার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু তার কথা শুনে ফিরে তাকাতেই দেখল—ঠিক পিছনেই বিচ্চু তখন দুপাটি দাঁত বিকশিত করে হাসছে, তার হাতে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া।

ফুলের তোড়াটি ছোট সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বিচ্চু সেটির দিকে তাকিয়ে মুখ-চোখের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করল। সুদর্শনের চোখ দুটো তখন যেন জ্বলছে—সাধ্য থাকলে সেই

চোখের বহ্নিতে সে বিচ্চুকে ভস্ম করতেও কুণ্ঠিত হত না। দুর্গা কিন্তু পলকেই ব্যাপারটা বুঝে সুদর্শনের পানে তাকিয়ে সহাস্যে বলল: বিচ্চু বলছে কি জানেন—আমরা এখানে যে আসব, ও তা আগেই জেনেছিল ; তাই আমাদের আসবার আগেই এখানে এসে আপনাকে দেবার জন্যে বেছে বেছে সেরা ফুলগুলো তুলে এই তোড়া বানিয়েছে। এখন ওটি আপনি নিলে ও কৃতার্থ হয়!

দুর্গার কথা শেষ হতেই বিচ্চু তার আকর্ণবিস্তৃত দন্তপাটি পুনরায় বিকশিত করে তোড়াটি সুদর্শনের হাতে দিতে গেল। কিন্তু সুদর্শন তার আগেই সেটা বিচ্চুর হাত থেকে সবলে টেনে নিয়ে তার মাথার উপরে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করল যে, গোলাপ-পল্লবের তীক্ষ্ণ কাঁটার আঁচড় লেগে বিচ্চুর কপাল ও গণ্ড রক্তাক্ত হয়ে উঠল। দুর্গার মনে হলো যে, সে আঘাত বুঝি তারই উপরে পড়েছে। মুহূর্তে তার শান্ত প্রফুল্ল কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানাও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদর্শনের মুখের দিকে চেয়ে রুক্ষস্বরে দুর্গা বলল: বিচ্চুকে দেখে রাগ আপনার হবে তা জানতুম, কিন্তু গায়ের ঝালটা যে ও বেচারীর ওপরেই ওভাবে ঝেড়ে বীরত্ব দেখাবেন—এতটা ভাবি নি। তবে মনে রাখবেন সুদর্শনবাবু—ইচ্ছা হয়ত, আপনার নোটবুকে টুকে রাখুন—কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করে এর জবাবও আপনি পাবেন।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই দুর্গা বিচ্চুকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে এনে সাড়ীর আঁচল দিয়ে তার মুখের যেখানে যেখানে কাঁটার আঁচড় লেগে ছড়ে গিয়ে অল্প অল্প রক্ত পড়ছিল—মুছিয়ে দিতে লাগল। সুদর্শন দুই চক্ষু পাকিয়ে প্রখর দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখে বলল: এই ডেঁপো বোবাটার ওপর দরদে ভেঙ্গে পড়ে যে কথাগুলো বলে আমাকে শাসানো হলো, হিসেব করে বলনি নিশ্চয়?

অগ্নিবর্ষী-দৃষ্টিতে সুদর্শনের দিকে একটিবার চেয়ে দুর্গা তার কথার উত্তরে বলল : কথা আমি হিসেব করেই বলি, তার নড়চড় হয় না। হয়ত, এখনকার কথাটা খুব কড়া হয়েই বেরিয়েছে, কিন্তু সেটা নিরুপায় হয়েই বলতে হয়েছে। যদিও ছেলেবেলা থেকে শক্ত হবার শিক্ষাই পেয়ে এসেছি, কিন্তু নারীসুলভ প্রবৃত্তি এখনো বদলায় নি—কাউকে আর্ত দেখলে যেমন সেবার কথা মনে পড়ে, অত্যাচারও তেমনি মনটাকে বিষিয়ে দেয়। তাই আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে ও কথা বলিছি।

মুখখানা বিকৃত করে সুদর্শন বলল : আর ঐ বলা থেকে আমিও আসল কথাটা বুঝিছি—যে জন্যে হিসেবের কথা বলি ।

—কি বুঝেছেন আপনি ?

—যেহেতু বিচ্চুর বেয়াদপির জন্যে ওকে শাসন করেছি, সেই হেতু আমাকেও কেউ শাসন করবে—এই ত ? আচ্ছা এখন বলত, রাগের মাথায় যে কথা বলে ফেলেছ, কঠিন শাস্তি পাবার কথাটা নোটবুকে লিখে রাখতে বললে—সেই শাসকটি নিশ্চয়ই সব্যসাচী ? তাহলে বিচ্চুর সঙ্গেও তার সম্বন্ধ আছে বল! একটা নতুন হদিস পাওয়া গেল—এটা অবশ্যি নোটবুকে লিখে রাখা উচিত। নয় কি ?

দুর্গা এবার সহজভাবেই বলল : আমি এইটুকু বলতে পারি, যারা অন্যায় করে, যারা অত্যাচারী, আর যাদের উপর অন্যায় ও অত্যাচারের দণ্ড পড়ে—তাদের সঙ্গে সব্যসাচীর সম্বন্ধ আছে বৈকি। শুধু আমার সঙ্গে আর বিচ্চুর সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ আছে বললে ব্যাপারটিকে ছোট করা হয় সুদর্শন বাবু! যাক, এখন বোধ হয় বাড়ী ফেরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ?

সুদর্শন মনে মনে দুর্গার কথাগুলির অর্থবোধ করছিল। বাড়ী

ফেরার কথাটা শুনেই বলল : একথা কি ভেবে বলা হলো ?

দুর্গা উত্তর করল : বাড়ী ফিরতে যে বাধা ছিল, বিচ্ছু আসাতে কেটে গেল। ইচ্ছা হয়ত আপনি সারারাত এই গোলাপ বনে বসে বসে হাওয়া খান। আমি এখন বিচ্ছুর সঙ্গে অনায়াসে যেতে পারি।

সুদর্শন ভ্রূকুটি করে বলল : সে স্বাধীনতা তোমার নেই। দাদা-বাবুর হুকুম হচ্ছে বাহিরে তোমাকে একলা ছেড়ে দেওয়া হবে না—আমাকেই রক্ষী হয়ে সঙ্গে থাকতে হবে।

মৃদু হেসে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : তাহলেই আমাকে রক্ষা করতে পারবেন ?

কেন—সন্দেহ আছে নাকি ?—বলেই সুদর্শন তার ডানদিকের ঝোলা পকেটটা চেপে ধরল—যেখানে আছে পর পর পাঁচটা টোটা-ভরা অটোমেটিক রিভলবার।

মুচকি হেসে দুর্গা বলল : বেশ ত. রক্ষী হয়েই তাহলে পিছনে পিছনে আসুন—আমি এগুই। বিচ্ছু তুই আগে আগে চল।

দুর্গার চোখের সংকেত লক্ষ্য করেই কলের পুতুলের মত বিচ্ছু এগিয়ে চলল। সুদর্শনের দিকে আর একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দুর্গাও তার অনুসরণ করল।

সুদর্শনের সমস্ত রাগ এখন বিচ্ছুর উপরে পড়েছে—এই বোবাটা না এসে পড়লে আজ শেষ পর্যন্ত সে বাজীমাত করতই। একটা বাচাল মেয়ে খালি খালি মুখের ওপরে কতকগুলো চোটপাট কথা বলে বরাবরই তাকে দাবিয়ে চলেছে; একটিবারও সে এই মেয়েটাকে নিজের হাতের আয়ত্তে এনে চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিতে পারছে না যে, সে পুরুষ—ক্ষমতাশালী পুরুষ, ক্ষমতা দিয়ে সে তাকে

জয় করেছে! বে-পরোয়া হয়ে সে যখনই শেষ বার তার দেহের এবং মনের এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবার জন্যে জিদ ধরেছিল, ঠিক সেই সময় এই হতভাগাটা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল একটা ফুলের তোড়া হাতে করে! এখন ত আর ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলে না—পরম সুযোগটি যা এখানে আজ এসেছিল, তাকে ঠিকমত ব্যবহার করা হলো না—আবার তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে! এই ভেবেই সুদর্শনকেও ওদের পিছু পিছু যেতে হলো মনের উদ্ধত ভাবটাকে জোর করে চেপে রেখেই।

বাইরে এসে গম্ভীরভাবে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: বাড়ী যাবে না, আরও ঘোরা হবে খানিকটা?

যেন কোন কিছু ঘটেনি এমনি ভাব-ভঙ্গিতে দুর্গা বলল: বাড়ীতে যাওয়া এখন উচিত মনে হচ্ছে; সন্ধ্যা হয়েছে—এখন আর ঘোরাঘুরি ঠিক নয়। ছেলেবেলার শোনা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সময়টা দেখে! কথায় আছে না—'ভর সন্ধ্যা বেলা—ভূতে মারে ঢেলা!'...কথাগুলি বলেই সুদর্শনের দিকে চেয়ে দুর্গা আবার আগেকার মত খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

সুদর্শন তেমনি গম্ভীর মুখেই বলল: ভূতের ভয় আমার নেই, তবে পোষা ভূত যদি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, সে কথা আলাদা।

দুর্গাও একটু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল: কাকে লক্ষ্য করে পোষা ভূত বলা হলো?

সুদর্শন বলল: সে তুমিই জানো—ভূতের কথা যখন তুমিই তুলেছ!

দুর্গা বলল: তাহলে কথাটা তোলাই আমার ভুল হয়েছিল। ভূত যে পুলিসকেও ভয় করে, একথা মনেই ছিল না। আসল কথা কি

জানেন সুদর্শন বাবু, এতদিন পুলিস সাহেবের ভাইঝি হয়ে পুলিসের বাংলোয় থেকে, পুলিসের আইন কানুন দেখেও নিজেকে ঠিক মত খাপ খাইয়ে নিতে পারি নি। অর্থাৎ, পুলিস আর সাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান—আজ পর্যন্ত আমার জীবনে সেটা ঘুচে যায় নি। তাই আমার কথা অনেক সময় আপনাদের মনে কটমট ঠেকে।

সুদর্শন বলল: দিনকতক আমার সঙ্গে যদি প্রাণ খুলে মিশতে পার, এ ব্যবধানও ঘুচে যাবে দেখো। আর এটা ঘোচাবার জন্তেই আজ তোমাকে এই বাগানে এনেছিলাম, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে—প্রাণ খুলে মিশতে পারলে না।

মৃদু হেসে দুর্গা বলল: দোষটা কি আমার বলতে চান? কেমিষ্ট্রী পড়েছেন ত, মেশানো ব্যাপারটাই হচ্ছে আসল কাণ্ড! কি করে মেশাতে হয়, তার জন্তে যে পরিমাণ বিদ্যা বুদ্ধি ধৈর্য ও অভিজ্ঞতার দরকার—সে গুলি না থাকলে সবই বৃথা হয়। কত রকমের বস্তু সেখানে থাকে বলুন ত! রং আলাদা, গুণ আলাদা, গন্ধ আলাদা, অথচ শিক্ষিত-পটু হয়ে হিসেব করে মিশিয়ে দিতে পারলে তার ফলও হয় চমৎকার—সৃষ্ট হয় এক নবতম অপূর্ব বস্তু। এই থেকেই ত জগতের শ্রেষ্ঠ গন্ধসার উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার মিশাতে না জানলে, আনাড়ির হাতে পড়ে সেই মিশ্রিত বস্তুই কিম্ভূতকিমাকার এমনি বিশ্রী পদার্থ হয়ে দাঁড়ায় যে তার গন্ধে ভূত পর্যন্ত পালায়। আপনি মনে মনে কোন উদ্দেশ্য পোষণ করে একটা মনের সঙ্গে আর একটা মনকে মেশাবার মতলব করছিলেন—কিন্তু ব্যর্থ হলেন কেন, সে দোষ কার, তা তো ভাবছেন না!

সুদর্শন অবাক হয়ে কথাগুলো শুনতে থাকে; খুব সোজা সহজ কথা, কিন্তু ঠিক মত তাৎপর্য তার মাথায় আসে না। মনে হয়—

যেন হেঁয়ালি। কিন্তু ভাবতে ভাবতে সহসা একটা অর্থও সে যেন খুঁজে পায়, হেঁয়ালির ভিতর থেকেই সেই অর্থটা বেরিয়ে আসে; তাতে নিজের অক্ষমতাই যেন স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সুদর্শন মনে মনেই বলে উঠে—না না, ঠিক কথাই বলেছে দুর্গা, দোষ ত আমারই! নির্জন বাগানের মধ্যে তাকে পেয়েও কেবল কথা কাটাকাটিতেই সময়টা কেটে গেছে—পৌরুষের দিক দিয়ে সত্যিই ত আমি পিছিয়ে গেছি, হেরে গেছি। একটা সংকোচ আমাকে ক্রমাগতই বাধা দিয়েছে—যতটা সাহস করে এগিয়ে যাওয়া আমার উচিত ছিল, তাও পারিনি! দুর্গা ত ঠিক কথাই বলেছে। আচ্ছা, এবার আর ভুল হবে না। ভাবতে ভাবতে বিচ্চুর দিকে তার নজর পড়ে—কালো সয়তানটা যেন ঢালের মতন দুর্গাকে আগলে নিয়ে চলেছে। এই হতভাগাটা যদি সে সময় এসে না পড়ত, তাহলে হয়ত দুর্গার পক্ষে ওভাবে টিটকিরি দেওয়া আজ আর সম্ভব হোত না—এই বাচাল মেয়েটাকে জয় করেই সে বাসায় ফিরতে পারত।

হঠাৎ সুদর্শন বলল: চল না, একটু ঘুরেই যাই। বিচ্চু বরং বাসায় গিয়ে বলুক, আমরা খানিক পরে যাচ্ছি।

দুর্গা বলল: প্রস্তাবটা ভালোই, কিন্তু হাজার হোক আপনার উপরে একটা মায়া বসেছে ত, তাই সমর্থন করতে পারলুম না—মাপ করবেন। মনের একটা ঝোঁক মেটাতে বিঘোরে মারা পড়েন, এ আমি চাইনে।

দুই চক্ষু পাকিয়ে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: মারা পড়বো মানে?

দুর্গা বলল: মানে গোলাপ বাগানে যে কাণ্ড করতে চেয়েছিলেন, সব্যসাচী এতক্ষণে তা জেনেছেন। বিপথে এখন বেরুলেই বিপত্তি ঘটতে পারে।

সুদর্শন বিরক্ত ভাবে বলল: আবার সেই হেঁয়ালী সুরু করলে? আসলে—তোমারই সাহস নেই বল।

মুখ টিপে হেসে দুর্গা বলল: আমার সাহস যে কতখানি—আর একদিন আপনাকে দেখাব। তবে, আজ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার মনের বাঘটাও ঘুমিয়ে পড়েছে—নাই বা তাকে আর জাগালেন, ভালোয় ভালোয় ফিরে যাই চলুন।

সুদর্শন এর পর কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুর্গা তাড়াতাড়ি তার আগেই বলল: বিচ্চু বেচারীর কাণ্ড দেখেছেন? তার হাতের তৈরী ফুলের তোড়াটি আপনাকে দিলে, আর আপনি ত তাই দিয়েই ওকে পিটলেন। ও কিন্তু তোড়াটি ফেলে আসে নি, নিয়ে এসেছে। আমি ওকে বলিছি ছোট সাহেবের ঘরে ফুলদানিতে রাখিস্, সাহেব কিছু বলবে না।

সুদর্শন বলল: সত্যিই বিচ্চুর ওপরে আমার ব্যবহারটা ভালো হয় নি—বিচ্চু, কিছু মনে করিস নি তুই।

বিচ্চু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে ছোট সাহেবকে শ্রদ্ধা জানালো। দুর্গা বলল: বিচ্চু বলছে—ছোট সাহেবের কথা শুনে ওর নাচতে ইচ্ছা করছে।

এর পর দুর্গাকে নিয়ে আরো খানিকটা বেড়াবার কথা চাপা পড়ে গেল, তিনজনেই একসঙ্গে বাংলোয় ফিরল।

পুলিস-সুপার জাহ্নবীর অফিসে সেই সুপ্রশস্ত হলঘরে পূর্বপরিকল্পিত বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। আলিজানই সে-দিন এভাবে এখানে একটা বৈঠক বসাবার যুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর কথামতই সব্যসাচী কর্তৃক নির্দিষ্ট সাত জন ব্যবসায়ী ব্যতীত, উক্ত ব্যবসায়ীদের কথিত সহর ও সহরতলীর এমন কতকগুলি ব্যবসায়ী এই বৈঠকে আহূত হয়েছেন, পুরুষানুক্রমে যাঁরা এই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্যবসায়সূত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁদের প্রচুর। কিন্তু সব্যসাচীর পত্র সম্পর্কে বহিরাগত সাত জন ব্যবসায়ী সেদিনের বৈঠকে এঁদের সম্বন্ধেই কটাক্ষ করেছিলেন।

পুলিস-সুপার তলব করেছেন শুনেই বে-সরকারী এই নিরীহ ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। চেদীলাল চৌবে, হরনাম পাঁড়ে, সত্যনারায়ণ মিশ্র, রামকৃষ্ণ খান্না, সুশীল সমদ্দার, নিবাইস মোল্লা প্রমুখ ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ের খানিকটা আগেই কোতোয়ালীতে উপস্থিত হলেন। কম্পিত পদে ত্রস্তভাবে পুলিস-সুপারের আফিসে প্রবেশ করতেই তাঁদের সকলকে হলঘরের বৈঠকের একদিকে যত্ন করেই বসানো হলো। আলিজানের উপর বাহিরের ব্যবসায়ীদের সম্বর্দ্ধনার ভার পড়েছিল। আলিজানও ইতিমধ্যে সরকারী বে-সরকারী ব্যবসায়ী মহলে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি, সরকারী সেই নামকরা সপ্ত ব্যবসায়ী, সুদর্শনকে লিখিত পত্রে সব্যসাচী সপ্ত সয়তান নামে যাদের উল্লেখ করেছিল, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা আলি-

জানের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি পর্যন্ত পাকা করে ফেলেছেন—তাঁদের মজুত-মহলে রীতিমত পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করে লক্ষ লক্ষ টাকার সঞ্চিত পণ্যগুলি যাতে রক্ষা পায়। আলিজানের উপরে এই ভার অর্পণ করবার কারণ—সপ্ত ব্যবসায়ী সম্মিলিতভাবে যে অঞ্চলে পাশাপাশি সাতখানা গুদাম মধ্যে তাঁদের বিপুল পণ্যভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছেন, সেটি আলিজানের থানার এলাকায়। নিরাপত্তার দিক দিয়ে তাঁরা বর্তমানে আলিজানের রক্ষণাবেক্ষণে উক্ত আড়তগুলি সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বে-সরকারী ব্যবসায়ীরা বৈঠকে উপস্থিত হয়ে রোহিণী থানার আলিজানের এবং সহরতলীর গুটি দুই ছোট ছোট থানাদারকে মাত্র দেখতে পেলেন। খানিক পরেই অন্যান্য থানার দারোগারাও একে একে আসতে লাগলেন। এই সময় সপ্ত ব্যাপারী সব্যসাচীর ভাষায় সপ্ত সয়তানকে প্রবেশ করতে দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কতকটা আশ্বস্ত হলেন। তাঁরা ভাবলেন, হয়ত কোন পরামর্শের জন্যেই পুলিস-সাহেব সহরের ব্যবসায়ীদের ডেকে আনিয়েছেন—জিনিষপত্রের দরদাম সম্বন্ধে হয়ত কোন হুকুমনামা জানাবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট দুই আগে জাহ্নবী এলেন সুদর্শনকে সঙ্গে করে।

আলিজান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককেই সাদর অভ্যর্থনা করে নির্দিষ্ট স্থানে বসাচ্ছিলেন। সপ্ত ব্যাপারীর অভ্যর্থনা ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি দেখে বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে চুপি চুপি আলোচনাও হয়ে গেল। মিশ্রজী মুখ বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন: এ কিন্তু অতি অন্যায়! ওরা সরকারী সরবরাহদার বলেই কি এমন করে গলা বাড়িয়ে আদর করতে হবে! সাত সদাগর যেন সেথ আলিজানের সাত সম্বন্ধী!

জাহ্নবী আসন গ্রহণ করেই ব্যবসায়ীদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন: আপনাদের জন্যেই আজকের এই বৈঠক। জানেন ত সহরে পর পর কিভাবে একই ধরণের ক'টা ডাকাতি হয়ে গেছে? আর, প্রত্যেক জায়গাতেই এমনি সতর্ক হয়ে কাজ গুছিয়ে পালিয়েছে যে, ধরবার ছোঁবার মত কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি। কাজেই খুবই উদ্বিগ্নভাবে আমাদের থাকতে হয়েছে। সর্বদাই আমরা আশঙ্কা করছি, আপনাদের মধ্যে কখন কার কপাল ভাঙে। এ অবস্থায় পুলিসের উপরেই সব ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাত' ঠিক নয়—আপনাদেরও বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে—যাতে এ ব্যাপারের একটা কিনারা হয়, আর ডাকাতদের পাত্তা পাওয়া যায়। এখন আপনারা এ সম্বন্ধে কি বলতে চান?

কথাটা শেষ করেই জাহ্নবী সর্বাধিক বর্ষীয়ান ব্যবসায়ী চেদিলাল চৌবেজীর মুখের উপর তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ করলেন। চৌবেজীও বুঝলেন, সাহেব তাঁর কাছ থেকে সলা-পরামর্শ চান, আর তাঁকে জবাব দিতেই হবে। কাজেই, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে, হাত দুখানা যুক্ত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে কপালে ঠেকিয়ে সবিনয়ে বললেন: হুজুর যে আমাদের মতন গরীব পরোয়ারদের জন্যে এত উতলা হয়েছেন, সবাইকে ডেকে সলা পরামর্শ করতে চেয়েছেন, এতেই আমরা ধন্য হয়েছি। আমরা হুজুর, সত্যিই তাজ্জব হয়েছি ডাকুর বাহাদুরীর কথা শুনে। আর সেই ইস্তক আমরাও খুব হুঁসিয়ার হয়েই আছি, যাতে আমাদেরও ডাকুর কাছে বেকুব বনতে না হয়।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি চৌবেজীর মুখে নিবদ্ধ করে জাহ্নবী তার কথা শুনছিলেন এবং সেই সঙ্গে মুখের প্রতি ভংগি থেকে মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চৌবেজীর কথা বা ভংগির মধ্যে এমন কিছুই

পেলেন না—যা থেকে তাঁকে কোন রকমে সন্দেহ করতে পারা যায়। একটু থেমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা চৌবেজী, এই ডাকু সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

চৌবেজী ক্ষণকাল মনে মনে কি ভেবে গলায় একটু জোর দিয়ে বললেন: আমার বয়স হুজুর তিনকুড়ির উপরে গেছে, অনেক ডাকুর ডাকাতির কথা শুনেছি, কিন্তু এ রকম কাণ্ড কখনো হয়েছে বলে শুনিনি। হাঁক-ডাক নেই, হৈ হুল্লোড় নেই; ডাকু যেন যাদু করে লুঠে নিয়ে গেল! এ একবারে তাজ্জব ব্যাপার হুজুর!

জাহ্নবী গম্ভীর মুখে বললেন: তাজ্জব ব্যাপার ত বটেই! কিন্তু ডাকুর সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা জানতে পারি? আপনার কি মনে হয়—ডাকু এই সহরের লোক, না পরদেশী—বাইরে থেকে এসে এভাবে তাজ্জব ব্যাপার করে যাচ্ছে?

চৌবেজী বললেন: আমাদের মনে হয় হুজুর, ডাকু যেই হোক—এই সহরের খোঁজ-খবর সে রাখে, পথঘাট তার সব চেনা; নৈলে এমন করে সে কাজ বাগাতে পারত না।

জাহ্নবীর পাশেই বসেছিল সুদর্শন, সেও উদ্গ্রীব হয়ে চৌবেজীর কথা শুনছিল; এই সময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: আপনার কি মনে হয়—ডাকু এর মধ্যে এ সহরে কারুর ওপর হামলা চালাবে?

ছোট সাহেবের মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে চৌবেজীও ক্ষণকাল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন: পরমাত্মা জানেন হুজুর, ডাকু কি করবে! এখন আমাদের সবাইকে হুঁসিয়ার থাকতে হবে—এ ছাড়া আর কি বলতে পারি? তবে হুজুররা যদি কোন হুকুম দেন, আমরা তা তামিল করতে তৈয়ারী আছি।

জাহ্নবী এর পর চৌবেজীকে ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পড়লেন—প্রত্যেককেই কিছু না কিছু প্রশ্ন করে তাদের মনের ভাব-ভংগি বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই তারা চৌবেজীর কথার প্রতিধ্বনি ভিন্ন অন্য নূতন কথা কিছুই বললেন না। এবার কর্তব্যের দিক দিয়ে সপ্ত সওদাগরের দিকে পুলিস-সুপারের দৃষ্টি পড়ল। তাঁদেরও এখন এ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন না করলে ভালো দেখায় না—কারণ, চৌবেজী ও তাঁর পক্ষের ব্যবসায়ীদের মনে সন্দেহের সঞ্চার হতে পারে।

এঁরা সাতজনেই একটা কথার উপরে জোর দিয়ে তাঁদের অবস্থা বোঝাতে চাইলেন—যেহেতু তাঁরা সরকারকে মালপত্র সরবরাহ করবার মঞ্জুরী পেয়েছেন, সেইজন্যে তাঁদের উপরেই ডাকুদের বেশী আক্রোশ। এর আগে যে কয়স্থানে ডাকাতি হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সরকার-ঘেঁষা। তাই এঁদের অবস্থা এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

এঁদের বলবার পালা শেষ হলে জাহ্নবী আর একচাল চাললেন। মুখখানা বেশ শক্ত করে বললেন: আমরাও নিশ্চিন্ত নই, আর সরকারও চুপ করে বসে নেই; এমন সব পাকা গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে—যাদের কাছে কিছুই চাপা থাকবে না, ডাকুও ধরা পড়বে, আর যারা তাকে আস্কারা দিচ্ছে, তাদের সয়তানীর মুখোসও খুলে যাবে।···কথার সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে রইলেন—শেষের কথা শুনে তাদের মুখমণ্ডলে আশংকার কোন ছায়া পড়ে কিনা দেখবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু এখানেও তাঁকে হতাশ হতে হলো।

এইভাবে প্রত্যেকের অভিমত সংগ্রহ করতে এবং কথার পীঠে কথা বলতে অনেকখানি সময় অতিবাহিত হলো। আফিসের ঘড়িতে

এগারোটা বাজতেই ঘর শুদ্ধ সকলেই চমকে উঠলেন ; তাইত, কথায় কথায় এত রাত হয়ে গেছে ? অগত্যা সকলকেই হুঁসিয়ার থাকবার নির্দেশ দিয়ে জাহ্নবী বৈঠক ভাঙতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় তাঁর টেবিলের পাশ থেকে টেলিফোন উঠল বেজে। তাড়াতাড়ি রিসিভার ধরে তিনি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যালো—কে আপনি ?

অপরিচিত কণ্ঠে ইংরাজীতে পাল্টা প্রশ্ন উঠল ফোনে : আপনি কি মিষ্টার মিত্র ?

রুক্ষস্বরে জাহ্নবী বললেন : হ্যাঁ, আপনি কে—কোথা থেকে ফোন করছেন ?

প্রশ্নের উত্তর এইভাবে পেলেন জাহ্নবী মিত্র : ফোন করছি সহর-তলীর কোন পুলিস ষ্টেসন থেকে—নামটা নাই বা শুনলেন ! এখানকার অফিসার আপনার বৈঠকেই এখন রয়েছেন, কাজেই আমার পক্ষে অসুবিধা হয় নি ; জমাদারটি লোক ভালো—তার ওপর ইংরিজীতে অজ্ঞ। আমাকেও চিনবেন এখনি—আপনার সহকারী মিষ্টার বসুর হাতের ফাইলটা খুলতে বলুন, তাতেই আমার আজকের চিঠি আছে। আর আপনার পেয়ারের সওদাগরদের পকেটের মধ্যেও থাকা সম্ভব। এখন বিদায়—নমস্কার !

কথাগুলো কোন রকমে শুনে গেলেন জাহ্নবী মিত্র—মর্মর মূর্ত্তিটির মত একইভাবে তাঁর আসনে বসে। চোখ দুটো বুঝি নিষ্পলক হয়ে ওদিকের সংলাপকারীর মূর্তিটা কল্পনায় দেখবার জন্যে স্থির হয়েছিল। শেষ কথার সঙ্গেই একটা পরিচিত আওয়াজ কাণে বাজতেই জাহ্নবী বুঝলেন যে, সংলাপকারী বেতার রিসিভার নামিয়ে রাখলে। কোন কথা বলবার আর ফুরসদ তিনি পেলেন না—তাছাড়া, এতগুলো লোকের সামনে তাঁর মনের কথা ঐ ইতরটাকে বলাও চলে না।

কিন্তু দত্তের সঙ্গে যে-সব কথা সে বলে গেল, তা কি সত্য ? সুদর্শনের ফাইলে কি তার লেখা নূতন কোন পত্র সত্যই আছে ? সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতজন ব্যবসায়ীর পকেটেও ?

জাহ্নবী ফোনটি রেখে যেভাবে সুদর্শনের দিকে তাকালেন, তাতে সুদর্শন এবং ঘরের আরও অনেকেই চমকে উঠলেন। দু তিন মিনিটের মধ্যে মানুষের মুখের ভাব যে এভাবে বদলে যেতে পারে, তা বুঝি ওঁদের ধারণাই ছিল না। নির্বাক দৃষ্টিতে সবাই এই গম্ভীর মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, কেবল সুদর্শন গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার দাদাবাবু ?

ভগ্নকণ্ঠে জাহ্নবী বললেন: সব্যসাচীর আর একখানা আল্টিমেটাম্ এসেছে। ওর ফাইলটা তোমার কাছে আছে না ?

অতি বিস্ময়ে সুদর্শনের কণ্ঠও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল; জাহ্নবীর মুখের পানে চেয়ে মাথাটা একটু নেড়ে সামনের টেবিলের উপর থেকে ফাইলটি নিয়ে সে জাহ্নবীর দিকে এগিয়ে দিল। জাহ্নবী বললেন: তুমিই ওটা খুলে দেখত—সহরতলীর কোন্ একটা থানা থেকে ফোন করেছিল এইমাত্র ডাকাতটা! বললে—ওরই মধ্যে তার চিঠি আছে।

এই অবিশ্বাস্য কথাটা শুনেই সুদর্শনের মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। আশ্চর্য, দাদাবাবুরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল যে, এই কথা বিশ্বাস করে উনি ফাইল খুলতে বলছেন! সমস্ত দিনটাই ত ফাইল তার সঙ্গেই রয়েছে, এখানে এসেও টেবিলের উপরে রেখেছে! এর মধ্যে সেই ইতরটার চিঠি কি আসমান দিয়ে উড়ে এসে সেঁধুল! বিরক্তির সঙ্গেই সে ফাইলের ফিতা খুলে উপরের মোটা মলাটটি সরাতেই বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত আহত হয়ে অদ্ভুতভাবে শিউরে উঠল। আশ্চর্য;

ফাইলের ভিতরকার কাগজগুলির উপরেই রক্তবর্ণের সেই বহু পরিচিত কুখ্যাত চিঠিখানা যেন তাকে ভ্রূকুটি করছে!

দারুণ বিস্ময়ের ভাবটি কাটিয়ে সুদর্শন চিঠিখানা তুলে ধরল সামনে, তখনো তার হাত কাঁপছে। ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট এতগুলি প্রাণীও স্তব্ধবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সুদর্শনের হাতের সেই রক্তবর্ণ রোকাটির দিকে। এই বিস্ময়কর পরিস্থিতির জন্য আশ্চর্য রকমের একটা নীরবতার মধ্যে সবাই যেন আত্মসমাহিত। একটু পরে জাহ্নবীই সে নীরবতা ভঙ্গ করলেন; শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বললেন: পড়—জোরেই পড়।

মুখখানা বিকৃত করে সুদর্শন পড়ল: আমার সেদিনের চিঠিতে লিখিত তারিখ অনুসারে আজ চতুর্থ দিন। তিনটে দিন প্রতীক্ষার পর হতাশ হয়ে অগত্যা আমি প্রতিকারে প্রবৃত্ত হলাম। পুলিস-সুপারের হুঁসিয়ারী আর আপনার খবরদারীর উপর টেক্কা দিয়ে লাল পরোয়ানা জারি হলো। শিউকরণ আগরওয়ালা, মাঠুরাম মহাতো, বিশ্বনাথ পণ্ডিত, কাদের আলি খাঁ, অতীন্দ্রনাথ দে, নূরবক্স মোল্লা ও গরীব সিং—এই সাত সয়তানের সংগোপনে মজুত করা সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করা গেলো এবং এরা প্রত্যেকে দু'টি হাজার হিসেবে টাকা যৌথভাবে দিয়ে লালা মদন-লালকে যে ব্যাপার করতে পাঠিয়েছিল বড় রকমের একটা দাঁও বাগাবার উদ্দেশ্যে, সেটা ওদের তরফ থেকেই লালাজী আক্কেল-সেলামী স্বরূপ সব্যসাচীর হাতে দাখিল করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের পক্ষে এটা আক্কেল-সেলামী হলেও, আমার বিচারে ঐ ১৪ হাজার টাকা হচ্ছে ওদের অপরাধের জরিমানা। আমার এই চিঠির প্রত্যেক কথাটি যে সত্য, মিটিং ভাঙবার আগেই তা জানতে পারবেন। আমরা আরো জানাচ্ছি যে, আমাদের কাজ একরকম শেষ হয়েছে। আপনার মুরুব্বী নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে,—ভারতীয়

আদর্শে যারা গড়ে উঠেছে, মহামানব বিবেকানন্দের বীর-বাণীর যারা সাধক, তারা মনে করলে সারা সাবডিভিসনকে অচল করে দিতে পারে—কোন পুলিস-পাহারা কিম্বা ফৌজ পলটনের কোন পরোয়া না করেই। যদি তিনি কথাটা বুঝে থাকেন এবং ভুল তাঁর ভেঙে গিয়ে থাকে ভালোই, নতুবা এর পর তাঁর সঙ্গেই সরাসরি বোঝাপড়া করতে হবে। আজকের বৈঠকেই সম্ভবত সাত সয়তানের সমাগম হয়েছে; তাদের উদ্দেশে যে লাল পরোয়ানা জারি হয়েছে—প্রত্যেকের পকেটেই তা পাওয়া যাবে। আজ এই পর্যন্ত। বন্দেমাতরম্!—সব্যসাচী।

যতক্ষণ সুদর্শন চিঠিখানা পড়ছিল—কক্ষে উপবিষ্ট প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের রেখাগুলি এমন গভীর ও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যায়! জাহ্নবী প্রথমে এই ভেবেই চিঠিখানা প্রকাশ্যে পড়তে বলেছিলেন যে, পড়বার সময় শ্রোতাদের মুখের ভাবভঙ্গি স্পষ্ট করে দেখে এ সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের কিছুটা আভাষ পাবেন। কিন্তু, চিঠিতে সে দুঃসাহসিক সাফল্য সম্বন্ধে যে সব কথা লিখেছে, উপরন্তু এই দুরন্ত অভিযানের যে কারণ ব্যক্ত করেছে, তাতে আর সকলকে দেখবেন কি—নিজের অবস্থাই এমনি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল যে, সামলাবার জন্যে দেহের সমস্ত শক্তি ও মনোবল প্রয়োগ করতে হলো। চিঠিখানার মাঝের কথাগুলি যেন তাঁর চোখের সামনে বায়স্কোপের একখানি ছবির রূপ ধরে অতিষ্ঠ করে তুলছিল তাঁকে। প্রথম যে দিন তিনি বাঁকিপুরে তাঁর দাদার আশ্রম বাড়ীতে সপরিবার উপস্থিত হন, সে সময় আশ্রমের কতকগুলি ছাত্রের সম্পর্কে তিনি অপ্রীতিকর ইঙ্গিত করলে তাঁর দাদা অধ্যাপক যদুপতি ছেলেগুলির পক্ষ সমর্থন করে দৃঢ়স্বরে তখন বলেছিলেন—'এরা শিক্ষায়, শৃঙ্খলা-রক্ষায়, পরিচালন-ক্ষমতায় যে ভাবে পাকাপোক্ত হয়েছে, তাতে প্রত্যেকেই এক একটা রাষ্ট্র চলাবার ক্ষমতা

রাখে এবং মনে করলে তোমার 'হোল সাবডিভিসানকে' অচল করে দিতে পারে—পুলিস-পাহারা কিম্বা ফৌজ-পল্টনের কোন পরোয়া না না করেই'! দাদা যদুপতির সেদিনের কথাগুলি জাহ্নবী ভুলেন নি—বুঝি কণ্ঠস্থ করেই রেখেছিলেন। কাজেই তাঁর সেদিনের সেই সব কথা সব্যসাচীর চিঠির কথাগুলির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে গেল। এ অবস্থায় জাহ্নবীর মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জে নূতন করে এই প্রশ্নই তালগোল পাকাতে লাগল যে, তাঁর দাদা যদুপতিও কি এই দুষ্কার্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, কিম্বা তাঁরই সেদিনের কথাটার সূত্র ধরে সব্যসাচীর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চলেছে? আজকের এই পত্রের কতিপয় ছত্রের সঙ্গে যদুপতির সেদিনের কথাগুলির এমন একটা সমন্বয় রয়েছে যে, এর পর সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধকে আর অস্বীকার করা চলে না। যদিও তিনি পাটনায় সরকারের নজরবন্দী হয়ে আছেন, তা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে সংগোপনে কোন রকমে তাঁর সংযোগ রয়েছে, নয়ত—তাদের সম্পর্কে গুরুর দম্ভোক্তিকে তারা বাস্তবে একটা রূপ দিয়ে গুরুর কাছে বাহোবা নিতে এভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে! এই চিন্তার ফলে অগ্রজের বিরুদ্ধেও তাঁর সমস্ত মনটি বিষিয়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে একটা প্রতিহিংসা স্পৃহাও নূতন প্রেরণা জাগাল। অন্যান্য পুলিস কর্মচারী ও সেই কুখ্যাত সপ্ত মহাজন বিপুল বিস্ময়ে নীরবে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন মাত্র—কারুর মুখে কথা নেই। বে-সরকারী মহাজনরাও এই চিঠির ব্যাপারে অবাক হয়ে গেছেন, তাঁরা এখনও ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। মাত্র মিনিট দুই এভাবে নীরব থাকার পরে জাহ্নবীই প্রথমে মুখ খুললেন। পাশাপাশি উপবিষ্ট সাতটি ব্যবসায়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন: চিঠিখানা সব শুনেও চুপ করে আছেন যে—পকেট খুঁজে দেখুন, সব্যসাচীর লাল পরোয়ানা সত্যিই সেঁধিয়েছে কি না!

এতক্ষণে যেন এই মাতব্বর মানুষগুলির হুঁস হলো, জাহ্নবীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা পকেটের মধ্যে হাত ঢোকালেন। আশ্চর্য, পরক্ষণেই সাতখানি হাত বেরিয়ে এলো এক একখানি রক্তবর্ণের রোকা নিয়ে। চিঠি গুলিতে একই রকমের বয়ান স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ :

পুলিশ সুপারের হুঁসিয়ারী ও সব্যসাচীর বাহাদুরী। নিদর্শন নম্বর ছয় থেকে বারো। বন্দেমাতরম্! সব্যসাচী।

জাহ্নবী ও অন্যান্য পুলিস কর্মচারীরা প্রত্যেকেই চিঠিগুলি পরীক্ষা করলেন এবং আজ সকলকেই স্বীকার করতে হলো যে, সত্যই ব্যাপারটি যেন ইন্দ্রজালের মত! এর পর জাহ্নবী লালা মদনলালের কথা জিজ্ঞাসা করেও জানলেন যে, যৌথভাবে ঐ টাকা তাকে দিয়ে মাল গস্ত করতে পাঠাবার কথাও হুবহু সত্য।

এমনি সময় টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং……

জাহ্নবী ফোন ধরেই আলিজানকে ডেকে বললেন : ধরুন, আপনাকে চায়। আলিজান এতক্ষণ কক্ষমধ্যে ঠিক যেন ষ্ট্যাচুর মত অসাড়ভাবে বসেছিলেন ; একমাত্র এই মানুষটির মুখে বিস্ময়, আতঙ্ক বা বিরক্তির কোনরকম রেখাই পড়েনি। ফোনে তাঁকে ডাকছে শুনেই আলিজান ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এসে রিসিভার ধরলেন এবং সাড়া দিয়ে আহ্বানকারীর কথা নীরবে শুনতে লাগলেন।

জাহ্নবী জানতেন, তাঁর অনুগৃহীত মহাজনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আলিজান নিয়েছেন এবং আলিজানের এলাকাতেই এঁদের মালপত্রের আড়ত অবস্থিত। তাঁর মনে দুশ্চিন্তা এলো—এও সব্যসাচীর কাণ্ড নয় ত! উদ্বিগ্নভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন ফোনের রিসিভারটির দিকে—নূতন কি বার্তা আসে জানবার অভিপ্রায়ে। আলিজান যে একটা দুঃসংবাদ পেয়েছেন এবং সেটা অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাঁর অসংলগ্ন প্রশ্ন

থেকেই তার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। মহাজনরাও ভাবছিল, বুঝি কপাল তাদের সত্যিই ভেঙেছে। কেননা, আলিজানের মুখে লালা মদনলাল আর টাকার কথা শোনা গেছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে আলিজান বললেন : আমার থানায় খবর এসেছে, লালা মদনলালের তহবিল লুঠ হয়ে গেছে। ডাকুরা তাকে একখানা লাল রোকা দিয়েছে থানায় দাখিল করবার জন্যে। সে সুলতানগঞ্জে যাচ্ছিল মাল গস্ত করতে এঁদের তরফ থেকে। লালাজীর তবিয়ত ভাল নেই বলে শুধু খবরটা থানায় জানিয়েছে লোক দিয়ে, কাল সকালে নিজে এসে এজেহার দেবে, রোকাও দাখিল করবে।

এ খবর শুনে সপ্ত ব্যাপারীই একবারে ভেঙে পড়ল; আর্তস্বরে তারা আফশোস করতে লাগল যে, আগে থাকতে এমন করে হুঁসিয়ার হয়েও তারা ইজ্জত দৌলত কিছুই রক্ষা করতে পারল না, ডাকু যা লিখল তাই করল! এর ওপর মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করবার কথাও যা লিখেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেককে লোটা কম্বল নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে।

জাহ্নবী কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠতে তাড়াতাড়ি সে দিকেই মনোযোগ দিলেন। কিন্তু রিসিভার কানে লাগিয়ে 'হ্যাল্লো' বলে সম্ভাষণ করতেই আহ্বানকারীর নাম ও স্বর তাঁকে শুধু স্তব্ধ নয়, সেই সঙ্গে আতঙ্কে অভিভূত করে দিল। এমন অসময়ে একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে যে স্যার শঙ্করলাল তাঁকে পাটনা থেকে সহসা ফোনে আহ্বান করবেন, তিনি সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি।

শুষ্কস্বরে শুভরাত্রি জানিয়ে জাহ্নবী স্যার শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিলেন হ্যাঁ—স্যার, আমিই জাহ্নবী।

স্যার শঙ্কর প্রশ্ন করলেন : মিটিংএ কি সাব্যস্ত হলো ?

প্রশ্ন শুনে জাহ্নবী অবাক হয়ে গেলেন—এই মিটিংএর খবরও স্যার শঙ্করের কানে গিয়ে পৌঁছেছে ! তাহলে কি—

স্যার শঙ্কর জাহ্নবীকে নীরব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : ভাবছ বোধহয় ওখানকার মিটিংএর খবর কি করে পেলাম ? হাঃ হাঃ হাঃ...

স্যার শঙ্করের ক্রূঢ় হাস্যধ্বনি জাহ্নবীর কানে যেন স্ক্রুর মতন বিঁধে পাক দিতে লাগল ! হাসির পরেই নূতন বাণী শোনা গেল : সব্যসাচীর লাল চিঠি আর সেই সঙ্গে একখানা চিঠির প্রতিলিপি কিছু আগে পেয়েছি। লাল চিঠিতে পুলিস-সুপারের হুঁসিয়ারীর উপরে সব্যসাচীর আরো সাত দফা বাহাদুরীর আইটেম আছে। প্রতিলিপিখানা হচ্ছে তোমার সহকারী সুদর্শনকে লেখা চিঠির অবিকল নকল।

জাহ্নবীর কণ্ঠ থেকে যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই কয়টি কথা বেরিয়ে গেল প্রশ্নের আকারে : ওখানেও পাঠিয়েছে ?

উত্তর দিলেন স্যার শঙ্কর : হ্যাঁ হে ! কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, আমাদের সেরেস্তার গোপনীয় খবর এত তাড়াতাড়ি ঐ লোকটার কাছে গেল কি করে ? আগের চিঠিতে যে-কটা ব্যাপারীর নামে ওর নালিশ ছিল, তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্যে সরকার থেকে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছিল তা বোধহয় তোমাকে বলা হয়নি। কিন্তু শুনে অবাক হবে, কিছুই সে বাড়িয়ে লেখেনি—সব মিলে গেছে। কাজেই এখন ঐ সপ্তরথীর আড়তগুলির দিকে সরকারের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে। একদল গুর্খা পাঠানো হয়েছে উওগুলোর উপরে পাহারা দেবার জন্যে। এতক্ষণে তারা রোহিণীতে গিয়ে পৌঁচেছে। তুমি ঐ সপ্তরথীকে বলে দাও, কেউ যেন আড়তে ঢোকবার চেষ্টা না করে এবং চাবিগুলি তোমার হাতে তুলে দেয়। ঐ গুর্খাদের যিনি অফিসার হয়ে যাচ্ছেন—চাবিগুলি তাঁর হাতে

দিয়ে তুমিও নিশ্চিন্ত হবে। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম—আর কিছু উপস্থিত বলবার নেই।

জাহ্নবী বুঝলেন, স্যার শঙ্কর ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তখন এতই বিহ্বল ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে, হাতের রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখবার শক্তিও বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর বিবর্ণ মুখ, উদাস দৃষ্টি ও পাথরের মত স্থির মূর্তি দেখে সবাই শিউরে উঠল ভয়ে। সুদর্শন তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর হাত থেকে রিসিভারটি নিয়ে আধারে রেখে দিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকল: দাদাবাবু।

একটি বার সুদর্শনের মুখের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে সেই অমিত-প্রতাপশালী মহাদাম্ভিক পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্র সামনের টেবিলের উপর সশব্দে ঝুঁকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন তাঁকে ধরে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল: বেহারা, পানি লে আও—জলদি।

৩৫

দুঃসংবাদের উপর এই দুর্ঘটনায় সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বৈঠক বন্ধ করে পুলিস-সুপারকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ ফোন করে সিভিল সার্জনকে আহ্বান করা হলো। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বাংলোতেই ছিলেন এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন। জাহ্নবীকে ইতিমধ্যে ধরাধরি করে তাঁর খাস কামরায় একখানা সোফার উপরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সিভিল সার্জন পরীক্ষা করে বললেন: ব্রেইনে হঠাৎ একটা শক্ লেগে এ-রকম হয়েছে,

ভয়ের কিছু নেই, ঘণ্টা খানেক মাথায় আইস-ব্যাগ ঠিক মত দিলেই সামলে উঠবেন। ওষুধ খাবার প্রয়োজন হবে না।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে থানা অফিসার ও ব্যবসায়ীরা ছোট সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। সুদর্শন বলল: ফোনে তাঁদের খবর দেওয়া হবে। অফিসারগণ বললেন যে, তাঁরাই সকালে খবর নেবেন—একটা মস্ত উদ্বেগ নিয়েই তাঁদের যখন বিদায় নিতে হচ্ছে।

সিভিল সার্জনের কথাই ফলে গেলো—এক ঘণ্টার কিছু আগেই জাহ্নবী সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। সুদর্শন তাঁর পাশে একখানা চৌকিতে বসে মাথায় আইস্-ব্যাগ লাগাচ্ছিল; দু-তিনজন কনেষ্টবল সশব্যস্ত হয়ে তাকে সাহায্য করছিল। সিভিল সার্জনের কাছে আশ্বাস পাওয়ায় বাংলোয় জাহ্নবীর অসুস্থতার কথা জানানো হয়নি। জাহ্নবীকে উঠে বসতে দেখে সুদর্শন বাধা দিয়ে বলে উঠল: এখনি উঠবেন না দাদাবাবু, এখনো এক ঘণ্টা হয়নি।

জাহ্নবী বললেন: আর দরকার নেই, আমি সেরে উঠেছি। ওঁরা কি সবাই চলে গেছেন নাকি?

সুদর্শন জানালো: হ্যাঁ, এ অবস্থায় আর আটকে রেখে কি হতো বলুন? কাল সকালে ওঁরা সব খবর নেবেন বলে গেছেন।

শুশ্রূষাকারী কনেষ্টবলদের সরিয়ে দিয়ে জাহ্নবী বললেন: বুঝতে পেরেছ আমার মনের অবস্থা? আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে কি ভাবে সবার সামনে অপদস্থ করে দিলে! স্যার শঙ্করলালের কাছেও ব্যাপারটা জানিয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, নিজেদের সাফল্য সম্বন্ধে ঐ দল এতই নিশ্চিৎ ছিল যে, মামলা চালাবার আগেই সাফল্যের কথাটা জাঁক করে জানিয়ে দিয়েছে। তাহলে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, এদের

লোকও আমাদের মধ্যেই আছে। নৈলে কি করে তোমার ফাইলের মধ্যে ঐ চিঠি এলো, আর ব্যাপারীদের পকেট থেকেও ওভাবে চিঠি বেরুল!

সুদর্শন ভাঙ্গা গলায় বলল: আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এমন কেউ খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সঙ্গে আছে—আমরা যাকে কিছুতেই সন্দেহ করি না, সেও নিঃসন্দেহে আর নিরুদ্বেগেই তার কাজ হাসিল করে চলেছে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় দাদাবাবু, আপনার ঐ বোবা চাকর বিচ্ছুকে।

জাহ্নবী বললেন: কিন্তু আজকের ব্যাপারে কি করে ওকে সন্দেহ করতে পারা যায়—এর ত্রিসীমানায়ও সে যখন আসেনি? কি করে তোমার ফাইলে সব্যসাচীর চিঠি এসে সেঁধুল? তারপর সাত সাতটা সজাগ মানুষের পকেট থেকেই বা কি করে এক একখানা চিঠি বেরুল, বল? সন্দেহ করতে হোলে থানা অফিসারদের ওপরেই আগে নজর পড়ে—তাদের পক্ষে তোমার ফাইলে কোন এক ফুরসদে চিঠিখানা ঢুকিয়ে দেওয়া খুব কঠিন হোলেও অসম্ভব নয়; ব্যাপারীদের ব্যাপারেও সম্ভব হতে হয়ত পারে—যদিও তাতে রীতিমত হাত সাফাই দরকার, ঠিক ম্যাজিসিয়ানদের মত!

সুদর্শন বলল: তাহলে ত প্রত্যেক অফিসারকেই সন্দেহ করতে হয়! কিন্তু দাদাবাবু, এ সব ব্যাপারে কোন পুলিস অফিসার ট্রেচারী করেছেন এমন কোন (bad example) ব্যাড্ একজ্যাম্পল আমার জানা নেই।

জাহ্নবী বললেন: কিন্তু বোঝ, আজকের ব্যাপারটা যে রকম, ক্লাইম্যাক্সে (Climax) উঠেছে, তাতে সে যেই হোক—ধরা তাকে পড়তেই হবে। আর, আমিও বলছি—সব্যসাচীকে ঘায়েল করবার শেষ মোক্ষম অস্ত্র এবার আমাকে ব্যবহার করতেই হবে।

সুদর্শন নীরবে জাহ্নবীর সঙ্কল্পদৃঢ় মুখখানির দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল—সেই মোক্ষম অস্ত্রটি কি? কিন্তু জাহ্নবী এ প্রসঙ্গটি একবারে পরিত্যাগ করে সহসা ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেন: মিশিরকে ডাক সুদর্শন, আমি বাংলোয় যাবো।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সুদর্শন বলল: এখন কি যেতে পারবেন?

জাহ্নবী বললেন: খুব পারবো। যেমন আমি মুষড়ে পড়েছিলাম, ঐ প্ল্যানটা এই মাত্র মনে হোতেই একটা প্রবল উদ্যম জেগেছে। মিশিরকে তুমি ডাক ত; সে আর তেওয়ারী দুজনে মিলে ঠিক আমাকে গাড়ীতে তুলে দেবে, তারপর এরাই সঙ্গে গিয়ে নামিয়ে একবারে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবে।

সুদর্শন তৎক্ষণাৎ আরদালীকে ডাকবার উদ্দেশে কলিং বেলটি ঘুরিয়ে দিল।

দুই দিনের মধ্যেই জাহ্নবী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই ক'দিন তিনি আর বাংলো থেকে বাহির না হোয়ে—শয্যাশায়ী অবস্থায় প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করেছেন। স্যার শঙ্করলাল ফোনে যে সব কথা বলেছিলেন, প্রত্যেকটিই অপ্রিয় বাস্তবরূপে জাহ্নবীর অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠাকে যেন ব্যঙ্গ করেছে। তাঁর অনুগৃহীত ব্যবসায়ীদের যৌথ আড়তগুলির উপরে বিহার গভর্ণমেণ্টের একদল মিলিটারী পুলিসের পাহারা বসেছে এবং সেই গুর্খা রেজিমেণ্টের অফিসার পুলিসের সাহায্যে কর্তৃপক্ষের পুনরাদেশ না আসা পর্য্যন্ত আড়তগুলি শীল করেছেন। শয্যাশায়ী অবস্থাতেই জাহ্নবীকেই রোহিণী থানায় অস্থায়ী অফিসার আলিজানের উপরে যথোচিত ব্যবস্থার ভার দিতে হয়েছে। এই ব্যাপারে সারা অঞ্চলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। জাহ্নবীর কর্মজীবনে এত বড় বিপর্য্যয় এর আগে আর কোনদিন দেখা দেয়নি—এমন ব্যর্থতার সঙ্গে

পরিচয়ও বুঝি আর ঘটেনি। শয্যাশায়ী অবস্থায় ভাবতে থাকেন—কি কুক্ষণেই তিনি 'পুলিস অফিসারস্ কনফারেন্সে' যোগ দেবার জন্যে পাটনায় গিয়েছিলেন! অমনি তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠল যেন ওয়েটিং রুমের সেই অপ্রীতিকর দৃশ্য—সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে সেখানকার ঘটনাগুলিও সুস্পষ্ট হয়ে তাঁকে যেন অতিষ্ঠ করে তুলল। অস্থিরভাবে তিনি শয্যার উপরে উঠে বস্‌লেন, তাঁর মুখে চোখে উত্তেজনার হিংস্র আভা জ্বল জ্বল করে উঠল।

সুহাসিনী শয্যার পাশে একখানি আসনে বসে ছিলেন, তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হলো আবার—অমন করে ধড়মড় করে উঠে বসলে যে?

জাহ্নবী দ্বারের দিকে চেয়েই পরক্ষণে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুহাসিনীর মুখে নিবদ্ধ করে বললেন: দুর্গা কোথায়?

সুহাসিনী বললেন: হঠাৎ তাকে মনে পড়ল কেন? সে তার ঘরেই আছে বোধহয়,—পড়ছে, কিম্বা লিখছে। তার আর কাজ কি বল না!

এখন তার মনোভাবটা কি রকম—লক্ষ্য করেছ?

ক্ষেপেছ! আমি ডিটেকটিভ নাকি, যে মনোভাব লক্ষ্য করে বেড়াব?

ক্ষুব্ধ দৃষ্টি স্ত্রীর মুখে ক্ষণকাল নিবদ্ধ করে জাহ্নবী বললেন: দেখছ ত আমি আজ কি অবস্থায় পড়েছি—কিন্তু এর গোড়ায় ঐ মেয়েটা। আমার মনে হয়, সব্যসাচীর ব্যাপারটা ও সব জানে। আর আমাদের ভিতরেই এমন কোন লোক আছে, যাকে ও হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছে। আমাকে আর সুদর্শনকে অপদস্থ করাই হচ্ছে ওর আসল মতলব।

সুহাসিনী মৃদুস্বরে বললেন : এ তোমার অনুমান ছাড়া কিছু নয়। আমি ত এমন কোন বেচাল ওর দেখেনি, যাতে কোন দিক দিয়ে ওকে সন্দেহ করা যায়।

জাহ্নবী বললেন : ওর অজ্ঞাতে ওর সব জিনিসপত্র আমি সার্চ করতে চাই।

সুহাসিনী দৃঢ়স্বরে বললেন : না। এ কাজ আমি করতে দেব না। তা ছাড়া, এক ফোঁটা একটা মেয়ে—সর্বক্ষণ বাড়ীতে যে নজরবন্দিনী, তার ওপরে এরকম সন্দেহ করাই তোমাদের মস্ত অন্যায়! অথচ, এই মেয়েকেই চুপি চুপি বিয়ের বাঁধন পরাবে বলে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছ। যদি তাই কর, পরে কি করে ওর কাছে মুখ দেখাবে? সুদর্শনকে কোনদিন ও কি তাহলে ভালোবাসতে পারবে?

জাহ্নবীর মনের উত্তেজনার উপরে এই সময় ঝাঁ করে যেন পরিকল্পনার আর একটা নূতন হিল্লোল বহে গেল। তিনি ধীরে ধীরে মাথাটি দুলিয়ে বললেন : ঠিক সময়েই কথাটা তুমি মনে করিয়ে দিলে; ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। চুলোয় যাকগে, বাঘিনীকে না খুঁচিয়ে পিঁজরেয় পুরে ফেলাই সঙ্গত। দুরন্ত মেয়েকে জব্দ করতে এমন শক্ত বাঁধন আর নেই! সাত দিনের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে ফেলছি। কিন্তু খুব সাবধান, খবরটা বাইরে জানাজানি হয়ত হবে, আর সেটা ইচ্ছা করেই করতে হবে, কিন্তু বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত বাংলোর আর কেউ জানবে না—তুমি, আমি ও সুদর্শন ছাড়া।

হঠাৎ বাহিরে একটা খস খস শব্দ শুনে জাহ্নবী চমকে উঠে বললেন : বাইরে কে দেখ ত?

নিজেকে সামলে নিয়ে সুহাসিনী তাড়াতাড়ি উঠেই দরজার উপরে টাঙানো পরদা ঠেলে বাহিরে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, পোষা খরগোস

দুটো খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে দরজার সামনে দড়ির পাপোষটার উপরে খেলা করছে। সুহাসিনী বললেন: অ মা, দেখ কাণ্ড! ওরে বিচ্ছ্ কোন চুলোয় গেলি, খরগোস দুটো খাঁচা খুলে পালিয়ে এসেছে, তার হুঁস নেই! আ মরণ!

সে দিনের ঘটনার পর সুদর্শন খুব সন্তর্পণেই যেন দুর্গাকে এড়িয়ে চলছিল। এ পর্যন্ত বরাবরই ড্রয়িং রুমে সাধারণতঃ এক সঙ্গে গল্প গুজবের মধ্যে এঁদের প্রাতরাশ চলে আসছিল। কিন্তু জাহ্নবীর অসুস্থতার দরুণ বাংলোর ভিতরে, শয়নকক্ষেই ইদানীং তাঁর প্রাতরাশের আহার্য যায়। সুদর্শনও টেবিলে আসে না, তার ঘরে চা জলখাবার পৌঁছে দেবার জন্যে বেয়ারা নির্দেশ পেয়েছে। টেবিলে পরিবেষন করতে হোত দুর্গাকে। দুর্গা এখন বুঝেছে, এমন একটা কিছু হয়েছে যার জন্যে জাহ্নবী ও সুদর্শন তাকে সহ্য করতে পারছে না—দুর্গার দৃষ্টির বাহিরেই তারা থাকা পছন্দ করছেন। সে রাতে থানায় যে ঘটনা ঘটেছিল, তার স্রোত বাংলোয় জাহ্নবীর শয়ন কক্ষে পর্যন্ত গড়িয়ে এলেও যদিও সে প্রসঙ্গ দুর্গার কাছে এ পর্যন্ত চেপে রাখা হয়েছে, কিন্তু যে কোন প্রকারেই হোক, দুর্গা তার আগাগোড়া সবই শুনেছে। এখন দুই বুদ্ধিমানের কাণ্ড দেখে মনে মনে সে হাসে। তলে তলে এঁরা যে তাকে নিয়েই এমন একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছেন—যেটা প্রীতিকর ত নয়ই এবং এতই অশোভন যে কাজটি সমাধা না হওয়া পর্যন্ত অন্তরালে না থেকে উপায় নেই। কাজেই দুর্গা তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সেই প্রচ্ছন্ন রহস্যটির সন্ধান করতে কৌতুহলী হয়ে উঠল।

এইভাবে আরও সাতটি দিন অতিবাহিত হলো। এই সাতদিনের মধ্যে অসুস্থতার ভাণ করে বাংলোর বাসায় বসে বসে জাহ্নবী এমন এক দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলেন, সত্যই যা বিস্ময়াবহ। পক্ষান্তরে, দুর্গাও

এ সময় গায়ে পড়ে অসম সাহসে এমন একটা কাজে নেমে পড়ল—বাঙালী পরিবারে কোন কুমারী কন্যার পক্ষেও যা কল্পনাতীত ব্যাপার!

সেদিন সুদর্শন প্রাতরাশের পর সেজেগুজে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় দুর্গা তার ঘরে প্রবেশ করল। চোখাচোখি হতেই সুদর্শন লক্ষ্য করল, দুর্গার মুখখানা হাসিতে ভরে আছে, আর সে হাসির রূপও তার অপরিচিত নয়।

দুর্গাই প্রথমে কথা বলল। সুধালো: কি ব্যাপার বলুন ত—ক'দিন ধরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

প্রায় থতমত হয়ে এবং পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সুদর্শন কথাটার জবাব দিল: লুকিয়ে বেড়াব কেন? বাড়ীতেই ত আছি।

মুখ টিপে হেসে দুর্গা বলল: তা আছেন বৈকি, নৈলে নালিশ নিয়ে আসি? কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কারণটি কি বলুন ত? চা খেতে টেবিলে যান না, ডেকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না; অথচ, আমি সঙ্গে না গেলে বিকেলে আপনার বেড়ানোই হোত না। হয়েছে কি আপনার?

আড়চোখে একবার দুর্গার মুখখানা দেখে নিয়েই সুদর্শন একটু উদাস ভাবেই বলল: হবে আবার কি? তবে কাজের প্রেসারে নিয়মটার ব্যতিক্রম যে হয়েছে সেটা ঠিক।

মুখে বিস্ময়ের একটু রেখা ফুটিয়ে দুর্গা বলে উঠল: অ-মা, তাই নাকি! তবে নাকি মিষ্টার সব্যসাচী আপনাদের কাজের প্রেসার কমিয়ে দিয়ে রক্তের প্রেসারটা বাড়িয়ে দিয়েছেন শুনছিলাম?

আগুনে যেন সহসা ঘৃত সংযোগ হলো; চোখ দুটি পাকিয়ে প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুদর্শন বলল: এই জন্যই নিয়ম ভাঙতে হয়েছে বুঝলে? তোমার এই হাড়জ্বালানো কথার জন্যে!

সহজ ভাবেই সরল ভঙ্গিতে দুর্গা বলল : তাই বলে সত্যকে চেপে রাখবেন ? আপনি ঘরে বসে থেকে এবং মুখে ছিপি এঁটে রাখলেই বুঝি আসল কথা চাপা থাকবে ?

দৃঢ়স্বরে সুদর্শন বলল : তুমি কি বলছ ?

সংযত কণ্ঠে দুর্গা উত্তর দিল : সোজা এবং সত্য কথা। সব্যসাচী আপনাকে যে হুঁসিয়ারীর নোটিস দিয়েছিল, আপনি সেটা গ্রাহ্য না করলেও, তিনি তাঁর ডিগ্রী ঠিক ভাবে জারি করেছেন। কিন্তু তার জন্যে নিজের মুখ লুকিয়ে লাভ কিছু আছে ? আপনার জন্যে আমার সত্যই দুঃখ হয়।

শেষের কথাটা বলেই দুর্গা তার মুখে ও চোখে সহানুভূতির ভঙ্গিটি গভীর ভাবে ফুটিয়ে সুদর্শনের দিকে ভাবাদ্র দৃষ্টিতে তাকাল। সে দৃষ্টি এমনি মর্ম্মস্পর্শী যে মনের বিরাগ সত্ত্বেও সুদর্শন অভিভূত না হয়ে পারল না। সুদর্শনকে তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই দুর্গা সে দৃষ্টি আরও কোমল করে পুনরায় বলল : সত্যিই আপনার ব্যথা আমি অন্তর দিয়ে বুঝেছি সুদর্শনবাবু! আপনার হাতের ফাইল থেকেই তাঁর চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল ! আবার এমনি তাজ্জব কাণ্ড যে, ব্যাপারী-দের পকেটগুলোতেও এক একখানা চিঠি লুকিয়েছিল ! তাহলে ঐ লোকটাকে কি বলে তারিফ করতে হয় বলুন ত? কাণ্ডটা ঠিক ম্যাজিকের মতই করেনি লোকটা ?

দুর্গার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে সুদর্শন এখন জিজ্ঞাসা করল : এসব খবর তুমি পেলে কি করে ? তোমার ত জানবার কথা নয় দুর্গা দেবী ?

দুর্গা এবার খিল খিল করে হেসে উঠে হাসির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল : আমি হচ্ছি পুলিস-সুপারের ভাইঝি সুদর্শনবাবু! বাতাস আমার কানে সব কথা বলে যায় যে, তা বুঝি জানেন না ? .

মুখখানা শক্ত করে সুদর্শন বলল : ঠাট্টা নয় দুর্গা দেবী, হেসো না। শোন, আমাদের পক্ষ থেকে এ খবর বাড়ীতে প্রচারিত হয়নি। তা সত্ত্বেও তুমি যখন জেনেছ, তখন আমাকে বুঝতে হবে, হয় তুমি চোরের মতন চুরি করে তোমার কাকাবাবুর ঘর থেকে খবর অপহরণ করছ, নয় ত—

সুদর্শনকে থামতে দেখে তেমনি হাসতে হাসতে ফেটে পড়বার মত হয়ে দুর্গা ঝাঁ করে বলে ফেলল : সব্যসাচী নিজেই আমাকে খবরটা পরিবেষণ করে গেছেন—এই ত? কিন্তু এটাও কি এমন বিস্ময়াবহ ব্যাপার সুদর্শনবাবু? সব্যসাচী যদি তাঁর বাহাদুরির প্রচার করতে 'তোল মাটি ঘোল' করতে পারেন, মহাজাতি সংঘের এক সেবিকার কাছেও কি খবর পাঠাতে পারেন না সে? তাহলে বলি শুনুন—তাঁর পরোয়ানা আমিও পেয়ে থাকি, আর সেটা পাই সবার আগে। আরো এক তাজ্জব কথা বলি শুনুন; সব্যসাচীর এর পরের পরোয়ানা—সম্ভবত সেইটিই শেষ—আপনাদের ওপরে এখনো যেটা জারি হয়নি, তাও আমি পেয়েছি।

অতি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সুদর্শন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে চেয়ে রইল দুর্গার মুখের দিকে; সে বুঝি অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত মেয়েটির মুখের রেখাগুলি পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে মনে মনে কি ভেবে আস্তে আস্তে সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল : সে পরোয়ানা আমাকে দেখাতে পারো? সে সাহস তোমার আছে?

মৃদু হেসে দুর্গা বলল : সাহস করে একজন যদি তাঁর অভিপ্রায় জানাতে পারেন, সেটা লুকিয়ে রাখবার মত দুর্বলতা আমারই বা কেন থাকবে বলুন?

সোজা হয়ে বসে সুদর্শন বলল : বেশ, তাহলে দেখাও সে পরোয়ানা। আমি এর জন্য তোমাকে বহুৎ ধন্যবাদ দেব।

সহাস্যে দুর্গা বলল: শুধু আমাকেই দেবেন ধন্যবাদ—সব্যসাচীকে নয়?

গম্ভীর হয়ে সুদর্শন বলল: ঠাট্টা নয় দুর্গাদেবী, তোমার কথা রাখো।

দুর্গাও সহসা মুখখানা গম্ভীর করে বলল: আমার কথা মিথ্যা হয় না সুদর্শনবাবু! তবে এখুনি নয়, আর এখানেও নয়। বিকেলে ঠিক পাঁচটার সময় মোটর নিয়ে আসবেন। আপনিই মোটর চালাবেন—আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ সে মোটরে থাকবে না কিন্তু! তখন লম্বা পাড়ি দিতে দিতেই পরোয়ানার কথা সব বলব আপনাকে।

প্রস্তাবটা সুদর্শনকে উল্লসিত করল; তথাপি শুধাল: বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে একলা যেতে সাহস করবে ত? না, বিচ্চু ও সঙ্গে থাকবে?

মুখের হাসিটুকু সহসা প্রখর করে সুদর্শনের দুই চোখ ভরিয়ে দিয়ে দুর্গা বলল: সব্যসাচীর পরোয়ানা নিয়ে যখন যাবো আপনার সঙ্গে, ধন্যবাদের আশাও যখন দিয়েছেন, তখন কোনমুখে অবিশ্বাস করব বলুন? তাই বিচ্চুকেও সঙ্গে নেব না। শুধু আপনি আর আমি।

এরপর দুর্গা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে—সকাল থেকে সারা দিনই বাংলোর মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, অথচ তারই ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে ও সতর্কতার সংগে কোন একটা বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন পর্ব যেন চলেছে। একটা কিছু অভাবনীয় ব্যাপার যে ঘটবে এবং সেটা যে তাকেই কেন্দ্র করে আগে থেকেই পরিকল্পিত হয়েছে—তার আভাসও সে পেয়েছে এবং সে জন্য তাকেও সব দিকে দৃষ্টি রেখে "শঠে শাঠ্যং" নীতিতে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়েছে বৈকি! ব্যাপারটা এতই ভীতিপ্রদ, বিপজ্জনক ও ভয়ানক যে, আভাস একটু পেলেই অতি বড়

সাহসী পুরুষেরও হৃদ্‌কম্প হবার কথা, আর সাধারণ নারী হলে ত তার কথাই নেই—ঠাকুরের উদ্দেশে পাথরের মেঝের উপরে ঢিপ ঢিপ করে কপাল ঠুকে নিষ্কৃতির জন্যে মিনতি করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে এ রকম অসহায় অবস্থায়? কিন্তু জ্ঞানোদয় ও অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাতি সংঘের আশ্চর্য রকমের শিক্ষা এ-সব ব্যাপারেও দুর্গার মত মেয়েদের চোখের সামনে রীতিমতভাবেই আলোকপাত করেছে এবং সেই আলোকে তারা অসীম মনোবল সঞ্চয় করে মুক্তি পথের সন্ধানেও নিরস্ত নয়!

দুর্গা লক্ষ্য করল, এদিনের প্রাতরাশের ব্যবস্থাই হয়েছে অন্যরূপ—ডিম টোষ্ট সালাড প্রভৃতির কোন পাটই নেই। সুহাসিনী নিজেই ডিসে করে প্রত্যেককে সন্দেশ পরিবেশন করলেন। বললেন, দিনের বেলাটা আজ শুদ্ধভাবে সবাইকে থাকতে হবে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও সেইভাবে হবে—দুধ ছানা মিষ্টি ও ফল ছাড়া কোন অশুদ্ধ বা গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পরে পূজা পাঠ হবে, পুরোহিত আসবেন—বাইরের লোকজনও আসবে। রাতে ঘটা করে একত্র খাওয়া দাওয়া হবে। দুর্গা লক্ষ্য করল, সুদর্শনের ঘরেও এইভাবে বিশুদ্ধ প্রাতরাশ গেল। চা অবশ্য এখানে নিষিদ্ধ নয়, চা পান বারণ ছিল না, সুতরাং অন্যান্য দিনের মত দুর্গাকেই চা তৈরী ও পরিবেশণ করিতে হলো। হলঘরের প্রাতরাশ শেষ হলে, দুর্গা এক ফাঁকে সুহাসিনীর অজ্ঞাতে চুপি চুপি সুদর্শনের ঘরে যায় এবং সেখানে গিয়েই সুদর্শনকে চমৎকৃত করে যে সব কথা বলে, তাতে সুদর্শনের মাথা ঘুরে যায়। সেই কথা প্রসঙ্গে দুর্গা অসংকোচেই বলে ফেলে যে, সব্যসাচীর শেষ পরওয়ানা জারি হয়ে গেছে এবং অন্যান্য বারের মত তার কাছে আগেই এক খণ্ড এসে গেছে। কথাটা শুনেই সুদর্শন চমকে উঠে ভাবে, দুর্গার কাছে আগেই এক খণ্ড এসে গেছে?

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পরোয়ানা খানা দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, দুর্গা মুখখানা গম্ভীর করে বলে: এখুনি নয়, আর এখানেও নয়। বিকেলে ঠিক পাঁচটার সময় মোটর নিয়ে আসবেন। আপনি মোটর চালাবেন—আপনি আর আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না সে মোটরে। খানিকটা লম্বা পাড়ি দিতে দিতেই পরোয়ানার কথা সব বলব আপনাকে।

প্রস্তাবটি শুনেই সুদর্শন উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং সে দিনের গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে বিকেলের দিকে সময় করে নিয়ে পাঁচ চেম্বারের একটা শক্তিশালী আধুনিক রিভলভার সম্বল করে পুলিস ইউনিফরমে সজ্জিত হয়ে দুর্গাকে জানাল: গাড়ী নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছি, বেরিয়ে পড়।

জাহ্নবীও এই সুযোগটির প্রতীক্ষা করছিলেন। নিজে থেকেই সুদর্শনকে এদিন অপরাহ্নে দুর্গাকে নিয়ে বাহিরে বেরুবার প্রস্তাব করতে হয়নি; তিনিই সুদর্শনকে ডেকে এই মর্মে এক নির্দেশ দিলেন যে, দুর্গাকে অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বাংলোর বাহিরে বেড়াবার ছলে নিয়ে যাওয়া চাইই। সেই ফাঁকে তার অসাক্ষাতে প্রাসঙ্গিক আয়োজন ও বিধি ব্যবস্থাগুলো সেরে ফেলতে হবে। সুদর্শন বুঝল যে, ভাগ্যদেবতা সব দিক দিয়েই আজ তার অনুকূল—তাই না, দাদাবাবুর কাছে কুণ্ঠিত-ভাবে যে প্রস্তাবটি তোলবার সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল সে, তিনি নিজেই সে প্রস্তাব তুলে তার পথ খুলে দিলেন! এদিকে জাহ্নবীও স্থির করে রেখেছিলেন, দুর্গা খানিকক্ষণের জন্যে বাহিরে গেলেই, তাঁর সঙ্কল্প ও সিদ্ধান্ত মত ব্যবস্থাগুলি সেই ফুরসদে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে ফেলবেন। এ পর্যন্ত খুব সন্তর্পণে রেখে-ঢেকেই দুর্গার সঙ্গে যেভাবে কপট ব্যবহার করা হচ্ছে, সন্ধ্যার পর দুর্গা ফিরে এলেই বাহ্যিক কাপট্যের সে আবরণটি

সরিয়ে দিয়ে কঠোরভাবে যখন সত্য প্রকাশ করা হবে, তৎকালে বাংলোর রূপ একেবারে বদলে গেছে, পরিচিত নরনারীদের সমাগমে বিবাহ-বাড়ী জম জম করছে, সমগ্র সহরবাসী জ্ঞাত হয়ে গেছে যে, পুলিস-সুপারের ভ্রাতুষ্পুত্রী দুর্গাদেবীর শুভ পরিণয়োৎসব হঠাৎ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ তাঁরই সহকারী সুদর্শনবাবুর সঙ্গে!

৩৬

নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গা তৈরী হয়েই সুদর্শনের আহ্বানের প্রতীক্ষা করছিল। সে স্থানে, তাকে আজ একাকিনীই যেতে হবে সুদর্শনের সঙ্গে একই মোটরে এবং তার পাড়িও হবে অনেকখানি দীর্ঘ। কথাও হয়েছে—সে ও সুদর্শন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি মোটরে থাকবে না। কাজেই সুদর্শন নিজেই মোটর চালাবে, আর প্রস্তাবটির দিকে চেয়ে বিচ্চুকেও রেখে যেতে হবে—সঙ্গে নেবার উপায় নেই। সেই কথাই এতক্ষণ বিচ্চুর সঙ্গে হচ্ছিল। চারিদিকে সতর্ক চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ পাহারা রেখে কত কথাই বলছিল বিচ্চু—কত খবরই দিচ্ছিল দুর্গাকে। শুনতে শুনতে দুর্গার সুন্দর মুখখানা এক একবার কালো মূর্তি ধরছিল, আবার খানিক পরে আরও কিছু শুনে উদ্দীপনায় আরক্ত হয়ে উঠছিল। শেষে মনে মনে কি ভেবে বিচ্চুকে আরো কাছে ডেকে তার কানে কানে চুপি চুপি কতকগুলো কথা বলল, সেগুলি শুনতে শুনতে বিচ্চুর নিকশ কালো মুখখানার ভিতর দিয়েও যেন একটা অপরূপ আভা ফুটে বেরুল! এমনি সময় এল সুদর্শনের আহ্বান। ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়ে সে বলল: পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি দুর্গাদেবী, আমি তৈরী হয়েই এসেছি।

ঘরের ভিতর থেকেই দুর্গা বলল: আমিও তৈরী—আপনি মোটরে ষ্টার্ট দিতে পারেন, আমি ঠিক সময় গিয়েই পৌঁছাচ্ছি।

মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে পিছনে ফিরে তাকাতেই সুদর্শনের চোখ দুটোর পল্লব পড়াও বুঝি বন্ধ হয়ে গেলো—একি এক আশ্চর্য চক্ষুচমৎকারী মূর্তিতে দুর্গা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! মারহাট্টা প্যাটার্ণের চোদ্দ হাত লম্বা একখানা গাঢ় কালো রঙের সাড়ী মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মত আঁট সাঁট করে পরেছে সে—জাতীয় পতকার মত তার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জমকালো অঞ্চলটি কোমরে এমন কায়দায় জড়িয়ে বেঁধেছে যে, মনে হচ্ছে যেন বীরাঙ্গনার উপযুক্ত বেল্ট বা কোমরবন্ধ সেটি। কুণ্ডলীবদ্ধ বেণীটি শিরস্ত্রাণের মতই মাথার শ্রীবৃদ্ধি করেছে। দুই হাতে নিরেট সোনার দুগাছি করে মোটা মোটা কঙ্কন এবং প্রবাল ও মুক্তা খচিত বিচিত্র হার ছড়াটি আধুনিক কারুকার্যখচিত সৌখীন ভূষণের দর্পচূর্ণ করে নিজেদের মহিমায় যেন জ্বল জ্বল করছে। কপালের উপরে সিদুঁরের ফোঁটাটি ঠিক অগ্নিবিন্দুর মত জ্বলছে।

এক নজরে সুদর্শনকে দেখে নিয়ে দুর্গা নিজেই ক্ষিপ্রহস্তে মোটরের দরজা খুলে ভিতরে বসে সশব্দে দরজা বন্ধ করতেই সুদর্শনের হুঁস হলো। কিন্তু কিছু বলবার আগে দুর্গাই সহাস্যে বলল: এতই বেহুঁস যে ভদ্রতাটুকুও ভুলে গেছেন। যাক্, এখন ষ্টিয়ারিং ধরে যথাস্থানে বসুন—সারথি যখন আপনি স্বয়ং।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে সুদর্শনের মনে হচ্ছিল—পুলিস-সুপারের, শুদ্ধান্তের এই মেয়েটি কি বহুরূপিনী! পুরাণের গল্পে কামচারিণীদের কাহিনী আছে; এই মেয়েটীও যেন তাদের মতন মাত্র প্রসাধনের সাহায্যে রূপপরিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। কিছুদিন আগে জেসিডির গোলাপ বাগিচায় এমনই এক চোখে-লাগা রূপ দেখে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, নিজেকে কিছুতেই

সামলাতে পারেনি সেদিন। আজও এমন এক নূতন ভঙ্গিতে সেজেগুজে এসেছে যে, দেখলেই মনে হয় যেন চেহারাটি পর্যন্ত বদলে ফেলেছে। নারীর রণরঙ্গিনী মূর্তির কিছুটা আভাস কলকাতার নাট্যশালায় দেখা গেছে—কিন্তু আজকের এই নারীকে দেখলে মনে হয় যেন, এই হচ্ছে নারীর রণরঙ্গিনী মূর্তির প্রকৃত আদর্শ।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ভিতরে উপবিষ্টা এই নারী-মূর্তির দিকে চেয়ে সুদর্শন বলল: সত্যিই আজ তুমি রূপ-সজ্জার চটকে চমকে দিয়েছ আমাকে!

কথাগুলি বলতে বলতেই সুদর্শন সোফারের সিটে বসে মোটরের ষ্টিয়ারিং চেপে ধরল।

দুর্গা এই সময় সামনের দিকে ঝুঁকে সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করল: গন্তব্য আমাদের কোন পথে?

সুদর্শনও পিছনে ফিরে তাকাল, তারপর বলল: যে পথে তোমার অভিরুচি।

তেমনি সহজ ভাবেই দুর্গা বলল: তাহলে চলুন না কোন দেবস্থানে যাওয়া যাক।

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুদর্শন বলল: সর্বনাশ! হঠাৎ দেবতার প্রতি এত ভক্তির কারণ? সাজসজ্জায় ত ভক্তিমতীর কোন লক্ষণ দেখছি না।

বিহসিত মুখে দুর্গা বলল: মোক্ষের উদ্দেশ্যে ত মন্দিরে যাচ্ছি নে, শক্তি যেখানে দাবী—শক্তিরূপা হয়েই যাওয়া বিধি। চলুন না, সরমার দিকে—দূর পাড়ি দেওয়াও হবে, আর ঐ পথে শুনিছি ঝাড়খণ্ডেশ্বরের আস্তানা, তাঁর মাথায় দুটো ফুল বেলপাতা চাপিয়ে আসা যাবে।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: মাহাত্ম্য কিছু আছে নাকি?

দুর্গা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল: নিশ্চয়ই। সন্ধ্যার দিকে ওঁর মাথায় এক ছড়া ফুলের মালা আর বেলপাতা চাপিয়ে যা মানত করা যায়, তাই

সিদ্ধ হয় শুনিছি। আপনার হাতে ত মস্ত বড় কেস ঝুলছে, পরীক্ষা করতে পারেন।

উৎসাহের স্বরে সুদর্শন বলল : ভালো কথা, তাই চলুন—পরীক্ষা করা যাক। অন্ততঃ দেবদর্শন ত হবে—সঙ্গে থাকবেন শক্তিরূপিণী দেবী। জানেন—দূরত্ব কতখানি ?

ঠিক জানিনে, তবে শুনিছি—মাইল সাতেকের মধ্যে।

অলরাইট, আপনার বাঞ্ছিত পথেই রথচালনা করি।…এক নিশ্বাসে কথাটা বলেই সুদর্শন মোটর ঘুরিয়ে—করণীবাগের উপর দিয়ে যে দীর্ঘ রাস্তা কুণ্ডাকে অতিক্রম করে বরাবর সরমা অঞ্চলে গিয়েছে—সেই দিকেই রওনা হলো।

সহরতলীর অর্দ্ধ অচেতন বিরাট অবয়বটির উপর দিয়ে পুলিস-সুপারের সুদৃশ্য মোটরখানি তির্যক গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। শ্রাবণের অপরাহ্ন, ঘণ্টা দুই আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে; কিন্তু কঙ্করময় পথে তার কোন চিহ্নই নেই। আকাশ নির্মল, নির্মেঘ, পরিষ্কার। পথের দুদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে আদিবাসীদের পল্লী-সন্নাবেশ, উভয় দিকের সীমারেখা দূরবর্তী সমুন্নত গিরিশ্রেণীর কোলে গিয়ে মিশেছে! কুণ্ডার পরেই বরাবর এই দৃশ্য এবং পথের অধিকাংশই প্রায় যানবাহন শূন্য। কচিৎ দেওঘর সহরের বাজার-প্রত্যাগত আদিবাসীদের এক একটি ক্ষুদ্র দল চোখে পড়ছিল। স্থানীয় তরিতরকারী, দুধ, ফল, চাল, চিড়া, কাষ্ঠ প্রভৃতি সহরের বাজারে বিক্রী করে কেরসিন, কাপড়, জামা, তৈজসপত্রাদি সহরসুলভ দ্রব্যজাত কিনে নিয়ে দেহাতে ফিরে চলেছে এরা।

দেওঘর থেকে কুণ্ডা পর্যন্ত সুদর্শনই মোটর চালিয়ে এল। তার ইচ্ছা ছিল, দুর্গাও সামনের দিকে এসে বসে ; গল্প করতে করতে মোটরের ষ্টিয়ারিং ধরে গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়াতে থাকবে—যে পর্যন্ত তার সঙ্গিনী

ভীত হয়ে গতি হ্রাস করতে অনুরোধ না জানাবে, সে নিরস্ত হবে না। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়নি। মোটরে ওঠবার সময় মুখে প্রস্তাবটি না করলেও কৌশলে যে আভাস দিয়েছিল, দুর্গার মত চতুর মেয়ের চোখে তা কিছুতেই এড়াবার কথা নয়; কিন্তু দুর্গা একটু হেসে পরক্ষণে মুখখানা গম্ভীর করে এমন ভঙ্গিতে ভিতরের গদীতে গিয়ে বসে যে, তাতে তার প্রত্যাখ্যানই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সুদর্শনও মুখখানা গম্ভীর করে একাই সামনের সিটে বসে মোটরে ষ্টার্ট দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-একটা প্রশ্নের ছলে দুর্গার দিকে বার বার পিছনে ফিরে তাকাবার প্রলোভন সে দমন করতে পারেনি। দুর্গার আজকার রূপসজ্জাটি সুদর্শনের চোখ দুটিকে আশ্চর্যভাবে আকৃষ্ট করেছিল বলেই বারবার এই ভুল করছিল। কিন্তু কুণ্ডার পরে রাস্তার অধিকাংশই নির্জন দেখে সুদর্শনের মনের ভূতটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই সময় দুধনিয়া নামক স্থানটির বাঁকের মুখে এসে সামনের রাস্তাটির অবস্থা না দেখেই দুর্গার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে পরিহাসের সুরে একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই চাকাটি পথের এলাকার বাহিরে পড়ায় আর একটু হলেই মোটরখানি খাদের ভিতরে গড়িয়ে পড়েছিল আর কি! কিন্তু দুর্গার চীৎকারে সুদর্শন তাড়াতাড়ি ব্রেকটি বন্ধ করতেই গাড়ীখানা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল। দুর্গাও সেই অবস্থায় গাড়ী থেকে নেমে খাদের মুখে দাঁড়িয়ে বলল: আপনি ষ্টার্ট দিন, আমি চাকাটা ঠেলে দিচ্ছি—নেমে পড়বে না, ভয় নেই।

একখানা চাকা খাদের দিকে কিছুটা নেমে পড়েছিল; এ অবস্থায় গাড়ী ষ্টার্ট দিলেও এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে সবলে গাড়ীখানাকে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সে কাজ একজনের নয় এবং খুবই কঠিন। তথাপি দুর্গাকে এ কার্যে ব্রতী দেখে

সুদর্শন সভয়ে বলল: করছ কি, এখনি যে খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়বে।

কঠিন মুখে দুর্গা বলল: থাক্‌, আর উপদেশ দেবেন না, যা বলছি করুন।

সুদর্শন এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, কি সর্বনাশই সে ঘটিয়েছিল—কেবল দুর্গার চীৎকারেই সব রক্ষা পেয়েছে। কাজেই, এ অবস্থায় আর প্রতিবাদ না করে সে মোটরে ষ্টার্ট দিল। পাশ থেকে দুর্গাও পিছনের দুর্বল দিকটায় প্রবল চাপ দিতেই একটু পরে গাড়ী রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে গেল। দুর্গা গাড়ীর মাটগাডের কাছে এগিয়ে আসতেই সুদর্শন তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল: মনের আর মুখের জোরই তোমার বরাবর দেখেছি, গায়ের জোরও যা দেখালে অবাক হবার মত।

দুর্গা কোন উত্তর না দিয়েই সামনের আসনে ষ্টিয়ারিং ধরে বসল, তারপর বিস্মিত সুদর্শনের মুখের উপর চোখের এক ঝলক্‌ আলো ছড়িয়ে বলল: আমি এখন সারথি, আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন, নইলে আবার কোথায় কি অ্যাক্‌সিডেণ্ট করে বসবেন!

সুদর্শন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: তুমি মোটর ড্রাইভ করতেও জান নাকি?

কোন উত্তর না দিয়ে দুর্গা ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ীখানাকে গতিশীল করতেই সুদর্শন ভিতরে গিয়ে বসবার অবসর আর পেল না—সামনের দিকেই তাড়াতাড়ি উঠে দুর্গার পাশেই বসে পড়ল। গাড়ী তখন চলেছে এবং ক্রমশঃই তার গতিশক্তি দ্রুততর হচ্ছে।

দুর্গা ষ্টিয়ারিংএর দিকে দৃষ্টি রেখে বলল: ভিতরে গিয়ে বসলেই পারতেন।

সুদর্শন বলল: পারবার সময় দিলে কই—কথাটা বলেই হঠাৎ ষ্টার্ট দিয়ে বসলে যে?

তেমনিভাবে সুদর্শনের দিকে না চেয়েই দুর্গা বলল: তা হলেও ঐ স্পীডে গাড়ীর ভিতরে উঠে পড়া কোন পাকা সোফারের পক্ষে শক্ত ছিল না!

একটু থেমে, মুখে হাসি এনে সুদর্শন বলল: তবে আসল কথাই বলি—রথীর আসনের মায়া ছেড়ে তোমার পাশের স্থানটুকুই আমি বেছে নিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার চোখের দুটি কোণ ঈষৎ স্ফুরিত হয়ে উঠল। কি একটা কথা তার মুখে এসেছিল, কিন্তু সেটা না বলে মুখখানা গম্ভীর করে ষ্টিয়ারিংএর দিকেই সে দৃষ্টিসংলগ্ন করল।

আড়চোখে দুর্গার দিকে চেয়ে সুদর্শন বলল: রাগ করলে নাকি আমার কথায়?

চোখের দৃষ্টি ষ্টিয়ারিংএ নিবদ্ধ করে দুর্গা শান্তভাবেই বলল: আমার কথা ত আপনি শুনেছেন সুদর্শন বাবু!

—খুলেই বল, মনে করতে পারছি না ত!

—আপনার কথা ত মনে করতে পারচেন—একটু আগে যা বললেন?

সুদর্শনের মুখখানা একথায় লাল হয়ে উঠল; একটু ক্ষোভের সুরেই বলল: পাশে বসবাস স্থানটুকু চেয়ে কি অন্যায় করেছি দুর্গাদেবী?

দুর্গাও গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল: হাত পেতে চাওয়া, আর জোর করে নেওয়া কি এক কথা সুদর্শন বাবু?

পলকে মুখখানা শক্ত করে সুদর্শন বলল: তবে কি তুমি এখান থেকে আমাকে উঠে যেতে বলছ?

দৃঢ় অথচ সংযত স্বরে দুর্গা উত্তর দিল: না, তা আমি বলিনে।

আপনি ত জানেন, কতবার আপনাকে বলেছি—সব্যসাচীর লাল পরো-য়ানা যেন আমাকে সব সময় সব জায়গাতেই ঘিরে রেখেছে। আপত্তিই বলুন, আর ভয়ই বলুন—আপনারই জন্যে।

কথাটা শুনে আজ আর সুদর্শন চটে উঠল না, বরং জোরে একটু হেসেই বলল : সত্যিই তুমি অদ্ভুত মেয়ে দুর্গাদেবী! এমন সিরিয়াস হয়ে কথাটা বললে যে, কার সাধ্য ওটাকে ঠাট্টা বলবে!

বিদ্যুতের আভার মত মুখে আভা ফুটিয়ে দুর্গা বলল : আপনার অনুভবশক্তিও অদ্ভুত দেখছি! এখন মনে হচ্ছে, আপনি সব্যসাচীর মুখোমুখী না হয়ে ছাড়বেন না।

সুদর্শন একটু অবাক হয়ে বলল : হঠাৎ এ কথাটা বলার মানে ত বুঝলাম না···পরক্ষণে মনে মনে কি ভেবে একটু উত্তেজিত হয়েই সুদর্শন বলল : একটা কথা আজ তোমাকে বলে রাখছি, কথাটা কণ্ঠস্থ করে রাখ—আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে ঐ সব্যসাচীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার মুখ তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

বিদ্রূপের সুরে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : তাহলে মুখখানা রাতারাতি সেলাই করে দেবেন নাকি?

সহজ কণ্ঠেই সুদর্শন বলল : সেটা ত আর গৌরবের কথা নয়—সেলাই করলে না হয় বলাই বন্ধ হলো, কিন্তু মনটাকে ত আর বেঁধে রাখা যাবে না। আমি বলেছি, এমন কিছু কাণ্ড হবে ঐ সব্যসাচী সম্বন্ধে যে, এর পর তোমারই তাকে বিষের মত মনে হবে, আর আমার পাশে বসা নিয়ে এত কথা কাটাকাটিরও প্রয়োজন থাকবে না তখন।

সুদর্শনের কথাটা দুর্গা কিভাবে নিল বা তার কি অর্থ করল, সেই জানে। কিন্তু দুর্গার মুখে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। সুদর্শন উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে বৃথাই চেয়ে রইল—একথার উত্তরে কি

কথা দুর্গা বলে তা শোনবার আশায়! কিন্তু তাকে নিরুত্তর দেখেও এবং তার মুখে কোন পরিবর্তনের আভাস না পেয়ে সে একটু উদ্বিগ্নই হলো। সহসা এই সময় মোটরের গতি মৃদু হওয়ায় সবিস্ময়ে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপার কি—স্পীড কমালে যে? কথাটা শুনে ভেঙ্গে পড়লে নাকি?

স্পীড আরো একটু কমিয়ে দুর্গা বলল: উঁহু! রেগে গেছি। শিগগীর আপনার পিস্তলটি বার করুন দেখি।

জামার পকেটে সতর্কভাবে হাতখানি রেখে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল: কেন বল ত?

সহজ কণ্ঠে দুর্গা বলল: দেখতে পাচ্ছেন, এক ঝাঁক পাখী ডাইনের ঐ মাঠ দিয়ে উড়ে আসছে, এখনি রাস্তা পার হয়ে বাঁয়ের মাঠে পড়বে। আচ্ছা, চলন্ত মোটর থেকে ঐ ঝাঁকের একটা উড়ন্ত পাখীকে গুলি করে মারুন ত দেখি—কেমন আপনার নিশানা! শিগগীর—এসে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে টোটা ভরা রিভলভারটি বার করে সুদর্শন পাখীর ঝাঁকের দিকে নিশানা করল। পরক্ষণে সেই প্রান্তরময় শান্ত অঞ্চলটির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অস্ত্রটি গর্জে উঠল। পাখীগুলি কলরব তুলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—কিন্তু একটিও গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ল না।

উত্তেজিত কণ্ঠে দুর্গা বলে উঠল: পড়েনি, পড়েনি, পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে—শিগগীর, শিগগীর—

সঙ্গে সঙ্গে মোটরের গতিও পুনরায় দ্রুততর হলো এবং পর পর আরও তিনবার ফায়ার করেও সুদর্শন পক্ষীদলের একটিকেও ঘায়েল করতে পারল না—উড়োপাখীদের ভিতর থেকে কোনটিকে মাটিতে পড়তে দেখা গেল না।

দুর্গা বলল: এ! হেরে গেলেন। কার কাছে এ বিদ্যা শিখেছিলেন?

দিন আমাকে, পাশে যখন বসেছেন সাহস করে, আমারই উচিত আপনাকে সামলে নেওয়া—অন্তত একটিকেও শিকার করা চাই।

হতাশের স্বরে সুদর্শন বলল : আর একটি মাত্র টোটা এতে আছে—

তাতেই হবে—দিন ত!.........বলেই দুর্গা এক রকম জোর করেই যেন রিভলভারটি টেনে নিল সুদর্শনের হাত থেকে। তারপর একটু সরে বসে বলল : মিনিট কয়েকের জন্যে আপনি সারথি হোন—স্পীডটা আরো বাড়িয়ে দিন।

পাখীগুলো তখন আকাশের চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে—সড়কের দিকে ঊর্দ্ধাকাশে কয়েকটি পাখী প্রাণভয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই সময় হঠাৎ দেখা গেল তারা কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত নিচের দিকে নেমে আসছে। দৃষ্টি আকাশ পথেই রেখে দুর্গা সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করল : ও পাখীগুলো অমন করে নিচের দিকে নেমে আসছে কেন বলুন ত?

সুদর্শন বলল : তোমাকেই চান্স দেবার জন্যে।

দুর্গা বলল : ওদের অবস্থা হয়েছে সেই—জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘের মত!

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল : তার মানে?

দুর্গা বলল : দেখতে পাচ্ছেন না—ওদের কাছ থেকে আরো হাত দশেক ওপরে চাকার মত কি একটা ঘুরতে ঘুরতে ওদের দিকেই নেমে আসছে! ওটা হচ্ছে বাজ পাখী।

সুদর্শন সবিস্ময়ে বলল : তাই নাকি?

দুর্গা বলল : ভগবান আমাকে, বাঁচিয়েছেন—জেদের জন্যে নিরীহ পাখীদের কাউকে হত্যা করতে হলো না। আমি ঐ বাজটাকে মেরে পাখীগুলোকে বাঁচাব।

অবাক হয়ে সুদর্শন আকাশের পানে চেয়েও কিছুই বুঝতে পারল

না। ইতিমধ্যে পাখীগুলো অনেক নিচে নেমে এসেছিল। সুদর্শন বলল : খুব কাছে এসেছে, এইবার—

দুর্গা বলল : না, আমার লক্ষ্য ঐ বাজ পাখীটা! দেখছেন—হউইয়ের মত কি ভাবে সবেগে নেমে আসছে ?

এতক্ষণে সুদর্শন দেখতে পেল—ধূসর বর্ণের একটা কিছু উল্কার বেগে সত্যিই নেমে আসছে দূর আকাশ থেকে। বাজ পাখীর সঙ্গে তার পরিচয় নেই, কাজেই সে চুপ করেই রইল। হঠাৎ ক্রম্‌ করে পিস্তলের আওয়াজ হলো ; পাখীরা আবার কলরব করে ছড়িয়ে পড়ল আকাশ পথে। একটু পরেই গুলিবিদ্ধ বাজপাখীটাও রাজপথের উপর পড়ে ছটফট করতে লাগল। মোটরখানাও তখন তার সামনেই এসে পড়েছে।

ব্রেক কষে সুদর্শন মোটর থামিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেই হিংস্র পাখীটাকে দেখতে লাগল। দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : আপনি যে রকম অবাক হয়ে দেখছেন, তাতে মনে হয় এই সাংঘাতিক জীবটির সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই !

সুদর্শন বলল : নাম শুনেছি, দেখিছি বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু দেখতে ত মন্দ নয় ?

দুর্গা বলল : মানুষের মধ্যেও এই শ্রেণীর ভীষণ জীব অনেক আছে—দেখতে তারাও মন্দ নয় ! পাখীটাকে নেবেন নাকি ?

সুদর্শন বলল : ওর ত সব শেষ হয়ে গেছে ; মরা পাখী নিয়ে কি করব—গাড়িটাই নোংরা হবে।···বলতে বলতেই সে ষ্টিয়ারিংটি ঘুরিয়ে দিল।

সুদর্শনের কথার সঙ্গে সঙ্গেই তার অসতর্ক হাত থেকে ষ্টিয়ারিংটি ক্ষিপ্রহস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে দুর্গা স্পীড বাড়িয়ে দিল।

সুদর্শন এবার পার্শ্বোপবিষ্টা এই আশ্চর্য তরুণীটির দিকে নীরবে

তাকাল। তার মুখ দিয়ে আর কথাও নির্গত হলো না। সে তখন মনে মনে ভাবছিল—এই অদ্ভুত মেয়েটি যেন দিনে দিনে তার কমনীয় অবয়ব থেকে এক একটি রহস্যময় আবরণ তুলে ফেলে তার বিচিত্রতম রূপ প্রকাশ করে জানিয়ে দিচ্ছে—সত্যই সে অপরূপা।

খানিক পরে সুদর্শন মনের কথাটা মুখ দিয়ে প্রকাশ করল: তোমার সঙ্গে যতই গভীর ভাবে মিশছি, ততই আশ্চর্য হচ্ছি তোমার অদ্ভুত ইনটেলেকচুয়াল পাওয়ার দেখে। সত্যিই তোমার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

দুর্গা বলল: এ দেখে স্তম্ভিত হবার কিছুই নেই। এও একটা বিদ্যা—শিক্ষাতেই আয়ত্ত করা যায়। এখন আপনার পিস্তলটা রাখুন, পাঁচটা টোটাই ত নষ্ট হয়ে গেলো—নতুন টোটা ভরে নিন।

কথাটা শুনেই সুদর্শন চমকে উঠল। টোটার কথায় মনে পড়ে গেল তার—টোটার বাক্সটাই ফেলে এসেছে। অথচ তার কাছে আর একটাও নতুন টোটা নেই।

আড়চোখে সুদর্শনের দিকে চেয়ে দুর্গা বলল: বাড়তি টোটা বুঝি আনতে ভুলেছেন? তাহলে উপায়! একটা পাহারাওলাও আপনি সঙ্গে আনেননি ঐ হাতিয়ারের ভরসায়। এর পর যদি কোন বিপদ ঘটে, কি করে সামলাবেন? এখনো ত সব্যসাচীর 'আলটিমেটাম' আপনাকে শোনাইনি! আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড যে, সব্যসাচীর কথা কথার পীঠে উঠলেও তাঁর আলটিমেটামের কথাটি আপনি তোলেনইনি! অথচ ওটা শোনবার জন্যেই আমাদের এই য়্যাডভেঞ্চার!

কথাটা শুনেই সুদর্শন যেন সর্বাঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক শক পেল। কি আশ্চর্য! আসল কথাটাই তার মন থেকে মুছে গেছে? অথচ সকালে দুর্গাই তাকে বলেছে যে, সব্যসাচীর শেষ পরোয়ানা জারি হয়ে

গেছে এবং তার একটা কপি দুর্গাও পেয়েছে। সেই পরোয়ানা সে বিকেলের যাত্রাপথে সুদর্শনকে পড়ে শোনাবে—এই ধরণের কথা বলতেই না মোটরে লম্বা পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে? অবিশ্যি, পরে জাহ্নবীও তাকে বলেছিলেন যে, তাঁর কাজের সুবিধার জন্যে দুর্গাকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বিকেলের দিকে কোথাও ঘুরিয়ে আনতে হবে। তাঁর এই প্রস্তাবের আগেই সুদর্শন দুর্গাকে নিয়ে বেরুবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু এমনি তার ভুলো মন যে, এতখানি পথ এসেও সে আসল কথাটা তুলতেই ভুলে গেছে! তাই সে সহর্ষে দুর্গাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল: মেনি থ্যাঙ্কস্ দুর্গাদেবী, আমাদের সেই যাদুকর বন্ধুটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার কথায় মনে পড়ে গেল। এখন আর কোন কথা নয়, তার সেই পরোয়ানাখানি বার করে ফেল—শোনা যাক্।

মনে মনে হেসে পার্শ্বোপবিষ্ট সুদর্শনের মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একটিবার তাকিয়ে দুর্গা সহজভাবেই বলল: সে পরোয়ানা পড়বার দরকার হবে না, মুখেই বলছি শুনুন…

সুদর্শনকে এর পর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দৃষ্টিটা তার মুখের উপর থেকে ফিরিয়ে হাতের ষ্টিয়ারিংয়ে নিবদ্ধ করে দুর্গা সেই পরোয়ানার কথাই বলে চলল: আমি যে চিঠি পেয়েছি, কাকাবাবুকেই সে চিঠি লেখা উচিত ছিল—চিঠির গোড়াতেই সব্যসাচী একথা জানিয়েছেন। কিন্তু উপদেশ দিয়ে কোন চিঠি লিখলে তার যে কোন ফল হবে না—কিছু দিন আগে সহরের মহাজনদের ব্যাপারে আপনাকে এক লম্বা চিঠি লিখে সেটা ভালোভাবেই জানতে পেরেছিলেন তিনি; পরোয়ানা ঠিক সময়ে কাকাবাবুর নামেই যাবে, কিন্তু তার আগে আমাকে কাকাবাবুর একটা দুষ্ট মতলবের কথা লিখে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

এই পর্যন্ত বলেই দুর্গা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে সুদর্শনের মুখখানা ভালো

করে দেখে নিল। সুদর্শনও দুর্গার মুখে ভূমিকাটুকু শুনেই চমকে উঠল, তার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকল। তবে কি দাদাবাবুর আসল মতলবখানা দুর্গা জানতে পেরেছে? এ অবস্থায় সুদর্শনের মুখের ভাব স্বাভাবিক থাকবার কথা নয়—দুর্গার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মনের উদ্বিগ্ন ভাবটুকু সহজেই ধরা পড়ে গেল। ঝাঁ করে দুর্গা দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় কথা বলতে লাগল: কাকাবাবুর সম্বন্ধে সব্যসাচী ঐ পরোয়ানায় এমন কথা লিখেছিলেন—আমার বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর পক্ষে কোন রকমে যে কাজটি করা সম্ভব নয়। অথচ, সব্যসাচীর উপরে আমার যে বিশ্বাস ও আস্থা, তাতে তিনি যে ভুল খবরের উপর জোর দিয়ে আমাকে এত বড় একটা কথা লিখবেন, সেটাও ভাবতে পারি না।

মুখখানা ভার করে সুদর্শন বলল: চিঠিখানা তোমার কাকাকে দেখালেই ত সব গোল মিটে যেত।

দৃঢ়স্বরে দুর্গা বলল: ক্ষেপেছেন! কাকার বিরুদ্ধেই যেখানে নালিশ, খপ করে তাঁর কাছেই সব ফাঁস করে দেব? তেমন কাঁচা মেয়ে আমি নই।

তাহলে কাকাকেও আপনার বিশ্বাস নেই বলুন?

মনে সন্দেহ হোলে বিশ্বাস কি করে থাকতে পারে সুদর্শনবাবু—আপনিই বলুন না?

সুদর্শন বলল: কিন্তু আসল কথাটাই এখনো শুনলাম না ত—যে উড়ো কথা শুনে কাকার সম্বন্ধেও তোমার মন বিগড়ে গেছে!

মৃদু হেসে দুর্গা বলল: কথাটা উড়োই হোক বা স্থিরই হোক, বলবার অবসর আপনি দিলেন কই—নিজেই ত অধৈর্য হয়ে কথার উপরে জেরা করে বসলেন!

গম্ভীর মুখে সুদর্শন বলল: বেশ, এখন তাহলে বলে ফেল—শুনলে সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে আমিও একটা অভিমত দিতে পারবো।

দুই চোখের গভীর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সুদর্শনের মুখে নিবদ্ধ করে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: পারবেন? সত্যি বলছেন? কিন্তু কথাটা সত্য বলেই আপনার মনে হোলে—স্বীকার করবার সাহস রাখবেন? ভেবে বলুন সুদর্শনবাবু; মনে রাখবেন, আমরা যে দেবতার এলাকায় এসে পড়েছি—তিনি বড় জাগ্রত।

সুদর্শনের কপাল আরক্ত হয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষস্বরে সে বলল: কিন্তু আসল কথাটাই এখনো বলনি তুমি!

দুর্গা সুদর্শনের মুখের দিকে চেয়ে থেকেই এক নিশ্বাসে বলল: কথাটা হচ্ছে—কাকাবাবু আজ রাতেই আমার বলিদানের ব্যবস্থা নাকি করেছেন!

কথাটা শুনেই সুদর্শন জোরে হেসে উঠল। হাসির গমক থামলে শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করল: পরোয়ানায় বুঝি এই খবরটি বানিয়ে বলে মাথাটা বাঁচাবার জন্যে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোমার সব্যসাচী?

মুখ টিপে হেসে দুর্গাও জিজ্ঞাসা করল: বলিদান বলতে কি আপনার সূক্ষ্মবুদ্ধি হাড়িকাঠের মধ্যে মাথা গলিয়ে দেওয়াটাই অনুমান করে নিল? সে রকম চরম বলিদান হলে ত আপত্তির বিশেষ কিছু থাকত না…কিন্তু এ যে বেঁচে থেকেও মরার যন্ত্রণা ভোগ করা! ওঁরা যে বরাবরই এর বিরোধী; সেইজন্যেই ত দেশবাসীকে এই ভাবে মারবার জন্যে সরকারের যে ব্যবস্থা চলে আসছে, তার বিরুদ্ধেই ওঁদের যত সংগ্রাম!

সুদর্শনের মুখখানা আর একবার আরক্ত হয়ে উঠল: বক্রদৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চেয়ে সে বলল: আমি লক্ষ্য করছি—দাদাবাবুর অসুখের পর থেকেই তুমি যেন খোলাখুলিভাবেই তোমার সব্যসাচী পার্টিকে সমর্থন করে চলেছ!

দুর্গাও তৎক্ষণাৎ উত্তর করল: তার কারণও অস্পষ্ট নয়—আপনার

দাদাবাবুর অসুখের মূলেই যে সব্যসাচীর বাহাদুরী। কাজেই বিজয়ীকে সবাই সমর্থন করে থাকে।

কথাটা চাপা দেবার অভিপ্রায়েই সুদর্শন যেন তৎক্ষণাৎ বলে উঠল : কিন্তু বলিদানের প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল যে! তা ছাড়া, পরোয়ানার শেষ কথাটা এখনো বলা হয় নি।

মোটরের গতিবেগ একটু কমিয়ে দুর্গা বলল : তাহলে শুনে নিন, কেননা এর পর আর সময় হবে না—আমরা এসে পড়েছি।

সুদর্শন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল যে, মোটরখানা এই সময় সোজা রাস্তা ছেড়ে মোড় নিয়ে অপরিসর একটি রাস্তার উপর দিয়ে মৃদুগতিতে চলেছে। এই সংকীর্ণ রাস্তাটির দুপাশে শাল গাছের সারি, মাঝে মাঝে স্তূপের মত এক একটা গুল্ম—লতাজাতীয় এক শ্রেণীর গাছ অসংখ্য পত্রপল্লব প্রসারিত করে কোন অনুচ্চ পার্ব্বত্য বৃক্ষকে আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবেষ্টন করে স্তূপের মত দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। দূর থেকে হঠাৎ এগুলি দেখলেই স্তূপ বলে ভ্রম হয়। অপরাহ্নের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। পথে জনমানবের চিহ্ন নেই এবং কাছেও যে কোন লোকালয় আছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তাও অনুমান করা কঠিন। মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করে সুদর্শন বলল : দেওঘরে এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গ ছাড়া কোনদিনই তুমি বাইরে যাওনি শুনিছি ; আমিও কোনদিনই তোমাকে এ অঞ্চলে আনিনি। কিন্তু যে ভাবে তুমি মোটর চালিয়ে স্বচ্ছন্দে এখানে এলে, তাতে মনে হচ্ছে এদিককার পথঘাট সবই তোমার জানা আছে।

সুদর্শনের কথা শেষ হতে না হতেই দুর্গা ঝাঁ করে কথাটার সমর্থন করেই বলে উঠল : আপনি ঠিক বলেছেন, এদিককার পথঘাট আমার এমনি জানা হয়ে গেছে যেন আমি নখদর্পণেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু

আমার কাছে ভারি আশ্চর্য ঠেকছে সুদর্শনবাবু, সব্যসাচীর সন্ধানে সারা সহর ও সহরতলী তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন, অথচ এ পথটি কোনদিনই মাড়ান নি! তবে একথাও আপনাকে বলছি, আমার জানা শোনা শুধু প'ড়ে।

বিস্ময়ের সুরে সুদর্শন বলল: প'ড়ে যে পথ জানা যায়, এই প্রথম শুনছি তোমার মুখে।

মুখে হাসির একটু মৃদু রেখা ফুটিয়ে দুর্গা উত্তর করল: আপনার ভারি ভোলা মন—জানা কথাও ভুলে যান। আচ্ছা—বলুন ত, বই প'ড়ে যদি বোধোদয় হয়, জাগ্রত মনের চোখ খুলে যায়, চামড়ার চোখেও পড়া বিদ্যার জোরে যখন অনেক কিছুই দেখতে চিনতে পারি, তাহলে এই বিদ্যার জোরে পথ চিনতে পারব না কেন? বিদেশীরা যখন কোন দেশে যুদ্ধ করতে আসে, তারা কি সে দেশের পথ ঘাট সব ঘুরে ফিরে দেখে চিনে যায়, না—দেশের মানচিত্র মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং কেতাবের মত করে পড়ে তবে সব জানা হয়ে ওঠে? আমিও তেমনি এ অঞ্চলটির একখানি মানচিত্র পেয়েছিলাম—সেই নক্সা পড়েই পথ ঘাট সব কিছু জেনেছি, বুঝলেন?

দুর্গার কথায় সুদর্শনের মুখের কথা যেন বন্ধ হয়ে গেল—নীরবে অভিভূতের মত চেয়ে রইল সে তার এই আশ্চর্য সঙ্গিনীটির বুদ্ধিদীপ্ত বিহসিত মুখখানির পানে।

আড় চোখে দুর্গা সুদর্শনের শুষ্ক মুখখানার দিকে একটিবার চেয়ে পরক্ষণেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল: এই অঞ্চলটাই হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। শিবের মন্দির পর্যন্ত এই সরু রাস্তাটি গিয়েছে। আর ঐ যে সোজা রাস্তাটা আমরা ছেড়ে এলাম, ওটা গেছে আরও অনেক দূরে—ঐ রাস্তাতেই সরমা নামে আর একটি বড় এলাকা পড়ে।

আপনার বোধ হয় মনে আছে, ডুমকা থেকে হুইলার সাহেব কাকাবাবুকে ভয় দেখিয়েছিলেন—সব্যসাচীকে ধরতে না পারলে শেষে হয়ত তাঁকে দেওঘর থেকে সরমাতেই ডিগ্রেড করা হবে? সেই সরমায় যেতে হয় ঐ বড় সড়ক ধরে।

সুদর্শন নীরবেই কথাগুলি শুনল, একটি কথাও বলল না। দুর্গা কথাগুলি বলতে বলতে এক একবার আড়চোখে সুদর্শনের অজ্ঞাতেই তার পানে তাকাচ্ছিল। কথাটা শেষ হতেই সহসা সে এমন একটা নির্ঘাত কথা বলে ফেলল যে, বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধতায় আবৃত সুদর্শনের উগ্র প্রকৃতি বিপুল বেগে যেন ঘুরে গেল।

পথের কথাটা শেষ করেই সহসা মুখে চোখে দুষ্টুমির এক ঝলক হাসি তুলে দুর্গা বলল: এ পথের নক্সাটা কি করে হাতে পেয়েছিলাম, সে কথা ত জিজ্ঞাসা করলেন না? তাহলে আমিই বলি শুনুন—সেই পরোয়ানার সঙ্গে নক্সাটি ছিল, আর পাঠিয়েছিলেন সব্যসাচী স্বয়ং। কেন জানেন—কাকাবাবুর সেই বলিদান থেকে অর্থাৎ তাঁর অগ্রজের অজ্ঞাতে তাঁর বাক্‌দত্তা কন্যটিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। সেইজন্যেই ত ঝাড়খণ্ডেশ্বরের মত জাগ্রতা দেবতার দ্বারে শরণ নেবার প্রয়োজন হয়েছে।

দুর্গার মুখের কথা শেষ হতে না হতে সুদর্শন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে দুর্গার কমনীয় দুটি হাতের বেষ্টনীতে চেপে ধরা ষ্টিয়ারিংটি নিজের বলিষ্ঠ দুটি হাতের আয়ত্তে আনবার আগ্রহ দেখিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল: রোখো—আর নয়; আমি দেওঘরে ফিরে যাবো।

মুখখানা গম্ভীর করে আয়ত দুটি চোখে তিরস্কারের ভঙ্গি ফুটিয়ে দুর্গা বলল: ক্ষেপে উঠলেন নাকি—আমার হাতশুদ্ধ ষ্টিয়ারিংটা চেপে ধরতে চান? এখানে এত বড় মোটরখানাকে ঘোরাবার জায়গা কোথায়?

মন্দিরের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা আছে—আগে চলুন ত সেখানে! আর আমরা এসেও পড়েছি।

সুদর্শন তখন এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, দুর্গার কথায় তার অন্তরের উগ্র পশুটা শান্ত হত কিনা সন্দেহ! কিন্তু ঠিক এই সময় দুর্গা হঠাৎ হর্ণ বাজিয়ে মোটরখানা থামিয়ে ফেলায়, সুদর্শন বলপ্রয়োগে নিরস্ত হলো এবং সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল যে, সত্যই এক কংকরময় ফাঁকা জায়গা; একটু দূরে ছোট একখানি পাথরের ঘর। একটা শান্ত গম্ভীর ভাব স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে। ঘরখানি খুব সাধারণ, দৃঢ় দরজাটি বাহির থেকে শিকল দিয়ে বন্ধ; দেওয়ালের দিকে কতকগুলি ঝরকা—সেই পথে ঘরের মধ্যে সম্ভবতঃ আলো ও বাতাস চলাচল করে। পিছনের দিকে শুষ্ক ফুল বেলপাতার স্তূপ দেখা যায়। এটি যে কোন-দেবায়তন, নিত্যনিয়মিতভাবে দেবার্চনা হয়ে থাকে, হালের ও অতীতের বিবর্ণ শুষ্ক উপচারগুলিই শুধু সেই পরিচয় দিচ্ছে।

দুর্গাই প্রথমে নিচে নেমে বলল: নামুন, এই যে মন্দির।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে মন্দিরের উদ্দেশে যুক্ত দুটি হাত কপালে তুলে ভক্তি প্রদর্শন করল। সুদর্শনকেও নামতে হলো। নেমেই অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বিদ্রূপের সুরে সে জিজ্ঞাসা করল: কোথায় এলাম আমরা? এই ঘুমটি ঘরখানাই কি ঝাড়খণ্ডেশ্বর ঠাকুরটির আস্তানা? এর মধ্যেই বসবাস করেন তিনি?

দুর্গা একটু গম্ভীর হয়ে বলল: গরীবদের দেবতা, গরীবের হালেই থাকেন, তাই কোন আড়ম্বর এখানে নেই। এসেছেন যখন, দর্শন ও অর্চনা করতেই হবে—মানা না মানা—ভক্তের ইচ্ছা। আপনি একটু দাঁড়ান, আমার একটা পুঁটলি আছে ভিতরে, নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজাটি খুলে আসনের একটি কোণ থেকে

শালপাতায় বাঁধা ফুলপাতার মোড়কটি নিয়ে দরজা বন্ধ করে সুদর্শনের কাছে এসে দুর্গা বলল : চলুন।

সুদর্শন বলল : পূজার উপচারও বুঝি সঙ্গে করে এনেছেন? কৈ জানতে পারিনি ত?

দুর্গা বলল : পুরুষদের পকেটের মতন মেয়েদের আঁচলও অনেক জিনিষ লুকিয়ে রাখতে জানে। আর দাঁড়াবেন না—এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো। এখানে আবার বাঘের ভয় আছে।

কথাটা শুনেই শিউরে উঠল সুদর্শন—সভয়ে বলল : বলেন কি?

মন্দিরের বন্ধ দরজাটির দিকে হাত বাড়িয়ে দুর্গা বলল : বলবার কিছু নেই, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া মন্দির দেখেই বুঝে নিন—আশে পাশে ত আর কোন লোকালয় নেই, তাই মন্দিরের পুরুত ঠাকুর বেলা থাকতেই ঠাকুরের আরতি সেরে ঘরে শিকল দিয়ে তিন মাইল তফাতে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে চলে যান। দেবতা একাই শিকল দেওয়া বন্ধ ঘরের ভিতরে করেন রাত্রিবাস; সকালে এসে পুরুত ঠাকুর দিনের পরিচর্য্যা করেন। তবে সন্ধ্যার দিকে তিনি চলে গেলে কেউ দেবদর্শনে এলে, দরজার শিকল খুলে ভিতরে যান—এই যেমন আমরা এসেছি।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল : তুমি এত খবর কোথা থেকে পেলে?

চোখ দুটো বড় করে সুদর্শনের মুখের উপর তার স্বচ্ছ দৃষ্টি ফেলে দুর্গা বলল : এরই মধ্যে ভুলে গেলেন সব? সব্যসাচী নক্সা পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরোয়ানার সঙ্গে বলিনি—তার সঙ্গে এ সব খবরও ছিল। এখন চলুন—দেবদর্শন করি।

সুদর্শনের সর্বাঙ্গ ক্রোধে কণ্টকিত হয়ে উঠল; কিন্তু সবলে আত্মসম্বরণ করে শুষ্ক হাসি মুখে এনে বলল : চলো।

দুর্গাই এগিয়ে চলল, পিছনে সুদর্শন। তার মনে হচ্ছিল, মেয়েটার

আসল উদ্দেশ্য তাহলে কি? দাদাবাবুর সব চেষ্টাই কি তবে ব্যর্থ হয়ে গেছে—দুর্গা জেনেছে নাকি, আজ রাত্রেই তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে? কিন্তু সে কি একথাও জেনেছে যে, বিয়ের বর সুদর্শন ছাড়া আর কেউ নয়? কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সে কি করবে? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই সে ভেঙ্গে বলে নি। আচ্ছা, সুদর্শন যদি এই সুযোগে এই দেব-মন্দিরেই তার সঙ্গে একটা রফা করে ফেলে? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিকল্পনা হঠাৎ তার মাথার মধ্যে ফুটে উঠল।

কি ভাবছেন—আসুন!···দুর্গার কথায় সুদর্শনের চিন্তা ভেঙ্গে গেল। সে দেখল যে, দরজা খুলে দুর্গা এক পা ভিতরে দিয়ে তাকেই ডাকছে ভিতরে যাবার জন্য। তাড়াতাড়ি সুদর্শন দুর্গাকে অনুসরণ করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঘরের এক কোণে মাটির একটি দেরকোর উপরে মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। সেই স্বল্প দীপালোকে দেবতার চন্দনচর্চিত শিলা মূর্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

হাতের পাতার আধারটি খুলে দুর্গা ফুল, পাতা ও এক ছড়া মালা সুদর্শনের হাতে দিয়ে বলল: এই নিন—আপনার জন্যেও এনেছি; ঠাকুরের মাথায় চড়িয়ে দিন।

সুদর্শন বলল: তোমার পূজা আগে সেরে নাও, তারপর আমি এগুলো চড়াবো।

দুর্গা তখন শিলামূর্তির সামনে বসে সচন্দন ফুল বিল্বপত্র দুর্বা ও ফল নিবেদন করে দিল। বিচ্ছুকে দিয়ে দু'ছড়া মালা আগে থেকেই সে গাঁথিয়ে রেখেছিল। পূজার পরে তার অংশের মালা ছড়াটি দিয়ে শিবমূর্তিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিল। শেষে একটি মুদ্রা দেবস্থানে রেখে প্রণাম ও প্রার্থনা জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সুদর্শন এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দুর্গার দেবার্চনা দেখতে দেখতে নিজের পরিকল্পনাটির কথা ভাবছিল। দুর্গার কথায় আবার তার চিন্তা ভেঙ্গে গেল :

—এখনো দাঁড়িয়ে আছেন, পূজো সেরে নিন।

সুদর্শন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দুর্গার পানে তাকাতেই অস্পষ্ট দীপালোকেও সে দৃষ্টির বিশ্রী রূপ দেখে দুর্গা শিউরে উঠল। মনে পড়ল তার—জেসিডির গোলাপবাগানেও ঠিক এই দৃষ্টি সে দেখেছিল! সুদর্শন কিন্তু দুর্গার মত দেবতার সামনে পূজা করতে বসল না, হাতের ফুল, বেল পাতা, দুর্বা, ফল প্রভৃতি শিলা মূর্তির উপর পর পর নিক্ষেপ করে মালা ছড়াটি দু হাতে ধরে দুর্গার দিকে সেই ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলল : এখন তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—যার উপর আমাদের ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ, মরা-বাঁচা, সুখ-দুঃখ সবই নির্ভর করছে দুর্গা দেবী! এই মন্দিরের ঐ দেবতার সামনেই তার হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

দুর্গা খুব সতর্ক হয়েই সুদর্শনের সংস্পর্শে এসেছে—এই সুন্দর ছেলেটির ভিতরে যে এক অতি কুৎসিৎ হিংস্র মূর্তি ঘুমিয়ে থাকে এবং যে কোন মুহূর্তে সে জেগে উঠে সর্পের মত তাকে দংশন করতে পারে, এ রহস্য তার জানা আছে বলেই সর্বক্ষণ তাকে এই ছেলেটির সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তথাপি সে কল্পনা করতে পারেনি যে, দেবায়তনে দেবতার অর্চনা করতে এসে এভাবে সে হঠাৎ মুখের মুখোস খুলে ফেলবে! তার দৃষ্টির রূপ দেখেই দুর্গার মনে আশঙ্কা হয়েছিল, কাকাবাবুর ইচ্ছাটাকে হয়ত এখানেই সে সার্থক করবার জন্যে ক্ষেপে উঠবে! এখন তার মুখের কথা শুনে আর উভয় হাতের মধ্যে প্রসারিত মালাখানি দেখেই বুঝতে পারল সে,

তার কি উদ্দেশ্য, সে কি চায়? তবু বেশ শক্ত হয়েই মুখখানাকেও কঠিন করে সে বলে উঠল: এটা দেবস্থান—এ কথা ভুলে যাবেন না সুদর্শনবাবু! পূজা পাঠ ছাড়া বাইরের কোন কথা বলবার জায়গা এ নয়। আপনার ওসব কথা বাইরে গিয়েই বলবেন—মালা ছড়াটি শিবের মাথায় চড়িয়ে শীগগীর বাইরে চলুন।

দুর্গার কথাগুলি যেন আঘাতের মত সুদর্শনের বুকে বেজে জ্বালা ধরিয়ে দিল; দুই চোখ পাকিয়ে গলায় জোর দিয়ে সে প্রতিবাদের সুরে বলল: না, বাইরে নয়, এইখানে দাঁড়িয়েই তোমার ঐ পাষাণ দেবতার সামনেই আমার কথা বলব। আর—ওঁকে সাক্ষী রেখেই এই মালা আমি তোমার গলায় পরিয়ে দেব।

দৃঢ়স্বরে দুর্গা বলল: সুদর্শন বাবু! মন্দিরের শুচিতা নষ্ট করবেন না। আমি চললাম।

কিন্তু দুর্গার পদক্ষেপের আগেই সুদর্শন মালা ছড়াটি বাম হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে সবলে দুর্গার একখানি হাত চেপে ধরে বলল: তা হয় না—এক সঙ্গে আমরা এসেছি, এক সঙ্গেই যাব।

প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তৎক্ষণাৎ দুর্গা হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সুদর্শনের মুখের উপর সেই হাতখানি তুলে সশ্লেষে বলল: দেখছি, কাকাবাবুর ঘাড়ের ভূতটা আপনার পিছু নিয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে! ভালয় ভালয় এখনো সংযত হোন, নৈলে আপনার দুর্গতির অন্ত থাকবে না!

সুদর্শনও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে দুর্গাকে অতিক্রম করে তার সামনে দাঁড়িয়ে বাহিরে যাবার পথটি রুদ্ধ করে বলল: তোমার কাকা বাবুর মতলব যখন জেনেছ, আমার কথা মত কাজ কর দুর্গা! যে মালা শিবের মাথায় চড়িয়েছ, ঐ মালা ছড়াটি তুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দাও,

আমিও হাতের মালা ছড়াটি তোমার গলায় দিয়ে শিবের সামনেই আমাদের মিলন-পর্বটা শেষ করে ফেলি।

বিদ্রূপের সুরে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল : মালা পরাতে চান আমাকে—সত্যি ?

কণ্ঠস্বর একটু কোমল করেই সুদর্শন উত্তর দিল : হ্যাঁ—নিজে পরতে তোমার হাতে, আর তোমাকে পরাতে চাই—আমার হাতে। এখন খুসি মনে আর হাসি মুখে গলাটি বাড়িয়ে দাও, লক্ষ্মীটি !

তেমনি বিদ্রূপের সুরেই দুর্গা জিজ্ঞাসা করল: আমি অন্যের বাক্‌দত্তা জেনেও ?

দুর্গার জিজ্ঞাসার উত্তরে সুদর্শনও পাল্টা জিজ্ঞাসা করল : তোমার আপন কাকা একথা জেনেও যখন তোমার বলিদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, এখন তুমিই বল—এমন সুযোগ পেয়ে তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করাটা কি আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে ?

দুর্গার মুখের ম্লান হাসিটুকু প্রদীপের ক্ষীণ আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল এবং সে হাসির অপূর্ব রূপ সুদর্শনকে আরও আকৃষ্ট করল। সেই হাসির মধ্য দিয়েই দুর্গা বলল : দেখুন সুদর্শনবাবু, আপনারা ভেবেছিলেন, আগাগোড়াই আমি অন্ধকারে আছি ; কিন্তু আপনাদের দুর্ভাগ্য, সব্যসাচীর অনুগ্রহে আমি সবই জানতে পেরেছিলুম বলেই আজ সকালে আপনার ঘরে গিয়ে গায়ে পড়ে মোটরে একটা লম্বা ট্রিপ দেবার প্রস্তাব করি। আমি জানতুম, আপনি রাজি না হয়ে পারবেন না ; আর আমিও অন্তত ঘণ্টা দুয়ের জন্যে বিকেলের দিকে বাংলোর বাইরে থাকি, আমার শুভানুধ্যায়ী কাকাবাবুরও এ মতলব ছিল। আমি এই জায়গায় আসাটাই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ, আমি জানি যে, ঝাড়খণ্ডেশ্বরের মন্দিরে ঠিক সন্ধ্যার সময় এসে কেউ কোন প্রার্থনা জানালে তা অপূর্ণ

থাকে না। আমি যখন মঙ্গলময় শিবের কাছে নিজের মুক্তি চাইছিলাম, আপনি তখন দেবতাকে উপেক্ষা করে পাশব বলে আমাকে বাঁধবার ফন্দি করছিলেন! এখন মন্দিরেশ্বর কার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন, এখনি তা জানতে পারা যাবে। তবে আপনাকে আমি এখনো সবিনয়ে বলছি, মালা দেওয়া-দেওয়ির অভিনয় এখন ভুলে যান, ছদ্ম মুখোসটা একেবারে খুলে ফেলুন! এখন ভাবুন—এ অবস্থায় কি করবেন? বাংলোয় এতক্ষণে আমার বলিদানের আয়োজন সব শেষ করে আমার শ্রদ্ধাভাজন কাকা সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। সব শুনেও আপনি কি আমাকে আপনার মোটরে তুলে আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আশা রাখেন?

স্থির হয়ে সুদর্শন দুর্গার কথাগুলি আগাগোড়া শুনল এবং শুনতে শুনতেই সে মনের মধ্যে একটা নিদারুণ অসচ্ছন্দতা ও বিরক্তি বোধ করতে লাগল এই ভেবে যে, এই মেয়েটা সবার চোখে ধুলো দিয়ে তাদের গুপ্ত অভিসন্ধি সবই জেনে ফেলেছিল! নিশ্চয়ই এসব সেই বিচ্চু সয়তানটার কাজ! ঠিক এই সময় ঝাঁ করে তার মনে এই সন্দেহটুকুও জেগে উঠল যে, তাহলে এতদূরে এই নির্জন মন্দিরে তাকে নিয়ে আসার পিছনে কোন গূঢ় অভিসন্ধিও আছে নাকি? কিন্তু এখন ত আর চিন্তারও অবসর নেই; উপস্থিত বুদ্ধি, আর ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করেই তাকে এখন এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মন স্থির করে সুদর্শন বেশ একটু শক্ত হয়েই বলল: দেখ, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে—এখন তর্ক করে কোন লাভ নেই। অস্বীকার করব না—তোমার কাকা আজ রাত বারোটার লগ্নে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছেন। সত্য কথা বলতে কি, এ ব্যবস্থায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আর—এ পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যতটুকু

জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—আদর্শ নিয়ে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে মতভেদ হলেও তোমার অন্তর থেকে নিশ্চয়ই আমি বাতিল হয়ে যাইনি। বিশেষত, এই মন্দিরে ঢোকবার আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আজ বেশ একটা আন্তরিকতার ভাবও জমে উঠেছিল। অবিশ্যি, মন্দিরে এসে আমি নিজেকে আর সামলাতে পারিনি, এর জন্যে এখন আমি লজ্জা বোধ করছি। যাই হোক, আমাদের মধ্যে এখন একটা রফা করে ফেলাই ভালো।

দুর্গার মুখে হাসির রেখাটি পুনরায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তেমনি স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল: রফা! কিন্তু কি করে তা হতে পারে—আমি অন্যের বাক্‌দত্তা জেনেও আপনি যেখানে আমার সঙ্গে এত বড় একটা ছলনা করে এসেছেন বরাবর! আজকের চক্রান্তের আগাগোড়া আপনি জেনেও আমার কাছে ভাঙেন নি—আমার মতটা জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করেন নি। ভেবেছিলেন, ছলে বলে কৌশলে কোন রকমে একবার বিয়ের নামে একটা সংস্কারের বাঁধন দিয়েই আমার মনোবলকে আড়ষ্ট করে ফেলবেন, আর একান্ত নিরুপায় হয়ে আমি আপনার পদানত হয়ে থাকব। কিন্তু আশ্চর্য এখানেই সুদর্শনবাবু, এতদিন আমার সঙ্গে মিশে আমার মনের কিছুটা পরিচয় পেয়েও আপনি এই ধারণার ওপরে আস্থা রেখেছিলেন! আপনারা কি আমাকে সেই মেয়েই ভেবেছিলেন যে, জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ের নামে একটা মনগড়া বাঁধন দিলেই আমি মেনে নেব যে আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেছে, আর আপনি হয়েছেন আমার বিবাহিত স্বামী? এখন যেই জানতে পারলেন, চক্রান্ত আপনাদের ফাঁস হয়ে গেছে—আমি সব জেনে ফেলেছি, অমনি নিরুপায় হয়েই রফা করতে চাইছেন! কিন্তু পুলিসী আবহাওয়ার পরিবেশে আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি বিকৃত হয়ে আপনাকে এমনি নির্লজ্জ করে তুলেছে যে, রফার কথা বলতে

আপনার মুখেও আটকালো না! রীতিমত একটা শাস্তি যেখানে আপনাকে শায়েস্তা করবার প্রতীক্ষা করছে, আপনি তখন নির্লজ্জের মত রফার কথা তুলছেন!...এ পর্যন্ত কথাগুলি দৃপ্তস্বরে বলেই দুর্গা সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল। কিন্তু সুদর্শনের মনে হলো, সে হাসির সঙ্গে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয়ে আকাশভেদী বজ্রপাতকেই আহ্বান করছে।

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে নীরব থেকে পরক্ষণে মুখের ভাব একবারে বদলে ফেলে সুদর্শন চীৎকার করে হুকুমের ভঙ্গিতে বলে উঠল: শাস্তির ব্যবস্থাই হবে—কিন্তু এই পাথরের ঠাকুরের এজলাসে নয়, যিনি তোমার অভিভাবক—নিজের দায়িত্বে যার কাছ থেকে তোমাকে এনেছি, সেখানে এর হেস্তনেস্ত হবে। পূজো ত তোমার হয়ে গেছে—এখন চল।

তেমনি খিল খিল করে হেসে দুর্গা সুদর্শনের কথাগুলোকে যেন ব্যঙ্গ করেই বলল: তাহলে এখনো আমার উপরে দাবীটুকু ঠিক বজায় রেখেছেন বলুন? এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি পুলিস লাইনে চাকরী করতে ঢুকেছেন! আচ্ছা, ও কথা বলবার আগে আপনার মাথায় এই চিন্তাটি এলো না যে, আপনাদের চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে নিরাপদ স্থানে সরে আসবার জন্যে যাকে এত সব কাণ্ড করতে হয়েছে—মায় আপনার রিভলবারের গুলীগুলো পর্যন্ত পাখীর পিছনে খরচ করে নিরস্ত্র করা গেছে, সেই বেপরোয়া মেয়েটি আপনার মুখের এই হুমকী শুনেই কি সুড় সুড় করে পিছনে পিছনে গিয়ে মোটরে চেপে বসবে? এত কাণ্ডের পরেও আমাকে কি এতই শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষ মেয়ে ঠাওরেছেন সুদর্শনবাবু?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুদর্শন বলল: থাক্, ফ্লাটারী ছেড়ে এখন বাস্তব পথে এসো। জানো, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার? তোমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে কেলেঙ্কারী করতে চাইনে; কিন্তু যদি

তুমি আমার সঙ্গে ফিরে যেতে রাজী না হও, তাহলে এই মন্দিরেই তোমাকে রেখে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে আমি বাংলোয় ফিরে যাব।...এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

"বিলক্ষণ! সে কি করে হবে সুদর্শনবাবু? আপনার জন্যেই যে ঐ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে থেকেই!"

মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারপথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে—সুদর্শনেরই সমবয়স্ক, স্বামী বিবেকানন্দের মত বেশবাসধারী উন্নত ও বলিষ্ঠ আকৃতি এক যুবা শাঁখের আওয়াজের মত জোরালো ভরাট গলায় এই কথাগুলি বলে সুদর্শনের গতি স্তব্ধ করে দিল। সুদর্শনের পক্ষে এ ঘটনা কল্পনারও অতীত—এ অবস্থায় সে নীরবে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কর্তব্য স্থির করতে অবহিত হলো।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে দুর্গার তীক্ষ্ণ হাসি সুদর্শনকে বুঝি ক্ষিপ্ত করে তুলল। হাসির পরেই দুর্গা বলল: কেমন সুদর্শনবাবু, বুঝলেন ত—আমি মিথ্যা বলিনি; প্রতি পদেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি, গ্রাহ্য করেন নি; এখন বোঝাপড়া করুন আপনার সব্যসাচী বন্ধুটির সঙ্গে।

ওদিকে দুর্গাকে নিয়ে সুদর্শনও যেই বাংলো থেকে মোটরে বেরিয়ে পড়লো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে—জাহ্নবীও সেই সঙ্গে অস্বাভাবিকরূপে কর্মতৎপর হোয়ে উঠলেন। ক'দিন ধরেই তলে তলে অবশ্য উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। জাহ্নবী তাঁর পাণ্ডা পণ্ডিত ভোলানাথের উপরে বিবাহ ব্যাপারের যাবতীয় ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন; কথা ছিল—পণ্ডিতজী তাঁর বৃহৎ গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারায় আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সমস্তই সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে রাখবেন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই জাহ্নবী গাড়ী পাঠিয়ে পণ্ডিতজীর পরিবারবর্গের সঙ্গে সেই সব জিনিষপত্র বাংলোয় বিবাহ স্থলে আনাবেন। জনৈক বিশিষ্ট ঠিকাদারকেও এই সময় এসে বিবাহ-মণ্ডপ তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেলবার নির্দেশ দেওয়া ছিল। বাংলোর ভিতরে যে উন্মুক্তস্থান-টুকু ছিল, সেইখানে সামিয়ানা খাটিয়ে তার নিচে চাঁদোয়া এবং চতুর্দিকে পরদার সঙ্গে ফুলপাতা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সুদৃশ্য ও সুপরিচ্ছন্ন একটি মণ্ডপ খাড়া করবার জন্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। বাহিরের ড্রয়িং-রুমটি সাধারণত সাজানো অবস্থাতেই থাকে, উপরন্তু জাহ্নবীর পরিচিত কতিপয় ধনী ব্যক্তির বাড়ী থেকে ভাল ভাল আসবাবপত্র আনিয়ে ঘরখানিকে আরো চল্লিশ পঞ্চাশ জনের বসবার উপযোগী করবার যোগাড়যন্ত্র চললো—ড্রইংরুমের বাহিরে লম্বা টানা অলিন্দেও অনেকগুলি চেয়ার পড়লো। চেয়ারগুলির কাছেই ছোট ছোট টিপয় রাখা হলো—জলযোগের পর্বও সহজে সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে। আর—ড্রয়িংরুমে এ ব্যবস্থা তো আছেই। সেখানে একদিকে ভেলভেটমোড়া একখানা

জমকালো বরাসন আনিয়ে বরের বসবার স্থানটুকুর বৈশিষ্ট্যও যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এইটুকুই যে, জাহ্নবীর বাংলোয় খুব চুপিসাড়ে এত বড় একটা সংস্কারমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন নীরবে চললেও, বাহিরে জাহ্নবীর বন্ধুমহলে খবরটি প্রচ্ছন্ন নেই—এই উপলক্ষে পূর্ব থেকেই শতাধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং পুরোহিতস্থানীয় পণ্ডিতজীর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন তো আছেনই। তাঁরাই বিবাহের মঙ্গলাচরণ থেকে আরম্ভ করে বাসর-ঘরের আমোদপ্রমোদ—সব কিছুই নির্বাহ করবেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে যে সব বন্ধু বা পরিচিতদের সঙ্গে, তাঁদের পরিজনরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। এক রকম সন্থ উদ্যোগের মধ্যে অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে এত বড় একটা ব্যাপার সম্পন্ন করতে হোচ্ছে বলে জাহ্নবী বাড়ীতে আর আহার্য্য বস্তু প্রস্তুতের কোন ঝনঝাট না রেখে সহরের এক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন খাদ্যপদের নির্দেশ দিয়ে আহার্য সরবরাহের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। কাজেই, সর্বাধিক জমজমাট ব্যাপারটি থেকে মুক্ত হওয়ায় জাহ্নবীর বাংলো-বাড়ী কাজের বাড়ীর মত গুলজার হোয়ে ওঠেনি। সাজ-সজ্জার ব্যাপার ছাড়া গোল-যোগের কোন কারণই নেই—তা ছাড়া এই ব্যাপারটি তাড়াহুড়ার সঙ্গে হোলেও অনেকটা নিঃশব্দেই চলেছে। একটু বেশী রাত্রেই বিবাহের লগ্ন—তাই জাহ্নবী সম্প্রদানের আগেই নিমন্ত্রিতদের ভোজনপর্ব সমাধার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রাত্রি ঠিক ৮টার সময় প্রীতিভোজে যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রিতদের অনুরোধও করা হয়েছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই ভিতরে বাহিরে যেখানে যা কিছু সাজানোর কথা ছিল—সবই শেষ করে বুঝিয়ে দিয়ে কর্মীরা বিদায় নিয়ে গেল। এদিকে কয়েকখানি গাড়ীও মোতায়েন ছিল পূর্ব থেকেই। সন্ধ্যার মুখেই

পণ্ডিতজীর পরিবারবর্গ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হোলেন। তাঁদের আসার সঙ্গেই বাংলো গুল্‌জার হলো—বিবাহবাড়ীর আবহাওয়া সুস্পষ্ট হোয়ে উঠল।

কথা ছিল, সন্ধ্যার কিছুটা পরই সুদর্শন ফিরে আসবে এবং যদি তেমন বোঝে তো পথেই কৌশলে প্রসঙ্গটা তুলে দুর্গাকে কিছুটা সচেতন করে রাখবে। দুর্গার সম্বন্ধে জাহ্নবী এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, প্রতাপ বেঁচে থাকলে না হয় তার আপত্তির কারণ ছিল, কিন্তু সে যখন নেই—তখন দুর্গার পক্ষ থেকে বিশেষ আপত্তি না ওঠাই সম্ভব। বিশেষত, যেখানে সুদর্শনের মত পাত্র যে-কোন মেয়ের পক্ষে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়! আর যদিই দুর্গা আপত্তি তোলে, সে এমন কোন বিশ্রী কাণ্ড করে বসবে না—যেটা কোন চাঞ্চল্যকর দৃশ্য ঘটানোর মত অশোভন হবে। দুর্গা সম্পর্কে জাহ্নবীর এ অনুমান যদি ভুলই হয়, তাহলে সুদর্শনের সঙ্গে বে-পরোয়াভাবে মেলামেশার দরুণ সমস্ত দোষ ত্রুটি দুর্গার উপরে চাপিয়ে অভিভাবকের কর্তব্য-কঠোর দায়িত্বের অজুহাতে অপ্রিয় বা অপ্রীতিকর হোলেও এ কাজ সম্পন্ন তিনি করবেনই।

সন্ধ্যার পর বাংলোর চতুর্দিকে আলোকমালা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই উপলক্ষে অনেকগুলি অতিরিক্ত আলো নানা স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছিল। জাহ্নবী সাগ্রহে সুদর্শন ও দুর্গার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সাড়ে ছ'টার পর ঘড়ির কাঁটা যতই এগুতে থাকে, জাহ্নবীর উদ্বেগও ততই বাড়তে লাগলো। অথচ, তিনি জানেন না যে, কোন্ পথে আজ তারা মোটর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। বিচ্চুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে ইশারায় জানালো যে, ছোট সাহেব দিদিমণিকে নিয়ে জেসেডির গোলাপবাগে প্রায়ই বেড়াতে গিয়ে থাকেন। তবে, আজ সেখানে গেছেন কি না সে কথা সে বলতে পারবে না। তবুও জাহ্নবী মোটর

বাইক নিয়ে এক ব্যক্তিকে জেসিডির দিকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের সন্ধানে।

ঘড়িতে যখন সাতটা বেজেছে এবং জাহ্নবীর উৎকণ্ঠা চরমে উঠেছে—ঠিক সেই সময় বাংলোর সামনে একখানি মোটর এসে দাঁড়ালো। জাহ্নবী তখন ড্রয়িং রুমের আসনগুলি সাজানো ব্যাপারে তদ্বির করছিলেন, মোটর এসে থামতেই উল্লসিত হয়ে পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: দেখ তো, ছোট সাহেব এলো বুঝি!

লোকটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েই একটু পরে এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে করে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল—এই মাত্র যিনি মোটর থেকে নেমেছিলেন। আগন্তুককে দেখেই জাহ্নবী প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপরই চোখেমুখে উল্লাসের আভা ফুটিয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বললেন: আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক অদ্বৈত বাবু! আমি কল্পনাও করিনি যে, আপনি আসবেন?···বসুন, বসুন।

একখানা সোফায় বসতে বসতেই অদ্বৈত চৌধুরী সহাস্যে বললেন: বেশ যা হোক! নেমন্তন্ন করেছেন চিঠি পাঠিয়ে—ভাইঝির বিবাহ আজ। আর আমাকে দেখেই এই কথা? তবে কি আসবো না জেনেই নেমন্তন্ন—নইলে করতেন না?

বিলক্ষণ—বিলক্ষণ! কি যে বলেন! আপনাকে এখানে আনবার জন্যে কি কম চেষ্টা আর সাধ্যসাধনা করেছি! শেষে এক চিঠিতে জানালেন, কি একটা জরুরী ব্যাপারে ভারি জড়িয়ে পড়েছেন—সেটার সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আর অন্যদিকে মাথা দিতে পারছেন না। তা আপনার সে কাজ চুকে গেছে?

মুখখানা গম্ভীর করে অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: হ্যাঁ, প্রায় একরকম উপসংহারে এসে পড়েছে সে ঝামেলাটা, এখন টেনে তুলতে পারলেই

হলো। এদিকে আপনার ঝামেলার খবর বলুন! ডাকাতগুলোকে কায়দা করতে পেরেছেন ত? না এখনো হামলা চালাচ্ছে?

জাহ্নবী একটু বিষণ্ণভাবেই বললেন: আর বলেন কেন! চারদিক দিয়ে যেন নাস্তানাবুদ করে মেরেছে। 'ব্যাপারটা ক্রমশঃ যে রকম ঘোরালো হয়ে চলেছে চৌধুরী মশাই, সত্যিই ভাবনার কথা হোয়ে পড়েছে। মহাশয়ের আসা যখন হোয়েছে সবই বলব, শুনলেই বুঝবেন যে, কি রকম অশান্তির মধ্যে দিন চলেছে আমার!

মুখখানা উঁচু করে তুলে এবং জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: তাহলে হঠাৎ এ অবস্থায় ভাইঝির বিয়ের ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্য? বিশেষ কোন তাড়া ছিল কি?

জাহ্নবী একটু থেমে বললেন: সে অনেক কথা, আপনাকে বলব বৈকি! কাপড়চোপড় ছাড়ুন, হাত মুখ ধুয়ে একটু মিষ্টিমুখ করুন, তারপর কথা হবে।

ব্যস্তভাবে অদ্বৈতবাবু বললেন: সে সব পরে হবে'খন। উপস্থিত আমাকে একটু বেরুতে হবে জাহ্নবীবাবু! জরুরী একটা কাজ আমার আছে, একবার কুণ্ডার দিকে যাবো। এখন তাহলে উঠি।

অদ্বৈত চৌধুরীর কথা শুনে জাহ্নবী বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না—এসেই লোকটি হঠাৎ এভাবে উঠতে চাইছেন কেন? তিনিও ব্যগ্রভাবে বললেন: সে কি চৌধুরী মশাই, এসেই হাত মুখ না ধুয়ে একটু কিছু না খেয়েই বেরুতে চাইছেন! না, না, সে কি হয়?

অদ্বৈত চৌধুরী মৃদু হেসে জানালেন: আহাহা—হয়, ওসব কি পালাচ্ছে মিত্তির মশাই! কিন্তু যে কাজটা হাতে করে এনেছি, এখুনি না সেরে এলে সব গুলিয়ে যাবে কি না! হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার

ভাইঝিকে ডাকুন না—দেখে যাই; অবিশ্যি, দেখা তো এর পর হবেই, তবুও—

মুখখানা ম্লান করে জাহ্নবী বললেন: তার জন্যেই তো ভাবছিলাম এতক্ষণ! বিকেলে সেই যে সুদর্শনের সঙ্গে মোটরে কোথায় বেরিয়েছে, এখনো পর্য্যন্ত ফেরবার নাম নেই। তাই—আপনার গাড়ী আসতেই ভেবেছিলুম যে, ওরাই বুঝি ফিরে এলো!

মুচকে হেসে অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: বটে! সুদর্শনই ত আপনার ভাইঝির হবু বর—চিঠিতে এই নামই পড়েছি মনে হচ্ছে!

জাহ্নবী বললেন: হ্যাঁ, সম্পর্কে আবার আমার শ্যালক হয়। ওর কথাও সব বলব আপনাকে—আর, তাড়াতাড়ি এর সঙ্গে কেন যে বিয়ে দিচ্ছি, সে কথাও শুনবেন; তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুরেই আসুন আপনি।

অদ্বৈত চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল এমনি একটা ভাব মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন: বিচ্চু কোথায়? তাকে দেখছিনে ত? কেমন, কাজ কর্ম বেশ করছে তো?

জাহ্নবীকে বলবার কিছু অবসর না দিয়েই বিচ্চু ছুটে এসে অদ্বৈত চৌধুরীর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে মাথা ঠেকিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করল।

জাহ্নবী বললেন: আপনার বিচ্চু খুব বাহাদুর!

বিচ্চু উঠেছিল; আবার হেঁট হয়ে জাহ্নবীর পায়েও আর একবার মাথা ঠেকালো।

অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: যদি আপনার অসুবিধা না হয় ত, বিচ্চুকে একবার আমার সঙ্গে দিলে ভারি উপকার হবে।

প্রসন্ন মুখে জাহ্নবী বললেন: সে কি, আপনার দরকার থাকে ত নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন; যদি অন্য লোকজনেরও দরকার হয়—

বাধা দিয়ে অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: না, না, বিচ্চু হলেই হবে। আচ্ছা, তাহলে নমস্কার।

বিচ্চুর দিকে চেয়ে বললেন: কথা বুঝিছিস্ তো? সাহেব তোকে ছুটি দিয়েছেন, একবার আমার সঙ্গে আয় দেখি।

বিবাহ্ বাড়ী, কাজেই বিচ্চু সেজেগুজে তৈরী হোয়েই ছিল। এখন ঘাড় নেড়ে সহাস্তে কথাটার সমর্থন করেই সে অদ্বৈত চৌধুরীর সঙ্গে চলল।

দেউড়ী থেকে একটু দূরে অদ্বৈত চৌধুরীর সুবৃহৎ মোটরখানা দাঁড়িয়েছিল। অদ্বৈত চৌধুরী গাড়ীর কাছে যেতেই ভিতরের আরোহীরা দরজা খুলে দিল। বিচ্চু সোফারের সিটে গিয়ে বসলো। সেখানে পাশাপাশি আরো দুজন লোক বসেছিল, ঠাসাঠাসি করে বিচ্চু তাদের মধ্যেই নিজের স্থান করে নিল। ভিতরেও জনকয়েক লোক বসেছিল—প্রত্যেকের চেহারা দেখলে চমকে উঠতে হয়—এমনি দীর্ঘদেহ এবং বলিষ্ঠ আকৃতি।

মোটরখানি সহরতলীর দিকে কুণ্ডার পথে ছুটল।

৩৯

মন্দির মধ্যে দুর্গার মুখে সব্যসাচী নামটি শুনেই অভ্যাস মত সুদর্শন পকেটে হাত দিতে গেল, কিন্তু দুর্গার চাতুরীতে নষ্ট টোটাগুলির কথা মনে হতেই হাত সরিয়ে নিল। তার সর্বাঙ্গ তখন দারুণ উত্তেজনায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছে; তাদের বহুবাঞ্ছিত অপরাধী—সেই নোটোরিয়াস সব্যসাচী তার হাতের কাছে, কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস—তার হাতে অস্ত্র নেই!

আগন্তুকের মুখের কথা পুনরায় সুদর্শনের দুই কানে যেন গলিত শিশার উত্তপ্ত ধারা ঢেলে দিল! দৃঢ়স্বরে সে ব্যক্তি বলল: একটু আগে শাস্তির কথা উঠেছিল। দুর্গা দেবীর ইচ্ছা—শিবের সামনেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়; আমিও সে কথার সমর্থন করি। শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হোন সুদর্শনবাবু! আমরা আপনাকে এই মন্দিরে বন্ধ করে রেখে যাব এই উদ্দেশ্যে যে—স্থানমাহাত্ম্যে এবং দেবতার প্রসাদে যদি আপনার মনোবিকার কেটে যায়, নিয়তি শুদ্ধ হয়!

মুখখানা কঠিন করে সুদর্শন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কে?

প্রত্যুত্তরে আগন্তুক বলল: উপস্থিত শিবের সেবক এবং আপনার শাসক।

সুদর্শনের উপস্থিত বুদ্ধি এতক্ষণে প্রবুদ্ধ হলো, তাড়াতাড়ি হাতের মালাছড়াটি কুণ্ডলীবদ্ধ করে এই সময় সে সবলে কক্ষপ্রান্তে রক্ষিত প্রদীপটির উপর নিক্ষেপ করেই তৎক্ষণাৎ হাত দুখানি প্রসারিত করে দুর্গার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রদীপের স্বল্পালোকে ক্ষুদ্র কক্ষে যা কিছু দেখা যাচ্ছিল; এর পর কক্ষের তিনটি প্রাণীই যেন এক সঙ্গে অন্ধকারে ডুবে গেল।

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনেই আগন্তুকও বুঝল যে, সুদর্শনের শিক্ষিত ভদ্র মন এই দুর্ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা ভুলে গিয়ে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা নারীটিকে পশুবৎ আক্রমণ করেছে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে শব্দ লক্ষ্য করে সাহায্যের জন্য সেও অগ্রসর হলো।

অতি কদর্য একটা হিংস্র লালসার আবেগে সুদর্শন তখন দুর্গাকে তাহার বলিষ্ঠ আলিঙ্গন মধ্যে আনবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আশা-ভঙ্গে ক্ষিপ্ত হোয়ে সে স্থির করেছে—দুর্গার কমনীয় মুখের উপর অজস্র চুম্বনের সঙ্গে দংষ্ট্রাঘাতের নিষ্ঠুর নিদর্শন এঁকে দিয়ে সুন্দর মুখখানা বিকৃত করে দেবে! কিন্তু প্রদীপ নির্বাপিত হবামাত্র দুর্গা তৎক্ষণাৎ দ্বার লক্ষ্য করে পদচালনা করায় সুদর্শন তার সমগ্র দেহটির স্থলে কেবল-মাত্র ডান হাতের প্রকোষ্ঠটি সবলে চেপে ধরে এবং সমগ্র তনুটি আয়ত্তে আনবার জন্যে তার উপরেই বলপ্রয়োগ করতে থাকে। দুর্গাও পালটা চালে সুদর্শনের হাতখানাকে অবসন্ন করবার এক সাংঘাতিক প্যাঁচ কষতে কষতে সংঘে পরিচিত সাংকেতিক ভাষায় বলল: 'আমি এর হাত ছাড়িয়ে বাইরে যাব কি?' পরক্ষণে আগন্তুকের মুখ থেকে ঐরূপ ভাষায় কতিপয় শব্দ শুনে দুর্গা সচকিত হয়ে উঠল এবং সহসা সুদর্শনের অবসন্নপ্রায় হাতখানা ছেড়ে দিয়েই নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তীরের বেগে দরজার দিকে ছুটে গেল। দুর্গার হাতের চাপে সুদর্শনের ডান হাতের মধ্যম অঙ্গুলিটি ভগ্নদশায় উপস্থিত হওয়াতেই তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় দুর্গা তাকে ত্যাগ করায় সে যেন সংজ্ঞা ফিরে পেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার উপস্থিত বুদ্ধির আলোকে আর একটি পথ তার চোখের সামনে খুলে গেল। তাড়াতাড়ি সে মেঝের

উপর বসে পড়ে দুর্গার পদশব্দের অনুসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো। দ্বারদেশের উষ্ণীষধারী আগন্তুক সেই সন্ধিকালেই সুদর্শনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করবার জন্য তার দীর্ঘ হাত দুখানি সাঁড়াশীর মত চালনা করেছিল—কিন্তু তৎপূর্বেই সুদর্শন সহসা বসে পড়ায় তার নাগাল এড়িয়ে গেল।

মন্দির থেকে বাইরে এসেই দুর্গা প্রথমে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর ক্ষিপ্রপদে সুদর্শনের মোটরের দিকে এগিয়ে চলল। মন্দির মধ্যে আগন্তুক সাংকেতিক শব্দে দুর্গাকে জানিয়েছিল—'যেমন করেই হোক বাহিরে গিয়ে মোটরখানার কাছে দাঁড়াও। আমি এর ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি।'

কিন্তু মোটরের কাছে গিয়ে মাডগার্ডের গায়ে নিজের পীঠটির ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দুর্গা মন্দিরের দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই সভয়ে দেখল—আগন্তুকের পরিবর্তে সুদর্শনই মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে লোহার শিকলটি তুলে তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করছে!

দুর্গার মত দুঃসাহসিকা মেয়েও এ ব্যাপারে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগল—মন্দির থেকে তার আসার পরেই কি করে এ ঘটনা ঘটল? উপস্থিত বুদ্ধি কিছুটা থাকলেও গায়ের জোরে সুদর্শন যে আগন্তুকের সমকক্ষ ত দূরের কথা—তুলনায় তার কাছে শিশুর মত অসহায়, এ সত্য ত দুর্গার অবিদিত নয়। তবে কি করে সে অগন্তুককেই মন্দির মধ্যে রুদ্ধ করে নিজে বেরিয়ে এসে আর এক নূতনতর পরিস্থিতির উদ্ভব করে বসল?

আর ভাববারও সময় পেল না দুর্গা—দরজার শিকলটি তুলে যথাস্থানে লাগিয়ে সুদর্শন তখন আহত বাঘের মত হিংস্র মূর্তিতে দুর্গাকে লক্ষ্য করে মোটরখানার প্রায় কাছে এসে পড়েছে। দূর থেকেই তার মুখ ও

চোখের ভঙ্গি দেখে দুর্গা বুঝল যে, একবার তাকে আয়ত্ত করতে পারলে অতিবড় নৃশংস লম্পটের মত দুর্গতির এক শেষ করতেও সুদর্শনের শিক্ষা প্রাপ্ত ভদ্র মনে কিছু মাত্র সঙ্কোচ আসবেনা—এমনি সে প্রতি-হিংসায় ক্ষিপ্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছে।

নাগালের কাছাকাছি এসেই সে তীব্র স্বরে বলল : তোমার ডাকু বন্ধুকে বন্দী করেছি, এখন তোমার পালা। যদি ভালয় ভালয় নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে চাও ত সুড় সুড় করে লক্ষ্মী মেয়েটির মতন মোটরে গিয়ে বস। নৈল—

কথাটা শেষ করবার আগেই সে অতর্কিতে সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গার উপরে—মোটরের মাডগার্ডে পীঠটি রেখে যেখানে সে দাঁড়িয়ে তার পরিণাম ভাবছিল। কিন্তু সুদর্শন ভাবেনি যে, তার অভিপ্রায়টি আগেই বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য সেও সতর্ক হোয়ে তার গতিভঙ্গি লক্ষ্য করছিল।

সুদর্শনের কথা শেষ হবার আগেই হরিণীর মত অতি ক্ষিপ্রগতিতে স্থান ত্যাগ করে দুর্গা বিপরীত দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ফলে সুদর্শনই মাডগার্ডের উপরে আচম্বিতে এসে পড়ায় বেশ একটা ধাক্কা খেল।

কিন্তু তজ্জন্য সামান্য আঘতকে গ্রাহ্য না করেই সে বিপরীতদিকে সবেগে ছুটল দুর্গাকে ধরবার জন্যে। দুর্গাও পরক্ষণে সে স্থান ত্যাগ করে আবার পূর্বস্থানে এসে রুদ্ধ নিশ্বাসে তার গতিভঙ্গির হিসাব করতে লাগল। দুর্নিবার ক্রোধে সুদর্শন তখন ফেটে পড়বার মত হয়েছে। একটা মেয়ে কতদিন কতভাবে তাকে অপ্রস্তুত করে লজ্জা দিয়েছে, আজও সেই অভিনয় চলেছে! সে কি এখনো দয়া মায়া ভদ্রতা বজায় রেখে তাকে প্রশ্রয় দেবে? না—আজ সে অমানুষের মতই তার দেহের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এই দুরন্ত মেয়েটাকে তার

আয়ত্তে আনবার জন্যে—সে তার মুখ থেকে বুক ফাটা কান্নার সঙ্গে মুক্তির জন্যে আর্তকণ্ঠের কাকুতি মিনতি শুনে তাকে জানিয়ে দেবে যে সে পুরুষ—তার ক্ষমতা কতখানি! চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটল সুদর্শন হাত দুখানা প্রসারিত করে। কিন্তু দুর্গা যে তার চেয়েও ধূর্ততায় ক্ষিপ্রতর, গতি বেগেই পদে পদে তা জানিয়ে দিল। সুদর্শনেরও জিদ গেল চেপে। তখন সেই মোটরখানাকে অবলম্বন করে চলল এই দুটি তরুণ তরুণীর অদ্ভুত রকমের ছুটোছুটি! কিন্তু এভাবে দুর্গাকে ধরতে না পেরে সুদর্শন হঠাৎ মোটরের দরজাটা খুলে ফেলল। উদ্দেশ্য, মোটরের ভিতর থেকে দুর্গার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খপ্ করে তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু মোটরের দরজা খুলে ভিতরে সেঁধুবার এই সময়টুকুর মধ্যেই দুর্গাও ঝাঁ করে মোটরের আশ্রয় ত্যাগ করে তীরের বেগে ছুটল মন্দিরের রুদ্ধ দরজাটির উদ্দেশ্যে।

সুদর্শনের যখন হুঁস হলো, দুর্গা তখন নাগালের বাইরে। মোটরের যে স্থান থেকে দুর্গার উপরে সে ঝাঁপ দিবে ভেবেছিল, এখন মাটির উপরেই লাফিয়ে পড়তে হলো তাকে। দুর্গা যদি এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের শিকল খুলে দেয়, তাহলেই ত সর্বনাশ! সব কৌশলই তার নষ্ট হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটল দুর্গার আগেই মন্দিরের দরজায় গিয়ে তাকে রুখবার উদ্দেশ্যে। সুদর্শন জানে, মন্দির থেকে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে কৌশলে সেই লোকটির চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে এসেই সে করেছে বাজিমাৎ। কিন্তু এখানে তারই বুদ্ধির দোষে এই চতুর মেয়েটিই বুঝি তার সব কৌশল মাত করে দেয়! জয় পরাজয় এখন নির্ভর করছে মন্দিরের রুদ্ধ দরজাটির ঐ লোহার শিকলটির উপরে! দুর্গার হাতে ওটি ধরা পড়বার আগেই সুদর্শনকে ধরতে হবে দুর্গাকে। তাহলেই জয় তার অনিবার্য।

দুর্গাও জানে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সুদর্শনই আগে মন্দির থেকে পালিয়ে এসে তাদের সব পরিকল্পনাই ওলটপালট করে দিয়েছে। তার জীবন-দেবতা মন্দির মধ্যে আবদ্ধ. আর কোন উপায় নেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার! এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে তার পক্ষে সুদর্শনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দরজার ঐ শিকলটি খুলে দেওয়া। হ্যাঁ, ঐ শিকল তাকে খুলতেই হবে।

দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি দুটো পায়ের উপরেই বুঝি সঞ্চারিত করে দুর্গা দরজার কাছে এসে শিকলটি ধরবার জন্যে হাতখানি বাড়িয়ে দিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিছন থেকে মাথার দিকে প্রবল একটা আকর্ষণ আসায় উদ্যত হাতখানি তার শিকলটি স্পর্শ করতে পারল না।

সুদর্শন ইতিমধ্যে তার প্রায় পিছনে এসে পড়েছে এবং সেইখান থেকেই তার বলিষ্ঠ দুটি হাতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দুর্গার মাথার কুণ্ডলীবদ্ধ খোঁপাটি চেপে ধরে প্রাণপণে আকর্ষণ করছে। চুলে হাত পড়ায় দুঃসহ ক্রোধ বুঝি দুর্গার জিদ আরও উগ্র করে তুলল। এ অবস্থায় কেশাকর্ষণজনিত বেদনা অগ্রাহ্য করে ধৃত মাথাটিকে, সামনের দিকে সবলে ঝুঁকিয়ে সে স্খলিত হাতখানি বার বার বাড়াতে লাগল শিকলটি টেনে খুলে দেবার উদ্দেশ্যে।

উভয়ের এই টানাটানির প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে ভিতর থেকে রুদ্ধ দ্বারেও যে ঘন ঘন আঘাত পড়ছে এবং সেই আঘাতকারীর বহিরাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা রয়েছে, আর সে পরিবর্ত্তনে লাভ ক্ষতি কার কতখানি—ভালোভাবে সেগুলি জানা আছে বলেই দুজনের মধ্যে তখন চলেছে প্রাণপণে শক্তির সংগ্রাম। সুদর্শন ক্রমে দুর্গার মাথাটিকে কতকটা নিজের আয়ত্তে

এনে ফেলল—শিকল থেকে দুর্গার হাতখানাও সরে পড়ল, এই বিপন্ন অবস্থায় দুর্গা অনুমান করল, হয়ত এই সুযোগে এখনি পিছন থেকে সুদর্শন হাতদুখানা শাঁড়াশীর মতন চালিয়ে তার গলাটি জড়িয়ে ধরবে, তখন আর দুর্গার কোন উপায় থাকবে না নিজেকে রক্ষা করবার। অনুমানের সঙ্গে সঙ্গেই সে শিকলটি ধরবার আশা ত্যাগ করে, নিজের হাত দু'খানি সহসা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে করাতের মত দাড়াযুক্ত বিচিত্র কঙ্কণভূষিত প্রকোষ্ঠ দুটি সুদর্শনের উন্নত নাকটি অনুমানে নিশানা কর সজোরে চালিয়ে দিল।

দুর্গার এই অনুমান অভ্রান্ত ও যুগপৎ এই আঘাত এমনি অবর্থ হলো যে, একটা চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সুদর্শন দুর্গার খোঁপায় সংলগ্ন হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে তার বেদনাহত রক্তাপ্লুত নাসামূলে চেপে ধরল। দুর্গাও সেই মুহূর্তে মুক্ত মাথাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সবেগে রুদ্ধ দরজাদুটির উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয় হাতের প্রবল আকর্ষণে শিকলটা খুলে দিল।

দুর্গার কঙ্কণযুক্ত উভয় হাতের আকস্মিক আঘাতে সুদর্শনের নাক ও মুখের কয়েক স্থান রীতিমত আহত হওয়ায় ক্ষত মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল তখন। নিরুপায় হয়েই সে দুর্গার চুলের খোঁপা থেকে হাত দুখানা সরিয়ে নিজের আহত মুখখানা চেপে ধরেছিল অসহ্য যন্ত্রনার জ্বালায়। সেই অবস্থাতেই দুর্গার পরবর্তী কাণ্ড দেখে তার মাথাটা আবার ঘুরে গেল! তখনি সে দারুণ যন্ত্রণা উপেক্ষা করে রক্তসিক্ত হাত দুখানা আবার সবলে তুলে এগিয়ে গেল দুর্গাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দ্বারের শিকল তখন খুলে গেছে, দুর্গাও তার আসন্ন আক্রমণ ঠেকাবার অভিপ্রায়ে ঝাঁ করে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে এবং ভিতর

থেকে ঠিক এই সময় দরজা টেনে খুলে দ্বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সেই পাগড়ীধারী আগন্তুক। সুদর্শনের উদ্যত মুষ্টি সবেগে তারই উর্দ্ধাঙ্গে পড়ল।

আকস্মিক ভাবে আঘাত পেয়েই আগন্তুক সামনে ও পাশের দিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে নিল বোধ হয়। তার বুঝতে বিলম্ব হলোনা যে, এতক্ষণ এই বীরপুরুষ অসহায় এক নারীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রমত্ত ছিল এবং তারই আক্রমণের একটা বেগ এই মাত্র তাকেই সহ্য করতে হয়েছে।

আগন্তুককে দেখে সুদর্শন প্রথমে স্তব্ধই হয়েছিল, কিন্তু তার আঘাত যে ব্যর্থ হয়নি—এই দুরন্ত আততায়ীর উপরেই পড়েছে, প্রখর দৃষ্টিতে সেটা দেখেই সে একটু পেছিয়ে এসে দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য রক্তাক্ত হাত খানা পুনরায় মুষ্টিবদ্ধ করছিল। কিন্তু তার পূর্বেই—চীল যে ভাবে ফণাধারী সর্পের উপর পড়ে তার দংশনোন্মুখ মাথাটাকে আড়ষ্ট করে আকাশ পথে তুলে নিয়ে যায়, ঠিক যেন সেই ভাবেই আগন্তুক আক্রমনোদ্যত সুদর্শনকে চোখের নিমেষে তার দুটো অদ্ভুত হাতের চাপে পুতুলের মত শূন্যে তুলে ধরে বার কতক ঘুরিয়ে সামনে যখন সোজা ভাবে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন আগন্তুকের সবল হাতের বলে যে দেহটি ধরা না থাকলে সেই কঙ্করময় পথের উপরেই তৎক্ষণাৎ নেতিয়ে পড়তে হোত। সুদর্শনের চোখের সামনে তখন সব কিছুই ঘুরছিল। হাত দুখানা তাল পাতার তৈরী পলানার সিপাহীর মতন দু পাশে এলিয়ে পড়ে দুলছে—মুষ্টিবদ্ধ করবার মত শক্তিও এখন নেই। এই অবস্থায় আগন্তুক দুর্গাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল: এখন এই বীর পুরুষকে কি ভাবে তোয়াজ করা যায় বল? চড়, চাবুক, কিম্বা—

দুর্গা এগিয়ে এসে বলল : তাহলে মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা দেওয়া হবে। বরং শিবের ঘরে আজ রাতটা উনি হাজত বাস করুন, স্থান মাহাত্ম্যে মতি পরিবর্তন হোতেও পারে।

সেই কথাই ভালো।…কথার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনের অর্দ্ধ অচৈতন্য দেহটি নিয়ে আগন্তুক মন্দিরে প্রবেশ করল, এবং একটু পরেই বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে শিকলটি এঁটে দিল।

আগন্তুক ধীরে ধীরে দুর্গার কাছে এগিয়ে এসে তার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করল : লোকটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তোমার ওপরেই এক হাত নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল নিশ্চয়ই ?

মৃদু হেসে দুর্গা বলল : রীতিমত লড়তে হয়েছিল মশাই! তারই মধ্যে আমার লক্ষ্য ছিল শিকলিটা খুলে দেওয়া। সেটা খুলতে যেতেই পিছন থেকে মাথার খোঁপাটা দু হাতে চেপে ধরে টানতে থাকেন— যাতে শিকলটা খুলতে না পারি। শেষে দুটো হাতই দুদিক দিয়ে একসঙ্গে চালাতে হয়—হাতের কঙ্কণ দুটো কিন্তু ভারি মুখ রেখেছে।

আগন্তুক বলল : মুখে যে চিহ্ন করে দিয়েছে—অনেকদিন বেচারীর মনে থাকবে।

এই সময় মোটরের হর্ণের শব্দে দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল। দেখল যে, সামনের দিকটা আলোকিত করে ধীরে ধীরে একখানি মোটর সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তাটির উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। দুজনেই যুগপৎ সেদিকে একটিবার চেয়েই পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করল; পরক্ষণে সহর্ষে এগিয়ে গেল—অদূরে সুদর্শনের মোটরখানা যেখানে দাঁড়িয়েছিল।

মোটরখানি থামতে না থামতে তার ভিতর থেকে সহর্ষ একটি শব্দ শোনা গেল : ঐ যে!

সঙ্গে সঙ্গে সামনের সিট থেকে সবেগে লাফিয়ে পড়ল বিচ্চু। অতঃপর অদ্বৈত চৌধুরী মহাশয় সদলে মোটর থেকে অবতরণ করতেই দুর্গা ও তার সঙ্গী ভক্তির সঙ্গে তাঁর পদতলে নত হয়ে প্রণাম করল।

তিনি দুজনকেই সস্নেহে তুলে ছেলেটির পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে ঘড়ির কাঁটার মতই তোমাদের প্ল্যানটা মিলে গেছে বল?

ছেলেটি বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে দুর্গাদেবীই বেশী বাহাদুরী দেখিয়েছেন, নৈলে সবই পণ্ড হবার মত হয়েছিল।

অদ্বৈত চৌধুরী বললেন: তা হোত না, তাহলে আমরা ছিলাম কিসের জন্যে! যাক, কি ভাবে কি করলে সংক্ষেপে বলে ফেল দেখি, জেনে রাখা ভালো।

ছেলেটি তখন মন্দিরের ব্যাপারটি বলল, স্থানে স্থানে দুর্গাও তাকে সাহায্য করল। শেষ পর্যন্ত শুনে অদ্বৈত চৌধুরী সহাস্যে বললেন: বাঃ! এইত চাই! এমনি মেয়েরই দরকার হয়েছে আজ। সত্যিই তুমি বাহাদুর মেয়ে! ···এরপর ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: সুদর্শন তাহলে তোমাকে প্রতাপ বলে চিনতে পারেনি, এটা ঠিক ত?

প্রতাপ বলল: আমাকে সব্যসাচী বলে দুর্গাদেবীই যা মন্দিরে সোনাক্ত করেছিলেন! পরে, আলাপ পরিচয়ের সুযোগই ঘটে নি।

অদ্বৈত বললেন: ওদিকে জাহ্নবী ত আসর সাজিয়ে বর-কনের অপেক্ষা করছেন সন্ধ্যা থেকে, চার দিকে পুলিসের লোক ছুটোছুটি করছে, জাহ্নবী ত ভেবেই অস্থির—দুর্গাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সুদর্শন ফিরতে এত দেরী করছেন কেন? সে ত জানে না, তোমরা কোন পথে পাড়ি জমিয়েছ! যাক, আর তাঁকে দুশ্চিন্তায় রাখা ঠিক নয়; আমার মোটরে তোমরা রওনা হয়ে পড়, আর আমিও সুদর্শনকে মন্দির থেকে উদ্ধার করে দেওঘরে নিয়ে যাই। তারপর তোমরা ওখানে পৌঁছিয়েই ফোন করলে তবে এ ব্যাপারের যবনিকা পতন হবে সেটা কিন্তু মনে রেখো।

সন্ধ্যার পরেই জাহ্নবী মিত্রের সুসজ্জিত বাংলোর বাহিরের দিকটা যেমন আলোকসজ্জায় ও লোকজনের সমাগমে জমকে উঠলো, ভিতরের দিকটা তেমনি অভাবনীয় এক দুশ্চিন্তার ভারে ম্লান হয়ে কেমন একটা বিশ্রী আবহাওয়ার আভাস দিতে লাগলো ! অদ্বৈত চৌধুরীর প্রস্থানের পরেই জাহ্নবী একেবারে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

এই সময় রোহিণী থানার দারোগা বৃদ্ধ ও রুগ্ন আহম্মদ আলির পত্র নিয়ে থানার এক জমাদার জাহ্নবীকে সেলাম দিল। চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তেই জাহ্নবীর চোখ দুটি কপালের দিকে ঠেলে ওঠবার মত হলো। পত্রের মর্ম হোচ্ছে : আলিজান নামে যে যুবা আহম্মদ আলির ভাতিজা হোয়ে রোহিণীতে এসেছিল, আসলে সে এক প্রতারক ! আহম্মদ আলির আসল ভাতিজা আলিজান এখন কোয়েটায় সরকারী কাজে বাহাল আছে। দশ বছর তার সঙ্গে আহম্মদ আলির দেখাসাক্ষাৎ নেই ; কাজেই সে লোকটি যখন তাঁর ভাতিজা হোয়ে এসে জানাশোনা অনেক পুরানো কথা তুলে আলাপ জমায়—কোন রকম সন্দেহই তাকে করেন নি তিনি। তা ছাড়া, চেহারার দিক দিয়েও কোন অমিল তাঁর চোখে তখন ধরাও পড়েনি। হঠাৎ আজ সকালে কোয়েটা থেকে আলিজানের এক জরুরী চিঠি আসায় সব ফাঁস হয়ে যায়। নকল আলিজানও এখন নিরুদ্দেশ—ভোর থেকেই তার কোন পাত্তা নেই। যদি দেওঘরে তাকে দেখা যায় ত যেন তখনি গ্রেফ্তার করা হয়।

জাহ্নবীর কাছেই কয়েকজন থানা-অফিসার উপস্থিত ছিলেন ; তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে চিঠিখানা তাঁদের হাতে দিলেন পড়বার জন্যে। খবরটা শুনে তারাও যেন একসঙ্গে আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ল।

বুঝতে এখন কারও বাকি রইল না যে, তাদের ভিতরকার গুপ্ত কথা কেন ওভাবে ফাঁস হয়ে যেত এবং সেই স্মরণীয় বৈঠকে সুদর্শনের ফাইল এবং মহাজনদের পকেটের মধ্যে সব্যসাচীর চিঠি কি করে প্রবেশ করেছিল!

জাহ্নবী এখন কার কথা ভাববেন? কাকেই বা দোষী করবেন? আলিজানকে তিনিই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তার চাটুবাক্যে তুষ্ট হয়ে—অনেক ব্যাপারেই অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন তাকে। এর জন্যে দায়ী তিনিই। জাহান্নামে যাক আলিজান, এখন সুদর্শনই যে তাঁর সকল ভাবনার উপরে বড় হয়ে উঠেছে; একি মুস্কিলে সে ফেলেছে তাঁকে!

পাঁচটার সময় সুদর্শন বেরিয়েছে দুর্গাকে নিয়ে—সাতটার আগেই তার ফেরবার কথা। আকুল প্রতীক্ষা এবং বহু ব্যক্তির ব্যর্থ অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ আটটা বেজে গেছে, নয়টাও বাজে—তবুও তার ফেরবার নাম নেই! সারা সহর ও সহরতলী, এমন কি ত্রিকূট পর্যন্ত তোলপাড় করেও কোন পাত্তা তাদের পাওয়া যায় নি। শুভ-বিবাহের সব আয়োজন প্রস্তুত; খাদ্য সরবরাহকারক-প্রতিষ্ঠান খাবার এনে সাজিয়ে ফেলেছে; কিন্তু খাবে কে? এ অবস্থায় খাবারের থালার সামনে বসবার মত অবস্থা কারই বা থাকতে পারে?

ঘড়িতে ন'টা বাজল, জাহ্নবীর মনে হলো—কে যেন অদৃশ্য হাতে তাঁর মাথার উপরে হাতুড়ি পিটছে! এমনি সময় তাঁরই মোটর এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। বাইরের লোকজন উল্লাসের সুরে চেঁচিয়ে উঠল—তাদের মিশ্রস্বরে মনে হলো যে, ছোট সাহেব ফিরে এসেছেন!

ড্রয়িংরুমে যাঁরা বসেছিলেন জাহ্নবীকে পরিবেষ্টন করে, তাঁদের অনেকেই সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন বাইরের কোলাহল শুনে; জাহ্নবী কিন্তু একই ভাবে বসে রইলেন দরজার দিকে তাকিয়ে। একটু পরেই

দেখতে পেলেন তিনি, মিশির ও পাঁড়েজী মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি লোককে অত্যন্ত সন্তর্পণে ড্রয়িংরুমের মধ্যে নিয়ে এলো—তাঁদের পিছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন অদ্বৈত চৌধুরী নিজে। তাঁর পিছনে রয়েছে বিচ্চু।

দারুণ উদ্বেগে সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে চাইতেই জাহ্নবীর চোখ দুটি আবার বিস্ফারিত হয়ে উঠল, অস্ফুটস্বরে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন তিনি : সুদর্শন!

পিছন থেকে অদ্বৈত চৌধুরী বললেন : হ্যাঁ। এখন এঁকে এঁর শোবার ঘরে বিছানায় শোয়াতে হবে—ঘুমের দরকার। পথেই আমি ডাক্তারখানা থেকে যা কিছু করবার সবই ম্যানেজ করে এনেছি। বিচ্চু, ছোট সাহেবকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দাও।

জাহ্নবী এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন প্রশ্নই এখন মুখ দিয়ে তাঁর বেরুল না, অথচ তাঁর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। তিনি শুধু নির্বাক দৃষ্টিতে চৌধুরীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তাঁকে বসতে বলবার মত মনের অবস্থাও যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

পাশের ঘরে সুদর্শনকে পাঠিয়ে দিয়েই অদ্বৈত চৌধুরী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জাহ্নবীর পাশেই একখানি সোফায় বসে পড়ে আস্তে আস্তে বললেন : সব বলছি—শুনুন।

শুধু জাহ্নবী নয়, তাঁর সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ স্থানীয় অনেকেই ড্রয়িংরুমে তখন উপস্থিত, তাঁরাও চৌধুরীর মুখের কথা শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।

চৌধুরী খুব সংক্ষেপে যে কাহিনী বললেন, তার মর্ম এই যে : কুণ্ডায় তাঁর যে কাজ ছিল, সেটি সেরে তিনি সরমার পথে ঝাড়খণ্ডেশ্বর শিবকে দর্শন করতে যান। তাঁর সঙ্গে বাইরের জন দুই ভদ্রলোক আর বিচ্চু

ছিল। মন্দিরের কাছে গিয়েই দেখেন—একখানা মোটর সেখানে খালি পড়ে রয়েছে। বিচ্চু ইশারায় জানাল যে, সেই মোটরেই ছোট সাহেব দুর্গাদেবীকে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। তারপর মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি, বাহিরের দিক থেকে দরজায় শিকল দেওয়া রয়েছে। শিকলটি খুলে মন্দিরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম, পুলিসের ইউনিফরম পরা এক যুবক অজ্ঞান অবস্থায় দরজার কাছে পড়ে আছেন। বিচ্চু জানালে, সে-ই ছোট সাহেব। সেই অবস্থায় আমরা তাঁকে মোটরে এনে তুলি; তারপর সরাসরি করনীবাগে এক ডাক্তারখানায় এনে ফার্ষ্ট এডের ব্যবস্থা করি। সেখানে সুদর্শনবাবুর জ্ঞান ফিরে আসে। বলেন যে, সব্যসাচীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্গাদেবী তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে দরজায় শিকল দিয়ে পালিয়ে গেছেন।···এই হলো অদ্বৈত বাবুর কাহিনী। নিজের চোখে যা দেখেছেন, আর সুদর্শনের মুখে যা শুনেছেন, সব জানিয়ে দিলেন। এর বেশী জানবার জন্যে সুদর্শনকে এখন চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। সে সব ব্যবস্থা পরে হবে। উপস্থিত বিবাহের তোড়জোড় সব বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

জাহ্নবী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন: শেষ পর্যন্ত দুর্গা তাহলে সেই ডাকাতটাকেই ধরা দিলে!

এর পর অদ্বৈত চৌধুরীই উদ্যোগী হয়ে নিমন্ত্রিতদের রাত্রিভোজের ব্যবস্থা করে দিলেন। খাবার জিনিষপত্র সব যখন এসে গেছে, ভোজের টেবিলে দেবার জন্যে থালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তখন নষ্ট করে ত কোন লাভ নেই। ড্রয়িংরুমেই সকলের স্থান কুলিয়ে গেল; মেয়েদের জন্যে ভিতরে ব্যবস্থা ছিল। জাহ্নবীকেও জোর করে খাওয়াতে বসলেন অদ্বৈত চৌধুরী; তিনি খাবেন না কিছুতেই, চৌধুরীও ছাড়বেন না—নতুবা তিনিও অভুক্ত থাকবেন—জানালেন। অগত্যা, পাশাপাশি দুজনে

যেমন বসেছিলেন—সেখানেই তাঁদের টেবিলে খাবারের ডিস্ আনা হলো।

সকলের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ভিতর থেকে বিচ্চু ছুটে এসে ইশারায় জানাল যে, অনেকক্ষণ ধরে সাহেবের ঘরে টেলিফোনের ঘন্টি বাজছে। শুনেই জাহ্নবী যন্ত্রটি বাহিরে আনবার হুকুম দিলেন। সে ব্যবস্থাও ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন এসে গেল।

ফোনের রিসিভারটি কানে লাগাতেই একঘর লোকের সমবেত কণ্ঠের একটা হাস্যধ্বনি জাহ্নবী শুনতে পেলেন। সে হাসি যেন থামে না। জাহ্নবী প্রশ্ন করলেন: হ্যাল্‌লো—কে আপনি? উত্তরেও শুনলেন হাসির উচ্ছ্বাস, তারপর কথা: হ্যাল্‌লো! আমি শঙ্করলাল! আপনি ত মিষ্টার মিত্র?

ভগ্নস্বরে জাহ্নবী বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু এত রাত্রে?

আবার হাসির একটা গমক কানে এল জাহ্নবীর। হাসির পর কথা: বিয়ের রাতটাকে দিন বলেই ধরা হয়ে থাকে মিঃ মিত্র—নয় কি? তা, আপনার ওখান্‌কার উৎসব কি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে? ভোজ পর্যন্ত?

জাহ্নবী এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। তাঁকে নীরব দেখে শঙ্করলাল বললেন: আয়োজনও ত নেহাৎ কম করেন নি? তবে দুঃখ এই যে, আমাদেরই বঞ্চিত করেছিলেন! এমন কি, যাঁর কন্যা—তাঁর কথাও ভুলে গিয়েছিলেন সত্যি! এমনভাবে বিয়ের আয়োজনের কথা এর আগে আর শুনিছি বলে মনে হয় না। আপনি খুব দুঃসাহসী মানুষ দেখছি!

জাহ্নবীর পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হলো না; এই বিবাহের

সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ তিনি স্থির করে রেখেছিলেন, সেইটিই এক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে বললেন : আমার পক্ষে অভিভাবকরূপে আর কোন উপায় ছিল না স্যার, মেয়েটা সুদর্শনকে নিয়ে এমনি ফ্ল্যাটারী সুরু করে যে, মান মর্যাদা রক্ষার জন্যেই তাড়াতাড়ি এ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল আমাকে।

ফোনে স্যার শঙ্কর বললেন : বটে! মান বাঁচাবার জন্যে ওদের গাঁটছড়া বাঁধবার ব্যবস্থা করেন? কিন্তু তাজ্জব এই, সে খবরটা শুধু এখানেই চেপে রাখলেন! না বললেন আমাকে, না জানালেন যাঁর মেয়ে—তাঁকে। যাক্—বিয়ে হয়ে গেছে? বরকনে কোথায় এখন—বাসর-ঘরে বোধ হয়?

একটা ঢোঁক গিলে জাহ্নবী শুষ্কস্বরে বললেন : আজ্ঞে না; বর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে—কনের পাত্তা নেই।

বিস্ময়ের সুরে স্যার শঙ্কর প্রশ্ন করলেন : সে কি? কি ব্যাপার? বলুন, বলুন, কিছু চাপবেন না।

জাহ্নবী সংক্ষেপে ব্যাপারটা সবই বললেন—বেলা পাঁচটার সময় দুর্গাকে নিয়ে সুদর্শনের মোটরে বেরিয়ে পড়া, তারপর দুমকার অদ্বৈত চৌধুরীর ঝাড়খণ্ডেশ্বরের মন্দির থেকে আহত সুদর্শনকে নিয়ে আসা পর্যন্ত—কিছুই বাদ দিলেন না।

স্যার শঙ্কর বললেন: চৌধুরী মশায়কেই তাহলে শেষ রক্ষা করতে হয়েছে বলুন? তিনি এখন কোথায়?

জাহ্নবী বললেন : এখানেই—আমার পাশেই বসে আছেন।

স্যার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন : চৌধুরী মশাই যখন সুদর্শনকে উদ্ধার করেন, তিনি বুঝি সে সময় বলেছিলেন—দুর্গা সব্যসাচীর সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছেন?

জাহ্নবী বললেন : হঁ্যা।

স্যার শঙ্কর বললেন : কিন্তু এই মাত্র আমি যা শুনিছি সে খবর কিন্তু ঠিক ও রকম নয়। আচ্ছা, ফোনটা আপনি একবার চৌধুরী মশাইকে দিন দেখি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাহ্নবীকে রিসিভার চৌধুরীর হাতে ছেড়ে দিতে

...। বললেন : স্যার শঙ্কর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আসলে শঙ্করের কথাগুলি ত ঘরের কেউ শুনতে পাননি এতক্ষণ, তাই ...লকে শোনাবার জন্তেই তিনি চৌধুরীকে এভাবে ডেকে নিলেন। ...একটি সংলাপের পর অদ্বৈত চৌধুরী বললেন : স্যার শঙ্করের ইচ্ছা, ...র কথাগুলিও আমি সকলকে শুনিয়ে দিই।

স্যার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন : ওখানে এখন কতগুলি শ্রোতা ...স্থিত এবং মোটামুটি তাঁদের কি পরিচয় ?

অদ্বৈত চৌধুরী বললেন : আমরা প্রায় জন পঞ্চাশ আছি এখানে। বেশীর ভাগই পুলিস অফিসার, কতক সহরের বিশিষ্ট বাসীন্দাও আছেন।

স্যার শঙ্করের কথা কিছুক্ষণ ধরে চৌধুরী শুনলেন, তারপর রিসিভারটা হাতে রেখে জাহ্নবীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন : স্যার শঙ্কর বলছেন—আজকের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তিনি যা শুনেছেন, সেটা হোচ্ছে—দোষটা নাকি আগাগোড়া সুদর্শনের, আর তাকে আস্কারা দিয়েছেন আপনি।

জাহ্নবী কথাটা শুনেই তর্জন করে উঠলেন; কিন্তু চৌধুরী তাঁকে ...হতে ইঙ্গিত করে বললেন : স্যারের কথাটা বলতে দিন। উনি ...নছেন তাই সকলকে শোনাতে চান। আপনার হুকুমেই নাকি ...দেবী সুদর্শনের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুদর্শন সে-সুযোগ ...য় বার বার তাঁকে অপমান করতে ব্যস্ত হন। কিন্তু দুর্গা তাঁর সব দুষ্টুমি ...খে তাঁকে প্রতিবারই অপ্রতিভ করে দেন। কতকগুলো ঘটনার সাক্ষী হোচ্ছে বিচ্চু। আজও ঝাড়খণ্ডেশ্বরের মন্দিরে জোর করে তাঁর গলায় মালা পরাবার জন্তে ইতরামীর একশেষ করেন। সুদর্শনের মুখে ও কপালে যে ক্ষত হয়েছে—আত্মরক্ষার জন্তে দুর্গাই তার হাতের কঙ্কণের ঘায়ে ঐ চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। এর আগে সাতদিন ধরে গোপনে চক্রান্ত চলে—দুর্গার অজ্ঞাতে আকস্মিক ভাবে সুদর্শনের সঙ্গে তার গাঁটছড়া কিভাবে বেঁধে দেবেন ওঁরা! কিন্তু দুর্গার কাছে চেপে রাখলেও তিনি সবই জেনেছিলেন এবং বার বার সুদর্শনকে বলেছেন যে অন্তের বাকদত্তা তিনি। আপনিও একথা দুর্গার বাবার কাছে জেনেছিলেন! কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যখন

কথাটা গ্রাহ্য করলেন না, তখন বাধ্য হয়েই দুর্গা তাঁর ভাবী স্বামী আহ্বান করে বলেছিলেন যে, চরম সঙ্কট থেকে নিষ্কৃতির জন্যে। ফলে ঐ মন্দিরেই তাঁর শুভাগমন হয়।

জাহ্নবী তাড়াতাড়ি চৌধুরীকে বললেন: স্যারকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এত কথা যখন শুনেছেন, দুর্গার সেই ভাবী স্বামী বাহাদুরটি কে, কোথাকার বীরপুরুষ তিনি—সেটি শোনেননি?

চৌধুরী বললেন: বেশ, আমি জিজ্ঞাসা করছি।......বলার পরেই তিনি কথাগুলি জিজ্ঞাসা করলেন স্যার শঙ্করকে যেমন ভাবে জাহ্নবী বলেছিলেন। উত্তরে স্যার শঙ্করের কথাও চৌধুরী শুনিয়ে দিলেন। বললেন: স্যার শঙ্কর বলছেন—সে ত এখানে সকলেই জানেন, আপনিও সে নাম শুনেছেন আপনার দাদার কাছে, চোখেও তাঁকে দেখেছেন; তিনি আপনার দাদার ছাত্র, মহাজাতি সংঘের গৌরব—প্রতাপ।

শুনেই জাহ্নবী চমকে উঠলেন, কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন চৌধুরীর মুখের পানে; তার পর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন: জিজ্ঞাসা কর ওঁকে প্রতাপ, না—সব্যসাচী?

চৌধুরী জাহ্নবীর প্রশ্ন স্যার শঙ্করকে জানিয়ে তাঁর যে উত্তর শুনিয়ে দিলেন, সকলেই নির্বাক বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বীকার করছেন যে, প্রতাপ ও সব্যসাচী অভিন্ন—অর্থাৎ একই ব

জাহ্নবীই নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন: স্যারকে তাহলে এক জিজ্ঞাসা করুন চৌধুরী মশাই, সেই নোটোরিয়াস আউট ল-কে স করে দুর্গা এখন কোন চুলোয় গেছে—সে খবর উনি পান নি?

রিসিভারের মুখ খোলা থাকায় এখন জাহ্নবীর প্রশ্ন সরাসরিই শুনতে পেয়েছিলেন স্যার শঙ্কর। চৌধুরীকে আর জিজ্ঞাসা করতে হলো না। উত্তরটাই শুনিয়ে দিলেন তিনি; স্যার শঙ্কর বলছেন জাহ্নবীবাবু—মা দুর্গা পাষণ্ডদলন করে প্রতাপের সঙ্গে বাঁকিপুরে পিত্রালয়েই ফিরে এসেছেন। আর মহাজাতি সংঘ থেকেই স্যার শঙ্কর কথা বলছেন সরকার সংঘের সঙ্গে সংঘ-নায়ক ও সংঘ-সেবকদের সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। বড় শুভদিনে এবং শুভক্ষণেই দুর্গা এসেছেন—ঠিক যে

আগমনীর মতই তাঁর আগমন হয়েছে এখানে। স্যার শঙ্কর জানতে চাইছেন জাহ্নবীবাবু, আর কিছু জিজ্ঞাস্য আপনার আছে?

জাহ্নবীর সমস্ত দেহ ও মস্তিষ্ক এখন যেন ঝিম ঝিম করছে; দুটো কানের ভিতর দিয়ে একটা গরম বাষ্প বুঝি বেরিয়ে আসছে; তিনি যা শুনছেন, সব কি সত্য? তবুও যে-প্রশ্নটা সবার উপরে দারুণ এক সমস্যার মত বড় হয়ে প্রত্যেকের মনেই দোলা দিচ্ছে, সেইটেই তিনি জানতে চাইলেন: মার্কা মারা অপরাধী—এক ডজনের ওপর লুঠতরাজ করে সমস্ত সবডিভিসনকে যে বদমাস দমিয়ে দিয়েছে—তাকে য়্যারেষ্ট করবার কি ব্যবস্থা তিনি করেছেন?

স্যার শঙ্কর এ প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন—শুনতে শুনতেই জাহ্নবীর মুখখানা কালো হয়ে গেল ক্ষোভে এবং অভিমানে। স্যার তাঁকে জানিয়ে দিলেন: পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্রের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে যে-সব সমাজ-দ্রোহী ব্যবসায়ীর আবরণে সরকার ও দেশবাসীর সর্বনাশ করছিল—সব্যসাচীর মুখোস পরে সে-লোক সমাজের যে উপকার করেছে, তার জন্যে তাকে কিভাবে পুরস্কৃত করা যায়, সেই পরিকল্পনাই এখন চলেছে। অধ্যাপক যদুপতি একদা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—সঙ্ঘের কর্মীদের তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে; ... কি জবরদস্ত পুলিস-সুপার জাহ্নবী মিত্রের সব ডিভিজনকেও ... দেবার ক্ষমতা রাখে। কথাটা শুনে পুলিস-সুপার উপেক্ষার ...ছিলেন; কিন্তু পুলিসের বড় কর্তা সেটা যাচাই করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। সুতরাং নোটোরিয়াস সব্যসাচী তাঁরই একটা 'মডেল' মাত্র। ...জেই তার উপরে কোন নালিশ উঠতে পারে না। যেমন, আলিজানকে সরকার আসল আলিজানের 'প্রক্সি' করে আর এক মডেল বানিয়ে রোহিনীতে পাঠিয়ে অনেক গুপ্ততথ্য জেনেছিলেন—এবং সে ব্যক্তিও এখন অভিযোগের বাইরে···এও তাই। লুন্ঠিত অর্থ বা দ্রব্যাদি সবই সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে গচ্ছিত আছে। তাদের অধিকাংশই সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে, কতক প্রত্যর্পণ করা যাবে। সব্যসাচী বা আলিজান নিস্বার্থভাবেই তাঁদের হামলা চালিয়েছেন, এক কপর্দকও কেউ আত্মসাৎ করেননি।

স্যার শঙ্করের এই ভাষণ জাহ্নবীকে বিক্ষুব্ধ করলেও আর সকলে অভিভূত ও চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না। এর পর অদ্বৈত চৌধুরী রিসিভারটি জাহ্নবীর হাতে দিয়ে বললেন: আপনার দাদা ফোন ধরেছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

যন্ত্র-চালিতের মত জাহ্নবী রিসিভারটি কাণে ধরতেই বহুদিনের পর যদুপতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি তখন বলছিলেন: জাহ্নবী, দুর্গা তোমাকে কিছু বলতে চায়, শোন।

জাহ্নবী বললেন: ভালো!

দুর্গা বলল: কাকাবাবু, আমি দুর্গা। সবই ত শুনলেন, এখন আমাকে ক্ষমা করুন। এখান থেকেই আমি আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছি, এরপর একদিন ওখানে গিয়ে মাপ চেয়ে নেব। আর সুদর্শন দাদাকে বলবেন, তিনিও যেন ছোট বোন ভেবে এরপর আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখেন। এখন স্যার আপনাকে কি বলছেন শুনুন।

কিন্তু স্যারের মুখে শেষ কথাটি শুনেই জাহ্নবীর দুই চক্ষু আর একবার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রিসিভারটি যথাস্থানে রেখে পার্শ্ববর্তী অদ্বৈত চৌধুরীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলেন: চৌধুরী মশাই, প্রতাপ আপনার ভাগনে? আপনার একমাত্র ওয়ারিশান?

স্মিতমুখে অদ্বৈত চৌধুরী উত্তর করলেন: স্যার শঙ্কর বললেন বুঝি? হ্যাঁ, আপনি ত জানতেন, আমি অপুত্রক। এখন আর জেনেছি, প্রতাপই আমার সব। আপনার অগ্রজ যদুপতি, আর স্যার শঙ্কর—এঁরা দুজনেই আমার বাল্যবন্ধু ও কলেজের সহপাঠী। মহাজাতি সংঘের আমিও একজন শুভানুধ্যায়ী। প্রতাপের প্রতিষ্ঠা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। অতঃপর এই অদ্বৈত চৌধুরীর লক্ষ্য কাম্য আর সবই ঐ—মহাজাতি সংঘ।

শেষ